সন্দীপন পাঠশালা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

অষ্টম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৬৯

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলি-৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্যিক অগ্রজ শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

শ্রীচরণেষু

বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য মহাস্থবির, আমাদের স্নেহময় বুড়োদা,

তোমার মত স্নেহময় সত্যকারের দাদা জগতে দুর্লভ। তোমাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
১৫।১।৪৬

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'সন্দীপন পাঠশালা' ১৩৫২ সালের 'কৃষকে' "উদয়াস্ত" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রয়োজনবোধে নাম পরিবর্তন করলাম। 'সন্দীপন পাঠশালা'ই বইখানির সঙ্গত নাম। বাংলা দেশের শিক্ষক-জীবন অবহেলিত, অনাদৃত। পাঠশালার শিক্ষক বা পণ্ডিতমহাশয়দের তো কথাই নাই। এদের সুখ-দুঃখ অবহেলিত, সমাজ-জীবনে সামান্যতম সম্মান থেকেও এঁরা বঞ্চিত। এঁদের নিয়ে দু-চারটি হাস্যরসাত্মক রচনা আমাদের সাহিত্যে আছে—সেইগুলিই এঁদের প্রতি অবহেলার নিদর্শন। সীতারাম আমার কাছে বাস্তব; তার মনের পরিচয় বহুবার পেয়েছি। তাকে সাহিত্যে রূপদানের বাসনা ছিল, এতদিনে তা সম্ভবপর হওয়ায় আমি নিজে আনন্দিত হয়েছি সবচেয়ে বেশি।

বইখানি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়, অনেক কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করেছি, এবং তাতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
টালাপার্ক, কলিকাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্দীপন পাঠশালা

মানুষের প্রতিষ্ঠার কামনা যখন অন্ন-বস্ত্রের ভাবনাকে ভুলিয়ে দেয়, তখন তার পথ চলাটা ঠিক আকাশের দিকে মুখ তুলে পথ চলা। অতি বাস্তব মাটির পৃথিবীর বুকের বাধা-বিঘ্নের কথা তখন সে ভুলেই যায়।

একটা গল্প আছে, এক জ্যোতির্বিদ অন্ধকার রাত্রে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে গিয়ে একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তাকে যে ব্যক্তি উদ্ধার করেছিল, সে তাকে উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে একটি অমূল্য উপদেশও দিয়েছিল। বলেছিল, বাপু হে, মাটির খবর জান আগে, তার পর আকাশের দিকে তাকিও।

এ বিখ্যাত ইংরাজী গল্পটি সীতারাম জানে, বাল্যকালে পড়েছে, মনেও আছে।

সীতারামের বাবা ও-গল্প জানে না, সে ইংরেজী পড়ে নাই, বাংলা লেখাপড়া যাও জানে সেও না-জানারই সামিল, সেও এই কথাই বলে অন্যভাবে। বলে, বাবা, উপরের দিকে তাকিও না। নীচের দিকে চেয়ে দেখো। তোমার চেয়ে কত লোকের অবস্থা ভাল, কত লোক তোমার চেয়ে বেশি মান-সম্মান পায়, সে হিসেব করতে যেও না, অশান্তির আগুন তা হলে আর নিববে না। তার থেকে তোমার চেয়ে কত লোকের অবস্থা খারাপ, তোমার চেয়ে মান-সম্মানে ছোট কতজন আছে, তারই হিসেব করে দেখ, তা হলে সুখ না হোক, শান্তিতে দিন কাটবে তোমার।

সীতারামদের কুলগুরু বলেন, বাবা, কামনাতে আর আগুনে কোন তফাত নাই। আগুনের শিখার মত কামনার স্বভাবও হল ঊর্ধ্বমুখী। যতই তাকে নীচের দিকে ঘুরিয়ে দাও, সে তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে উপরের দিকে মাথা তুলবে। কিন্তু যখন সে নেভে, তখন জীবনটা হয় পুড়ে-যাওয়া কাঠের মত, ছাই আর কয়লার স্তূপের মত।

কথাগুলি সীতারামের অন্তরও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তবুও সেসব কথা সে আজ কোন মতেই মানতে পারছে না। চাষীর ছেলে কালের রেওয়াজ অনুযায়ী স্থানীয় হাই-স্কুলে পড়তে গিয়েছিল। সেখানে ইংরেজীটা আয়ত্ত করবার শক্তির অভাবে ব্যর্থমনোরথ হয়ে অবশেষে গিয়েছিল হুগলী নর্মাল স্কুলে পড়তে, সেখানেও দু-দুবার ফেল করে মাথা হেঁট করে বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে কখন উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন মনে ধরে গিয়েছে, সে চাকরি করতে চায়। সে চাকুরে বাবু হবে। পণ্ডিত হিসাবে মান্যগণ্য হবে সংসারে। কিন্তু বাপ রমানাথ বললে, না। ও মতলব ছাড় তুমি। আমরা চাষী, ছিষ্টি থেকে পিতিপুরুষের কুলকম্ম হল চাষ। এই চাষ করেই আমরা খেয়ে-পরে ছেলেপুলেকে জমিজমা দিয়ে হরি বলে চোখ বুজে আসছি। সেই সব ছেড়ে তুমি চাকরি খুঁজছ! তাও যদি চাকরির মত চাকরি হত তো বুঝতাম! হায়, হায়রে কপাল! ডান হাতে খুরপি চালিয়ে সে একটি লেবুর চারার গোড়ার ঘাস ছাড়াচ্ছিল, বাঁ হাতে হুঁকো ধরে তামাক খাচ্ছিল। ছেলেকে

কথাগুলি বলবার সময় ঢুইই বন্ধ ছিল, এখন কথাটা মাঝখানে অসমাপ্ত রেখে সে আবার ঢুইই আরম্ভ করলে।

সীতারাম মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েই রইল।

হঠাৎ আবার হাতের কাজ থামিয়ে রমানাথ মুখ তুলে বললে, কী? বল? 'রবিপ্যায়ট' বল? অর্থাৎ অভিপ্রায়।

সীতারাম এবার বললে, যা হোক একটা চাকরি যখন মিলেছে, তখন আমি দেখব চেষ্টা করে।

রমানাথ আক্ষেপ এবং শ্লেষ দুই মিশিয়ে বললে, কপাল তোমার! চাকরি তো পেটভাত আর চার টাকা মাইনে। আজ দশ বছর ইস্কুলের মাইনে, বোর্ডিঙের খরচ যুগিয়ে, শেষে চার টাকা মাইনে আর খোরাক, তাও পোশাক নাই। লেখাপড়া না করে যারা চাকর-খানসামার কাজ করে, তারাও যে খোরাক-মাইনের ওপরে পোশাক পায় বাবা!

সীতারাম নীরবে মাথা নীচু করেই বাপের সান্নিধ্য থেকে চলে গেল এবার।

ওই নীরবে ছেলের চলে যাওয়ার মধ্যেই রমানাথ তার জবাব পেলে। সে মৌনভাবে বাপের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে গেল না। ওই কাজই সে করবে। ওই পেটের ভাত আর চার টাকা মাইনেই তার অনেক। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার গমনপথের দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার রমানাথ কাজে লাগল। হঠাৎ তার এতক্ষণে নজর পড়ল, কথা বলার অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন সে চারাগাছটির বেশ একটি মোটা শিকড় কেটে ফেলেছে। হয়তো গাছটা আর বাঁচবে না। রমানাথ তিক্ত হাসি হাসলে, মনে হল, তার জীবনের আশাতরুটিরই মুখটি কেটে ফেলেছে সে।

"মোড়লদাদা রয়েছেন নাকি?"—এসে দাঁড়াল তাদের গ্রামের আট-আনা রকমের জমিদার-বাড়ির পুরানো এবং চাষের তদ্বিরকারক বিশ্বস্ত কর্মচারী কানাই রায়। সাক্ষাৎ কলি এই কানাই রায়টি। নল-দময়ন্তী যখন একখানি কাপড় পরে বনবাসে দিন যাপন করেছিলেন—পরস্পরের থেকে দূরে যাবার যখন উপায় ছিল না—তখন কলি নলের হাতে যুগিয়ে দিয়েছিল ধারালো ছুরি। ঠিক তেমনিকার সাক্ষাৎ কলির মত কানাই রায় সীতার হাতে ওই চাকরিটি তুলে দিয়েছে। এই কানাই রায়ই সীতারামের চাকরি স্থির করেছে সে-ই তাকে প্রলুব্ধ করেছে। তাকে দেখে রমানাথ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, বলে উঠল, আপনি আমার এ শত্রুতা কেন করছেন, বলুন দেখি?

শত্রুতা!—বিস্মিত হয়ে গেল কানাই রায়।

শত্রুতা বৈকি। রমানাথ বললে, একটি মাত্র সন্তান আমার। মা-মরা ছেলে মানুষ করেছি বুকে করে। লেখাপড়া করে আজ চার বছর কাছছাড়া হয়ে রইল, তাও বলি, ঝক মারুকগে, ছেলে পড়তে চাইছে, পড়ুক। ফেল যে করবে, তা আমি জানতাম। তা বলি,

মিটুক, শখই মিটুক, সে-ই ফেল করে বাড়ি এল। ভেবেছিলাম, যাক, ছেলের সাধ মিটল, এইবার ঘরে এসে বসবে থির হয়ে। আমার ডান হাত হবে, চাষ-বাস দেখবে। বিদ্ধ হয়েছি, কাছে কাছে থাকবে। তা না, এ তুমি তাকে কি বুদ্ধি দিলে বল দেখি ?

রায় এমন অভিযোগ প্রত্যাশা করে নাই। সীতারামকে সে ভালবাসে, সেই প্রীতিবশেই সে তার মনের অভিপ্রায় বুঝে এই ব্যবস্থাটি করে দিয়েছে।

রমানাথ চোখ মুছলে, চোখে তার জল এসেছে, বললে, হঠাৎ যদি মরে যাই, তবে হয়তো পুত্তের আগুনও মুখে জুটবে না।

এবার রায় না হেসে পারলে না। বললে, এই তো আড়াই মাইল পথ গো, এ আবার দূর কি ? সন্ধ্যেবেলায় ছেলেদের পড়িয়ে খেয়ে-দেয়ে তো রোজ বাড়ি আসতে পারবে। আপনার মাথা ধরলে খবর পাঠালে এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি আসবে।

রমানাথ এ কথার জবাব খুঁজে পেলে না। নীরবে মাটির দিকে চেয়ে এক গুচ্ছ ঘাসের গোড়া ধরে টানতে আরম্ভ করে দিল।

রায় তাকে বুঝিয়ে বললে, আপনি অমত করবেন না। সীতারামের এতে ভাল হবে, আপনারও ভাল হবে। আট-আনা রকমের জমিদারের বাড়ির ছেলেদের মাস্টার হবে সীতারাম, তাতে—

রমানাথ তার হাতটা ধরে হঠাৎ বললে, সেরেস্তার কাজকম্ম যাতে শেখে, তাই যেন করে দেবে ভাই।

রায় বললে, তা আর এমন কঠিন কি। সময়-অবসরে যদি সেরেস্তার নায়েবের কাছে বসে, তবে ক'দিন লাগবে শিখতে। তা বলব আমি রাণীমাকে।

হঁ্যা। বাবুদের গোমস্তাগিরি যদি পায় আমাদের গেরামের, তবে খাতির বল খাতির, দশ টাকা রোজগার, বাড়িতে থাকা, সবই হবে।

অদৃশ্য বিধাতা হাসলেন, আগুনের ছোঁয়াচে এলেই আগুন ধরে।

ঠিক এই সময় সীতারাম এসে দাঁড়াল।

আমি যাচ্ছি বাবা।

রমানাথ উঠে দাঁড়াল। বললে, 'যাচ্ছি' বলতে নাই, 'আসি' বলতে হয় বাবা। চল, ফোটা পুষ্প দি, ঠাকুরদের সব পেবণাম কর। চল।

সীতারাম চলে গেল, রমানাথ উদাস মনে হুঁকো নিয়ে দাওয়ার উপর বসল। তার এই সাজানো চাষকর্মের টাট, পুরুষানুক্রমে বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা এই টাট, সেই টাটের দেবতার আজ পূজা বন্ধের সূচনা হল। রমানাথ অনেকটা পাগলের মতই এক-একা বোধ করি নিজেকে শুনিয়েই বলে উঠল—হয়ে গেল, লুটিশ আজ হয়ে গেল। কালপুরুষ এসে

বাঁশগাড়ি করে—এ টাটে শিলমোহর করলেই বাস, সব ফরসা! কাল, কাল, কালের গতিক! সেকালের গ্রাম সোনার গ্রাম। আঃ, কি সব সংসার! সোনার সংসার! সে কাল সে গ্রাম চোখের উপর ভাসছে। সেকালের গ্রাম। চোখে জল এল রমানাথের।

সে কালের কথা।

চাষী সদ্‌গোপের গ্রাম।

তের শো সালের চাষীদের গ্রাম। তাদের পাড়ার প্রান্তে বাউরীদের পল্লী। মণ্ডল মহাশয়দের চাষকর্মে তারা কৃষাণি মান্দেরি করে, গো-পালনে তাঁদের সাহায্য করে। ভোর রাত্রে কর্তা ওঠার পূর্বেই তারা বাড়িতে এসে হাজির হয়। কর্তা নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন, তার গরুগুলিকে গোয়াল থেকে বাইরে এনে খেতে দেয়। কর্তা তামাক সেজে তামাক খান, গরুগুলির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন, তিরস্কার করেন, শাসন করেন। আবার রাত্রিতে কাজের শেষ করেন গো-সেবা করে। গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে মশা-মাছি তাড়িয়ে গরুগুলিকে আপন আপন স্থানে বেঁধে দেন। কেউ জায়গা ভুল করলে তিরস্কার করে বলেন—বেকুব বেহুদ্দ-বদমাশ কোথাকার, নিজের জায়গা চেন না? তার পর তামাক খেতে খেতে স্মরণ করেন দয়াময় হরিকে।

মাটির ঘর, খড়ের চাল, বাঁশ অথবা কাঠের আটপলা খুঁটি দেওয়া দাওয়া, আলকাতরা মাখানো দরজা, রাঙা মাটিতে নিকানো দেওয়াল; তার উপর খড়ি ও গিরিমাটির আঁক আল্‌পনা, গোবরে-মাটিতে লেপা মেঝে এবং উঠান, এই নিয়ে তাদের ঘর। কারও কারও ঘর কোঠা অর্থাৎ দোতলা; অধিকাংশই ঘর কোঠা নয় অর্থাৎ একতলা। বাড়ির পাশে খিড়কি ডোবা, ডোবায় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘাট, সেই ঘাটে বসে চাষীবউয়েরা বাসন মাজে, কলমি-সুষনির দল থেকে শাক তোলে, পুরুষেরা পলুই ফেলে নিত্যকার মাছ সংগ্রহ করে।

ডোবার চারিপাশে সবজির ঘরটে ক্ষেত, শাকের আড়া, লাউ-কুমড়োর মাচা, তারই মধ্যে-মাঝে জাফরি-ঢাকা দুটি একটি ভাল জাতের আমের চারা, এ ছাড়া পেঁপে গাছ, জবা-করবীর গাছ আছে, ঘন সবুজ ফ্রেমের মত ডোবার জলটুকুকে ঘিরে থাকে। জবা-করবী গাছের ফুল তুলে ওরা নিজেরাই দেবস্থানে দিয়ে আসে, ফল-শাকও দিয়ে আসে, তাতে বিধিনির্দেশে মৃত্তিকা পরিচর্যার জন্য নিয়োজিত ওদের হাত দুখানি ধন্য হয়ে যায়। বাড়ির অন্য দিকে খামার এবং গোয়াল, এই দিকটাই ওদের বাড়ির সদর,—জমিদারের যেমন কাছারি, বাবুলোকের যেমন বৈঠকখানা, ওদের তেমনি খামার গোয়াল। একটা প্রশস্ত চালা, চালার সামনে অনাবৃত খামারে ধান, খড়, মরাই, গোয়ালের ঘরগুলির সামনে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি করে মাটি দিয়ে বাঁধানো ডাবার সামনে গরুগুলি সারি সারি বাঁধা থাকে। প্রশস্ত চালাটার মাথায় মাচায় তোলা থাকে চাষের সামগ্রী—লাঙল, জোয়াল, দুনি, সিনি, দড়ি; এমন কি দুনি ব্যবহারের 'এঁকা কাঠ' এবং লম্বা বাঁশটি পর্যন্ত তোলা থাকে।

সবল পেশীবহুল দেহ; মাথার চুল কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা, তার মাঝখানে টিকি, গলায় তুলসীকাঠের মালা, পুরুষদের পোশাক সাত হাত লম্বা দু হাত চওড়া—তাঁতে বোনা মোটা কাপড়, কাঁধে গামছা; মেয়েদের পোশাক ন হাত বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ওই তাঁতেরই শাড়ি; ভোরে উঠে পুরুষেরা যায় মাঠে, মেয়েরা গৃহকর্ম করে, গোসেবা করে, তার পর এক প্রহর বেলার পর রান্না চড়ায়, খাওয়াদাওয়া হতে দু প্রহর গড়িয়ে শেষ হয়ে যায়, বাবুদের গ্রাম রত্নহাটার ইস্কুলে তখন ঢং ঢং করে টিফিনের পর ইস্কুল বসার ঘণ্টা বাজে। ছেলেরা দশ বারো বৎসর পর্যন্ত গাঁয়ের পুরুতমশায়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শেখে, তার পর পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করে কর্তাদের সঙ্গে চাষের কাজে লাগে। ওরা জীবনে বেশী লেখাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। কি প্রয়োজন? ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ, ঘরের দুধ, ঘরের গুড় পরিতৃপ্তিসহকারে পেট পুরে খায়, ভগবানকে স্মরণ করে, মাথাব ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেতে পরিশ্রম করে, ক্ষেতের ফসল ফুলে ফলে ভরে ওঠে, ওদের জীবনও ভবে ওঠে অপরিসীম আনন্দে! সেই আনন্দে দু হাত তুলে সন্ধ্যায় খোল বাজিয়ে কীর্তনের দল নিয়ে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ে গায়—"ও নামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে। বল মাধাই মধুর স্বরে, হরিনাম বিনে আব কি ধন আছে সংসারে!" ওর বেশি ওদের ভাববার প্রয়োজন নাই, ভাবতেও চায় না। সুতবাং বেশী লেখাপড়া হবে কি? কোন রকমে মোটা আঁকাবাঁকা হরফে সই করতে পারলেই হল, দলিলে সাক্ষী হতে হয়, হ্যাণ্ডনোট তমসুক কোবলায় সই কবতে হয়, সুতরাং ওটুকু প্রয়োজন। আর দরকার শুভঙ্করীর পানের হিসাব, মণকষা হিসাব, মণকষা কাঠাকালি—ওগুলো জানতেই হয়। ওরই মধ্যে যারা ভাল লেখাপড়া শেখে, তারা মান্যের ব্যক্তি, জ্ঞানবান লোক। তাদের দাওয়ায় ওরা গিয়ে সন্ধ্যাবেলা বসে, তারা সুর করে রামায়ণ মহাভারত পড়ে, ওরা শোনে। জীবনতত্ত্ব সম্পর্কে বহু ব্যাখ্যা তাদের কাছেই ওরা সংগ্রহ করে।

এর অধিক ওদের জীবনে প্রয়োজন ছিল না। পাপ এবং পুণ্যের একটি সবল সহজ মীমাংসাবোধ ছিল। সেই বোধ অনুযায়ী জীবনসত্যকে গভীরভাবে অনুভব করবাব মত অন্তরের পরিসর এবং গভীরতাও ছিল। বাস্তব জীবনেও স্বল্প প্রয়োজন ছিল, অভাবের অশান্তি ছিল না, অন্তরে পরম সত্যকে পাওয়ার বিশ্বাসে ছিল গভীর শান্তি। চাষীর গ্রামখানির শান্ত কোলাহলহীন দিনরাত্রির সঙ্গে ওদের জীবনও চলে যাচ্ছিল প্রসন্নতার মধ্যে।

হঠাৎ দেশে এল এক জোরালো বাতাসের ঝাপ্‌টা। ঝাপ্‌টা ঠিক নয়, ঝাপ্‌টা হলে অল্প কিছুক্ষণ পরেই থেমে যায়;—এ বাতাস থামল না, উত্তরোত্তর জোর তার বাড়তে লাগল। বর্ষার পশ্চিমে বাতাসেব মত।

ভদ্রবাবুদের রত্নহাটা গ্রামে প্রথমে হল মাইনর ইস্কুল। রত্নহাটার ব্রাহ্মণেরা প্রায় সবাই জমিদার। পাখা থাকলেই পক্ষী হয়, দু-চার গণ্ডা জমিদারী স্বত্বের মালিকানায়

সবাই জমিদার। এত কাল দু-আনা ছ'পয়সা বোতল পাকি মদ আর বারো আনায় পাঁঠা কিনে ফিস্টি এবং ফিস্টির আসরে ফষ্টিনষ্টি করে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে নতুন ঢেউ জাগল, লেখাপড়া শিখবেন। মাইনর পাস করে বাবুদের ছেলেদের কজন সদরে গিয়ে আমমোক্তার হল, সাবরেজেস্ট্রী আপিসে কেরানী হল, আদালতেও চাকরি পেলে, কতক মাইনর পাস করে কীর্ণাহারের ইংরাজী ইস্কুলে পাস দিয়ে রেলে চাকরি পেলে —কলকাতায় সরকারী চাকরি পেলে—দারোগা হল, পোস্টমাস্টার হল, দু-একজন কলেজে পড়ে উকিল হল, একজন হল হাকিম। হাওয়া এসে চাষীর গ্রামেও লাগল। তাঁরা ওদিকে মুখ ফেরালেন। সদ্‌গোপপাড়ার মাতব্বর রঙলাল তার দুই ছেলেকে দিলে মাইনর ইস্কুলে। বড় ছেলে মাইনর পাস করে পাঠশালা খুললে। তার ছোটটিও মাইনর পাস করে পাঠশালার চেষ্টায় ঘুরতে লাগল। তার পরেরটি মাইনর ইস্কুলে পাস করে বৃত্তি পেলে। সেইবারই রত্নহাটায় হল বড় ইংরেজী ইস্কুল। রঙলালের বৃত্তি পাওয়া ছেলেটি বড় ইস্কুলে পড়ে পাস করে গেল কলেজে পড়তে। সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গোপপাড়ার সকল ছেলেই ভর্তি হল ইস্কুলে। বর্ষা নামল, মনের চাষ শুরু হল, নতুন ফসলের চাষ।

হঠাৎ একদিন সদ্‌গোপপাড়ায় প্রবীণ মহলও উৎসাহে গৌরবে চঞ্চল হয়ে উঠল। ছেলেরা বিস্ময়কর সংবাদ এনেছে। রত্নহাটার ইস্কুলে এসেছেন এক তরুণ সদ্‌গোপ শিক্ষক। চেয়ারে বসে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বাবুদের ছেলেদের গুরুগিরি করছেন। সমারোহের আসর বসল। সদ্‌গোপ মাস্টারটিকে তারা নিমন্ত্রণ করে একদিন নিয়ে এল। আসরে বসে মাস্টার অনেক বিচিত্র কথা বললেন। এমন সময় একটা পরম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। গ্রামের পথে হাজির হলেন রত্নহাটার বাবুদের বাড়ির ছেলেরা। রবিবারের ছুটিতে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। তারা শিকার সেরে ফেরার পথে সদ্‌গোপ মাস্টারের সামনে পড়ে গেলেন। বাবুদের ছেলেরা শিকারের পথে প্রায়ই যান আসেন এ গ্রামে— দয়া করে মধ্যে মধ্যে তেষ্টা পেলে বাতাসা ও গুড় মুখে দিয়ে জল খান। মণ্ডলেরা হেঁট হয়ে জমিদার ব্রাহ্মণকুমারদের প্রণামও জানায়। আজ আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। সদ্‌গোপ মাস্টারকে দেখে তারা দাঁড়াল এবং সম্ভ্রমভরে নমস্কার করলে তাকে। সদ্‌গোপ প্রবীণেরা ব্রাহ্মণনন্দনদের প্রণাম জানাতে গিয়ে থমকে গেল সবিস্ময়ে। মাস্টার হেসে বললেন —শিকার ?

হ্যাঁ স্যার।

বলে তারা চলে গেল।

সেই দিনই এ গাঁয়ে দ্বিগুণ বেগে ওই বাতাস বইতে শুরু করল।

রমানাথও তার ছেলে সীতাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলে এই উৎসাহে।

আঃ, সেদিন যদি সে বুঝতে পারত! পাঁচ বছর পড়ে সীতারাম থার্ড ক্লাস পর্যন্ত নিয়মিত

উঠে হঠাৎ থমকে গেল। ইংরিজীর বাধায় আর অগ্রসর হতে পারলে না। পর পর দু বছর ফেল হল। দু বছরের পর রমানাথ হঠাৎ একদিন তাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দিলে। কারণ ঘটেছিল। তখন রমানাথ লেখাপড়ার আর একটা দিকের চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এদিকটা তার চোখে পড়ে নি, মনে ওঠে নি; তা হলে সীতাকে সে ইংরাজী ইস্কুলে পড়তে দিত না। ওপাড়ার মহাদেব পালের ছেলে চণ্ডী সীতারামের বয়সী এবং পড়তও সীতারামের সঙ্গে, সে সীতারামকে ছাড়িয়ে আরও এক ক্লাস উপরে উঠে আটকে ছিল। তাকে সেদিন এক হাতে একটি ফুল ঘুরাতে এবং অন্য হাতে জ্বলন্ত বিড়ি নিয়ে গান গাইতে দেখলে সে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের বাইরে একটি গাছতলায় বসে সন্ধ্যার আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে ছোকরা গান গাচ্ছিল, "সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা"। অবাক হয়ে গেল রমানাথ। সীতার প্রমোশনের জন্য ইস্কুলে বড় মাস্টারের কাছেই গিয়েছিল, রমানাথ খারাপ মন নিয়েই ফিরছিল; হঠাৎ চোখে পড়ল এই দৃশ্য। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। পরের দিনই সকালে তার জ্ঞাতিভাইয়ের বাড়িতে গোলমাল শুনে গিয়ে দেখলে, জ্ঞাতি ভাই বল্লভ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, তার ছেলে ঈশ্বর বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে পালিয়েছে! ঈশ্বরও সীতারামের বয়সী। সে ফিফ্‌থ ক্লাসেই আটকে ছিল আজ কয়েক বৎসর। এবারও ফেল করেছে এবং তাই নিয়ে আগের দিন ঝগড়া করেছিল বাপের সঙ্গে; তার ফলে রাত্রেই কখন বাক্স ভেঙে একমুঠো টাকা--পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন টাকা নিয়ে সে পালিয়েছে।

বল্লভ বললে, ইস্কুলে ছেলে যেন আর পড়িও না কেউ।

রমানাথের ভাল লাগল কথাটা। বাড়ি এসেই সে সীতারামের পড়া ছাড়িয়ে দিলে, আর পড়াতে কাজ নাই।

সীতারাম অবশ্য ওদের মত ছিল না। সে বরাবর মোটা কাপড়-জামাতেই সন্তুষ্ট, জুতোর দরকার তার সেদিনও হয় নাই; মাথায় চুল সে সমান করেই ছাঁটত। কোন নেশাও সে করত না,—রমানাথের হুঁকো-তামাক আজও নড়ে নাই। তবুও সে ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হয়ে ওঠে, বললে, আর পড়তে হবে না, চাষবাস দেখ।

সীতারাম চুপ করে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন প্রতিবাদ করলে না। দু দিন পর হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে রমানাথ চমকে উঠল। গরমের দিন—সীতারাম দাওয়ায় বেরিয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে গুনগুন করে গান গাচ্ছিল। গরমের দিনেও গ্রামাঞ্চলে বাইরে কেউ শোয় না; অল্পবয়সীরা দু-চারজন কর্তাদের লুকিয়ে শুলেও কর্তারা কখনও শোয় না। চোর-ডাকাতের ভয়ে নিষেধ আছে পিতৃপুরুষের। তারা এসে সর্বাগ্রে আয়ত্তের মধ্যে চায় কর্তাকে। অন্য লোককে অল্পস্বল্প নির্যাতন করেই রেহাই দেয় ডাকাতরা, কর্তার রেহাই নাই। সর্বস্ব দিয়েও রেহাই নাই। আর কিছু নাই—এ কথা ডাকাত-চোরে বিশ্বাস করে না; নির্মমভাবে প্রহার

করে ; অনেক সময় খুন করে দিয়ে যায়। যাক সে কথা। বাইরের গুনগুন শব্দে ঘুম ভেঙে রমানাথ জানলা দিয়ে দেখলে, সীতারাম বাইরে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে গুনগুন করে গান গাইছে, "আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল—সকলি ফুরায়ে যায় মা"। রমানাথ আরও আশ্চর্য হয়ে গেল, সীতারামের চোখে জল দেখে ; চাঁদের আলো তার মুখের উপর পড়েছে, জ্যোৎস্নার ছটায় চোখের কোণ থেকে চিবুকের প্রান্ত পর্যন্ত জলের ধারা দুটি চকচক করছে। বুকটা তার টন টন করে উঠল। সীতারাম তার মায়ের জন্য কাঁদছে। নিজের চোখেও জল এল তার। ধীরে ধীরে দরজা খুলে বাইরে এসে সে ছেলের মাথাটি নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

কিছুক্ষণ পর তার চমক ভাঙল, চৌকিদারের ডাকে। রাত্রি দুপহর পার হতে চলেছে। ছেলেকে সে বললে, আয়, আমার ঘরে শুবি আয়। চিরদিনই সীতারাম শান্ত বাধ্য। সে প্রতিবাদ করলে না, নিজের ঘরের মাদুর এবং বালিশটা নিয়ে বাপের কাছে এসেই শুলে।

সস্নেহে রমানাথ এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করলে, মাকে তোর স্বপন-টপন দেখেছিলি নাকি ?

সীতারাম কোন উত্তর দিল না।

রমানাথ কিছুক্ষণ পর আবার প্রশ্ন করলে, তোর মা কিছু বললে ?

সীতারাম তবুও চুপ করে রইল।

রমানাথ বললে, ঘুমো। স্বপন মানুষ দেখে। তার পর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তোকে নিয়েই তো আমার সংসার। তোর মুখের দিকে তাকিয়েই তো আমি চুপ করে থাকি। আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, তুই কাঁদলে আমি বুক বাঁধি কি করে, বল্ ? সে উঠে এসে ছেলের বিছানার পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, ঘুমো।

সীতারাম স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল, কিন্তু ঘুম তার এলো না, সে কথা রমানাথের বুঝতে দেরি হল না। সে পাখাটা নিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করলে। এবার সীতারাম হাত বাড়িয়ে পাখাটা নিয়ে বললে, না।

রমানাথ পাখাটা দিলে না এবং সীতারামের কথার জবাব পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠল ; সেই উৎসাহের মধ্যে হঠাৎ সান্ত্বনার উপায় খুঁজে পেলে, বললে, এই বছরই তোর বিয়ে দোব আমি।

সীতারাম চমকে উঠল, উঠে বসল। বললে, না।

না ! রমানাথ আশ্চর্য হয়ে গেল। না—কি ? বিয়ে করবি না ? একি অসম্ভব কথা !

না ! আমি পড়ব।

পড়বি ? রমানাথ স্থির দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে রইল অন্ধকারের মধ্যেই। এতক্ষণে

সব তার কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল। 'সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল'—হরি হরি, পড়ার সাধ-আশা! রমানাথ উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল, বলল, বেশ তাই পড়বি। এখন ঘুমো। মিটবে তোর সাধ-আশা!

সীতারাম বললে, আমি হুগলীতে নর্মাল পড়ব।

হুগলীতে? চমকে উঠল রমানাথ। হুগলী যে অনেক দূর! তা ছাড়া এখানে পড়া ঘরের ভাত খেয়ে হয়, সেখানে খরচ।

মাসে বারোটা টাকা হলেই হবে আমার।

রমানাথ জবাব দিল না। পাশ ফিরে শুল।

পরদিন রমানাথ সকালে উঠেই রান্না চড়ালে। সীতারাম উঠতেই বললে, ভাত নামিয়ে নিস। আমি মাঠে চললাম। খেয়ে তুই তাই ইস্কুলেই যাস। এই ভাবেই তার বিপত্নীক সংসার চলে আসছিল। সে ডাল নামিয়ে একটা তরকারি রান্না করে ভাত চাপিয়ে দিয়ে মাঠে চলে যেত, সীতা পড়ত, পড়ার মধ্যেই ভাতটা নামিয়ে ফেলত। বাপের জন্য ঢেকে রেখে নিজে খেয়ে জ্যাঠার বাড়ি চাবি রেখে ইস্কুলে যেত। ফিরত বেলা পাঁচটায়। রত্নহাটা আড়াই মাইল পথ। সেদিন অপরাহ্নে সীতারাম ফিরল ছটায়। রমানাথ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল; সকল ছেলে ফিরল, সীতা ফিরল না, তার ভয় হল; সর্বাগ্রে সে বাক্স-প্যাটরা দেখলে। বাক্স ভেঙে টাকাকড়ি নিয়ে বল্লভদাদার ছেলে ঈশ্বরার মত পালাল না তো? না, বাক্স-প্যাটরা ঠিক আছে। কিন্তু তবুও মন মানল না। ঈশ্বরার মত বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে না পালাক, এমনই এক-কাপড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে তো পারে! কাল রাত্রেই তো সে কাঁদছিল আর গাইছিল—'সাধ না মিটিল'। রমানাথ গ্রামের বাইরে পথের উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সীতা ফিরল, তার সঙ্গে রত্নহাটারই সেই সদ্‌গোপ পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত বললেন, মণ্ডল মশাই, সীতারাম আমাকে ধরেছে, ও নর্মাল ইস্কুলে পড়বে। আপনার মত আমাকে করিয়ে দিতে হবে।

রমানাথ কি বলবে খুঁজে পেলে না।

পণ্ডিত বললেন. ইংরিজী ও ভাল পারে না, তাই এখানে ফেল হচ্ছে, নর্মাল পড়লে ওর ভাল হবে।

রমানাথ এবার বললে. সে তো হুগলীতে পড়তে যেতে হবে।

হ্যাঁ, এই হুগলীতে। আজ চিঠি দিলে কাল চিঠি যায়। সকালে চড়লে বেলা বারোটায় পৌঁছানো যায়, এ আর দূর কি?

রমানাথ চুপ করে রইল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সীতা দাওয়ার এক কোণে বসে কাঁদছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বেশ, তাই হবে।

রমানাথ তাই করলে। এক মুখ হাসি নিয়ে সীতারাম বাপের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে

হুগলী যাত্রা করলে।

পণ্ডিত মশাইটিও হেসে বললেন, সীতারাম আপনার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। চন্দ্রসূর্যের মত পারবে না—তবে মাটির প্রদীপের মত পারবে।

রমানাথ শুষ্ক হাসি হাসলে, কোন জবাব দিলে না। নীরবে ছেলেকে রত্নহাটা স্টেশনের একধারে ডেকে নিয়ে বললে, একটি কথা কিন্তু আমাকে দিতে হবে। এইবার তোমার বিয়ে দোব আমি। 'না' বললে হবে না।

সীতারাম মাথা নীচু করে বললে, বেশ।

নর্মাল ইস্কুলে পড়ার প্রথম বৎসরেই তার বিয়ে দিলে রমানাথ, বউটির নাম মনোরমা, সীতারামেরও তাকে ভাল লাগল। এই তিন বৎসরের মধ্যে ছুটিতে যতবার বাড়ি এসেছে, ততবারই কয়েকদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে সীতারাম। রমানাথই তাকে পাঠাত। বিয়ের সময় মনোরমা ছিল বারো বছরের ছোটখাটো মেয়েটি। তখন তার সঙ্গে কথা বলতে সীতারামের অনেক সময় হাসি পেত। বিয়ের পর গরমের ছুটিতে সীতারাম প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি গেল, সঙ্গে নিয়েছিল একখানা পাঠ্য বই—মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। গরমের দিন খাওয়ার পর শাশুড়ী তাকে তাদের নতুন মাটির কোঠাঘরের সিঁড়ির দরজা দেখিয়ে বললেন, উপরে গিয়ে শোওগে বাবা, বিছানা করা আছে। তোমার জিনিসপত্র সব উপরেই রেখে দিয়েছি।

সীতারাম উপরে এসে ঘরের দরজা খুলে দেখলে, মনোরমা আগেই এসে বসে আছে, তার বইখানা খুলে পড়ছে। সীতারাম পুলকিত হয়ে উঠল। মনোরমা লেখাপড়া জানে! দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে সীতারাম এসে বসল মনোরমার পাশে। মনোরমা তখন অবশ্য একহাত ঘোমটা টেনে সরে বসেছে বইয়ের কাছ থেকে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর প্রথম আলাপ। প্রথা অনুযায়ী জোর করেই তার ঘোমটা খুলতে হবে, সাধ্যসাধনা করে তাকে কথা বলাতে হবে। সাধ্যসাধনাতেও কথা না বললে স্বামীকে অভিমান করতে হবে।—বেশ, আমার সঙ্গে কথা বলবে কেন, বল? আমি তোমার কে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে হবে, কালই চলে যাব আমি। সীতারামকে এতটার কিছুই করতে হয় নাই, ঘোমটা খুলে দিতেই মনোরমা ফিক করে হেসে ফেলেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে শুরু করলে।

সীতারাম হঠাৎ বইখানা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করলে, কোন্‌খানটা পড়ছিলে? কেমন লাগল?

মনোরমা ঠোটের ভঙ্গীতে ভাল না লাগার ভাব ফুটিয়ে তুলে ঘাড় নেড়ে বললে, ছাই বই তোমার। একটাও ছবি নাই।

সীতারাম বললে, তুমি একটা পাগলী। পড়ে বুঝতে পারলে না, এ হল মহাকাব্য।

এতে কি ছবি থাকে ?

শব্দটার ধ্বনিতে বিস্মিত হল মনোরমা, মহাকাব্যের—মহা শব্দের গাম্ভীর্য এবং গুরুত্বটা ধ্বনির প্রভাবে ওর মনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বললে, মহাকাব্য! তার পর অপরাধবোধে লজ্জিতের মত বললে, কে জানে! আমি তো পড়তে জানি না। আমি ছবি দেখতে গেলাম। পাঁজিতে কত ছবি থাকে। দাদার ইস্কুলের বইয়ে কত ছবি আছে। একটা বাঘ আছে খুব ভাল।

হাসলে সীতারাম। বললে, আচ্ছা শোন। সে পড়তে আরম্ভ করলে—

"সম্মুখ-সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে—
অকালে। কহ, হে দেবী অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি' সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
রাঘবারি ?"

বুঝলে ? রামায়ণের ব্যাপার। লঙ্কার যুদ্ধে রাবণের বীরপুত্র বীরবাহু মারা পড়েছেন। রাম তাকে বধ করেছে। তার পর থেকে আরম্ভ হচ্ছে আর কি।

বালিশে মাথা রেখে মনোরমা তখন শুয়েছে। সে বললে, হুঁ।

তাই কবি মা-সরস্বতীকে বলছেন আর কি। সে আরম্ভ করলে। একেবারে পড়ে গেল—"গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" পর্যন্ত। তার পর সে থামলে। বললে, এইবার আরম্ভ হল। রাবণ সিংহাসনে বসে আছেন, বুঝেছ ?

মনোরমার সাড়া পাওয়া গেল না। সীতারাম একটু ঝুঁকে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, মনোরমা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন।

সন্ধ্যেবেলা মনোরমা বললে, ওসব পড়লে কিন্তু ভাল হবে না বাপু। গান গাইতে পার তো একটি গান গাও, সবচেয়ে ভাল বলব যদি একটি গল্প বল—ভূতের গল্প।

তিন বৎসর এমনিই কেটেছে। এর পর শেষ পরীক্ষায় সীতারাম ফেল হয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার আগে আর শ্বশুরবাড়িই গেল না। মনোরমার কথাও সে এক রকম ভাবলে না। প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সে শুধু পড়লে, পড়লে আর পড়লে। পরীক্ষা শেষ করে তার পর মনে হল মনোরমার কথা। শীতের শেষে রিক্তপত্র রক্তকাঞ্চনের গাছ অকস্মাৎ যেমন একদিন ফুলে ভরে উঠে, তেমনই ভাবেই মন সেদিন মনোরমার চিন্তায় ভরে উঠল। পরীক্ষা শেষ করে মেসে যখন ফিরল, তখনও তার মনোরমার কথা মনে হয় নাই, তখনও কে কেমন লিখেছে সেই নিয়ে আলোচনা চলছিল। তার পর এল জিনিস গুছিয়ে নেবার পালা। এই সময়ে মনে হল একবার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বাবাকে। বাড়ি যেতে হবে আগে।

কিন্তু সেইদিন রাত্রেই স্বপ্ন দেখলে বাবাকে নয়, মনোরমাকে। সকালবেলায় তার মন মনোরমার জন্যই আকুল হয়ে উঠল। সে বাড়ি না এসে উঠল শ্বশুরবাড়িতে। এক বৎসর—প্রায় এক বৎসর সে মনোরমাকে দেখে নাই ; সে তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। মনোরমা মাথায় বেড়েছে, যৌবন-উচ্ছ্বাসে সর্বাঙ্গ ভরে উঠেছে ভরা নদীর মত। বাড়িতে ঢুকে অবগুণ্ঠনবতী মনোরমাকে সে চিনতে পর্যন্ত পারলে না ; অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করে মনোরমা তার দিকে তাকালে, সীতারাম তবু চিনতে পারলে না। মনে হল চেনা কিন্তু ঠিক মনে পড়ে না। মনোরমা ঈষৎ হাসলে, সম্বর্ধনা জানালে। এবার চিনলে সীতারাম। বিস্ময়ে আনন্দে সে আকুল হয়ে উঠল। ঘরে নির্জনে দেখা হল। নিজে এগিয়ে এসে দুটি হাত দিয়ে সে সীতারামের কণ্ঠ বেষ্টন করে কাঁধের উপর মুখ রাখলে। জিজ্ঞাসা করলে, এবার ঠিক পাস করবে তো ?

মনোরমার কথার জবাব দিতে গিয়ে সীতারাম হঠাৎ তার উত্তরপত্র সম্বন্ধে কেমন সন্দিহান হয়ে উঠল। এই প্রথম তার মনে হল, হয়তো পরীক্ষা তার ভাল হয় নাই। বললে, চেষ্টার তো কসুর করি নাই।

মনোরমা বললে, এবার তুমি নিশ্চয় পাস হবে।

যদি না হই ?

হবে না ? কেনে ? এত পড়লে ?

পড়া ছাড়া অদৃষ্ট বলে একটা জিনিস তো আছে।

তা আছে।

তবে ?

হেসে মনোরমা বললে, তা হয়তো হবে ! অদৃষ্ট !

অদৃষ্টই বটে। সীতারাম এবারও আবার ফেল হল : ব্যর্থতার সংবাদ এল চিঠিতে। তখন সে বাড়িতে।

পরীক্ষায় ব্যর্থতার খবর সীতারাম মাথা হেঁট করেই গ্রহণ করলে। আর সে কাঁদলে না। রমানাথ গোপনে কাঁদলে। ছেলের পড়াশুনার জন্য খুব বেশী কামনা তার ছিল না, তবে সীতা পড়ে-শুনে একজন খুব পণ্ডিত লোক হোক, এমন কল্পনা করতে তার অবশ্যই ভাল লাগত, এই পর্যন্ত। রঙলাল মণ্ডলের সেজো ছেলে বি. এ পাস করে এম. এ পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওকালতিও পড়ছে। তাকে ভাগ্যবান বলেই মানতে হয়, ওই ছেলেটিকে—কিশোরকৃষ্ণকে দেখে দশের সঙ্গে তার ও মন খুশিতে ভরে ওঠে। বাইরের দশজনের কাছে কিশোর তার গ্রাম-সম্পর্কে ভাইপো—এ অহঙ্কার করতেও ইচ্ছে হয় ; সঙ্গে সঙ্গে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবত, সীতা যদি নর্মাল না পড়ে এখানকার পাস দিয়ে অন্তত একজন মোক্তারও হত, তবে ভাল হত। এ সবই সত্য, তবুও তার সঙ্গে এ কথাও সত্য যে এ নিয়ে একটা অনির্বাণ দাহময় আকাঙ্ক্ষা

তার ছিল না। শান্ত সরল মানুষ রমানাথ। বিপত্নীক হয়ে ওই সীতারামের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশেই সে আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নাই। বিবাহের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হত, সে তো এ বাড়িতে তার সীতারামের মা হয়ে আসবে না, সৎমা হয়ে আসবে। অন্তরে অন্তরে সে তার অকল্যাণ কামনা করবে। সভয়ে শিউরে উঠে সে বিবাহের কল্পনা মন থেকে মুছে ফেলত। বুকে করে সীতাকে সে মানুষ করেছে; সীতা তার কাছে অহরহ চোখের সম্মুখে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকে, এইটাই তার সবচেয়ে বড় কামনা। তাই লেখাপড়া শিখে সীতা চাকরি করতে বিদেশে যাবে, এই কাল্পনিক বিরহের আশঙ্কায় তার লেখাপড়ার সার্থকতার কল্পনাটা বরাবরই খাটো হয়ে এসেছে। সীতা কতবার বলত, নর্মাল পাস করে কাব্যতীর্থটা যদি পাস করতে পারি, তবে হাই ইস্কুলে হেডপণ্ডিতের চাকরি একটা পাবই।

রমানাথ নীরবে পুড়ুৎ পুড়ুৎ শব্দে নিজের হুঁকোটিতে টান দিয়েই যেত।

প্রসঙ্গক্রমে সীতারাম তুলত চাকরিস্থানে বাসার কথা। বলত ছোটখাটো বাসা করা যাবে। আপনি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত, দু বেলা দুটো ছেলে পড়ালে আরও বিশ-পঁচিশ টাকা আসবে। আপনি সংসার দেখবেন, আমার ভাবনা কি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমানাথ বলত, বাড়ি ছেড়ে কি আমার যাওয়া চলে বাবা? জমি-জেরাৎ, গরু-বাছুর, ধান-পান, চাষ-বাস, নবান্ন-লক্ষ্মী—

সীতারাম এ সমস্যার সমাধান করে দিত অতি সহজে। কেন? জমি-জেরাৎ ভাগে দেবেন, গরু-বাছুর পালনে দেবেন, ধান-পান বছরে একবার এসে বেচে দিয়ে গেলেই হবে। নবান্ন-লক্ষ্মী সে আমরা যেখানে থাকব, সেখানেই হবে।

রমানাথ ঘাড় নাড়ত, না না না। তা হবে না। ভিটেতে দুবেলা সন্ধ্যে পড়বে না! তা ছাড়া—। একটু চুপ করে রমানাথ মনে মনে ভাবত, তার পর বলত, বাবা, আমার জমি অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতে সোনাফলানো জমি হয়েছে। ডাকলে রা কাড়ে। উঁহু। আবার একটু চুপ করে থেকে বলত, তুই বরং বউমাকে নিয়ে বাসা করবি। আমি কালে-ভদ্রে যাব, দেখে আসব। সীতারাম চুপ করে থাকত এর পর। তার পর বলত, তা হলে বাড়িতেই সব থাকবে। আমি আসব ছুটি-ছাটায়। আপনি না গেলে বাসা করে কি করব?

রমানাথের চোখে জল আসত, সে একটু বেশী জোরে টান দিত হুঁকোয়। তামাকের ধোঁয়ায় আপনার মুখের সামনে ধূম্রজালের সৃষ্টি করত।

সীতারাম আবার বলত, রত্নহাটায় যদি কাজ পাই, তবে তো কোন কথাই নাই। বাড়ির খেয়েই চলবে। যেমন খেয়ে-দেয়ে ইস্কুলে পড়তে যেতাম, তেমনই চলবে আপনার।

রমানাথ হেসে বলত, এখানকার ইস্কুলে কাজ দেবে না বাবা। দেবেও না, আর

নেওয়াও, ইয়ে কি বলে, মানে, ঠিক হবে না। রত্নহাটার বাবুরা আমাদিগে 'চাষা' বলে উঁহু—না না, না। তার চেয়ে বিদেশ-বিভূঁয়ে ভাল।

হঠাৎ সব কল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে ডাকে চিঠি এল—সীতারাম এবারও ফেল হয়েছে।

রত্নাহাটার ডাকঘর থেকে সীতারাম নিজেই চিঠি নিয়ে এল। মাথা হেঁট করে নিজে বললে, এবারও পাস করতে পারি নাই বাবা।

তার শুকনো চোখ দেখে রমানাথ নিজের চোখের জল সম্বরণ করলে, নইলে তার চোখে জল এসেছিল।

দিন তিনেক পরে রমানাথ বললে, সীতা বাবা, ঘরে বসে চাষ-বাস দেখ্। বউমাকে নিয়ে আসি। তুই বাড়িতে না থাকলে তারও এখানে মন টেকে না। এক মাস দু মাস যেতেই বাপের বাড়িতে যেতে চায়। বাপের বাড়িতে রাখাও আর তাকে ভাল দেখায় না।

সীতারাম অভ্যাসমত একটু চুপ করে থেকে বললে, যা আপনার ইচ্ছা হয় করুন। দি দেখে একটা চিঠি লিখে দিন।

রমানাথ বললে, যা আমার আছে, তাতে তো তোর কিছু অভাব হবে না। পড়া তো ভাগ্যে নাই ; নইলে চেষ্টার তো কসুর করিস নাই তুই, আমি তো জানি। আর একবার হয়—। রমানাথ কথাটা শেষ করতে সাহস পেল না।

সীতারাম বললে, নাঃ, আর পড়ব না।

রমানাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হেসে বললে, মুখ্যু তো বলতে পারবে না কেউ তোকে!

সীতারাম হাসলে। বাবার এ সান্ত্বনায় তার চোখ ফেটে জল এল, তাই সে হাসি দি সেটাকে ঢাকতে চেষ্টা করলে। পরমুহূর্তে সে উঠে চলে গেল।

বউটিকে এখানে আনবার দিন হয়েছে এই মাসের পঁচিশে। রমানাথ নিজেই গি নিয়ে আসবে। সীতানাথ যেতে সঙ্কোচ বোধ করবে—এ কথাটা মনে বুঝে রমানাথ নিজে বলেছে, বুঝলি, আমিই যাব বউমাকে আনতে। অনেকদিন বেয়াই মশায়ের সঙ্গে দেখা নাই, তা ছাড়া বেয়াইবাড়ির বেয়ানের রান্না ভালটা-মন্দটা খেয়ে আসব ; কাছেই দু কো দূরে মা গঙ্গা—একবার চানও হবে। তোকে কিন্তু বাপু কটি কাজের ভার দিয়ে যাব, সেগু যেন করে রাখিস। কাজ—তক্তাপোশ মেরামত, প্রতিবেশীর বাড়িতে দুখানা নতুন কাঁ তৈরি করানো, ঘর-দুয়ার একবার খড়িমাটি দিয়ে নিকোনো। আরও কয়েকটি এমনিধা ছোটখাটো কাজ। বেয়াই-বাড়ি রওনা হবার আগে নিজেই সব শেষ করবার জন্যও রমানা চেষ্টা করবে, তবে যদিই না হয়, সেগুলোর ভার নিতে হবে সীতারামকে।

রমানাথ সেই সব কাজেই ব্যস্ত ছিল—ব্যস্ত কথাটায় ঠিক ব্যক্ত হবে না, সে প্রায় ম হয়ে উঠেছিল। রমানাথের কত সাধের সংসার. সেই সংসারে লক্ষ্মী আসবে। সীতারা সংসারী হবে।

সীতারাম চুপ করে বসে দেখত সব। প্রাণপণে ভাল লাগবার চেষ্টা করত। ব্যর্থতার থ ভুলতে চাইত। মনোরমাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করত এই পরিমার্জিত ঘরকন্নার ঝখানে। পুলকিত হতে ইচ্ছা হত। কিন্তু সে ইচ্ছা মনে উঠেই যেন মিলিয়ে যেত। চউ যেন চাবুক মারত সঙ্গে সঙ্গে।

বিবাহের পর প্রথম পরিচয় থেকেই সে মনোরমাকে জানিয়ে এসেছে, সে লেখাপড় খেছে, সে পণ্ডিত হবে, সে সদ্‌গোপ হয়েও চাষী হবে না। কি করে, কোন্ মুখে সে ড়াবে মনোরমার সামনে ?

তা ছাড়া কামনার আগুন অহরহ জ্বলে তাকে অস্থির করে তুললে। যে কামনার পথ দ্ধ হওয়ায় একদিন রাত্রে সে 'সাধ না মিটিল আশা না পুরিল' গান গেয়েছিল, যে কামনার স্থিরতায় সে হুগলী পড়তে গিয়েছিল, সেই কামনার অস্থিরতা। শেষে সে সেই চাষীতে রিণত হবে ? আগুন জ্বলেছে সেই কবে, তখন বুঝা যায় নাই। আজ আর সে ভবে না।

এই গ্রামে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে জমিদারের নায়েব একদিন বলেছিল অনেকদিন আগে, তার পষ্ট মনে আছে, বলেছিল, চাষাসে বিনা দাতা নেহি, বিনা জুতাসে দেতা নেহি। বাবুরা লে—চাষা !

সীতানাথ আবার উঠে দাঁড়াল শক্ত পায়ের উপর ভর দিয়ে। বাপ্‌কে না বলেই চারি-কে খুঁজতে আরম্ভ করলে শিক্ষকতার কাজ। নর্মাল পাস করেও সে যা করত, তাইই রবে।

তার পর সে রমানাথের কাছে নিয়ে এল এক অদ্ভুত প্রস্তাব। রত্নহাটায় তাদেরই গামে াট-আনা রকমের জমিদারের বাড়িতে দুটি ছেলেকে পড়াবার জন্য গৃহ-শিক্ষকের প্রয়োজন ; বেলা খাওয়া আর বেতন চার টাকা। সীতারাম কদিন ধরে চারিদিক ঘুরেছে। একদিন গয়েছিল বিপ্রহাট। বিপ্রহাট এখান থেকে চার মাইল দক্ষিণে। সেখানে একটা মাইনর স্কুল আছে। দিন দুই গিয়েছিল অভয়াপুর। রত্নহাটা তাদের গ্রামে থেকে আড়াই মাইল উত্তরে, রত্নহাটার আরও সাত মাইল উত্তরে অভয়াপুর, অভয়াপুরেও একটা মাইনর ইস্কুল াছে। কিন্তু কোথাও কিছু হল না, সীতারাম শুকনো মুখেই বাড়ি ফিরছিল, হঠাৎ দেখা ল জমিদার-বাড়ির চাষ-সরকার কানাই রায়ের সঙ্গে। কানাই রায় সমস্ত শুনে প্রস্তাব রলে, আমাদের বাড়িতে ছোট দুটি বাবুকে পড়াবার পণ্ডিত চাই। পড়াবে ? সীতারাম দ্বিধা রলে না, সম্মত হল। দুটি ছেলেকে পড়াতে হবে, দু বেলা খাওয়া আর চার টাকা বেতন। মানাথ জানে, ওই চার টাকা বেতনও সে নিয়মিত পাবে না, হয়তো পুরোও পাবে না ! জমিদার-বাড়ি প্রজার ছেলের কাছে বিদ্যে সেলামী নিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না। তবে ানবে না সীতারাম। সে দু বেলা ছেলেদের পড়াবে, আর দশটা থেকে চারটে বাবুদের

ঠাকুরবাড়িতে ছোট ছেলেদের জন্যে একটা লোয়ার প্রাইমারী পাঠশালা খুলবে, মাইনে ছেলে পিছু চার আনা। তাতেই বা ক টাকা হবে? আর জমিদারবাবুদের বাড়ির ছেলেরা—এ চাষীরা গাঁয়ের ছেলেকেই কি তারা মাস্টার পণ্ডিত বলে খাতির করবে?

সীতারামই জানে।

রমানাথ বলেছিল, পাঠশালাই যদি করবি তো গেরামেই কর্ না কেন?

সীতা বলেছে, জেঠার ছেলে জাঠতুত ভাই বড় দাদা, গোবিন্দদাদা—সে পাঠশালা করে আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করব?

রমানাথ এ কথার জবাব দিতে পারলে না। কিন্তু পেটভাতা আর চার টাকা মাইনে পণ্ডিতি করে হবে কি?—এ কথার জবাবও সীতারামও দিতে পারলে না। না পারুক, জবা হয়তো নাই, তবু—

তবু সীতারাম কিছুতেই মানবে না। তার চোখের উপর ভাসছে একদিনের ছবি রত্নহাটার বাবুদের ছেলেরা এই গ্রামের সদ্গোপ শিক্ষককে নমস্কার করেছিল। আগু সেইদিন জ্বলেছে।

শেষ পর্যন্ত খেয়ে-দেয়ে রোজ বাড়ি আসবে এবং জমিদার সেরেস্তার কাজ শেখার ব্যব হবে—কানাই রায় এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় রমানাথ আর আপত্তি করলে না।

একখানি রামায়ণ, কৃষ্ণের শতনাম, লক্ষ্মীর পাঁচালী, এই নিয়ে একটি দপ্তর রমানা ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে দিলে। তুলসীতলার মৃত্তিকা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে ফোঁটা দি কপালে। তার পর মাথায় হাত দিয়ে একশো আটবার কৃষ্ণনাম জপ করে সর্বাঙ্গে তিনব হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, ভগবানের নাম করে যাত্রা কর বাবা। পাপ কিছু করো না, উঁ দিকে চেয়ো না। বলতে গিয়ে ঠোঁট তার কাঁপতে লাগল। চোখের কোণে দু ফোঁ জলও এসেছে।

সীতারাম প্রণাম করলে।

আবার একবার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে রমানাথ বলল, রোজ রাত্তিরে বাড়ি আসবে লণ্ঠন নিয়ে আসবে, আর একটি লাঠি।—বলে সে নিজের যৌবনের সহচর—বাঁশে লাঠিগাছটি ছেলের হাতে তুলে দিলে। সাপখোপ শেয়াল-নেকড়ে দুষ্টু বদমাশ এতে ঠেকিয়ো।

সীতারাম যাত্রা করলে। গ্রাম পার হয়ে মাঠ, মাঠের ওপারেই রত্নহাটার দালানকো দেখা যায়। বড়লোকের গ্রাম। শিক্ষায়-দীক্ষায় সভ্যতায় বাবুরা বিশিষ্ট। সীতারাম বাল্যকা ওই ইস্কুলে পড়েছে। তারপরও বহুবার গিয়েছে। তবুও এই গ্রামের বিচিত্র লোকগুলি দেখে বিস্ময় তার কাটে নাই, শুধু বিস্ময় নয়, খানিকটা ভয়ও যেন হয়, ভয়ও শুধু নয়, ওদে প্রতি ক্ষোভও আছে। বাবুরা তাদের ঘৃণা করে, সে কথা তারা প্রকাশ করে অসঙ্কোচে

বলে চাষা। অসঙ্কোচে বলে, তোমরা তো জাতে চাষা। বুকটা আপনিই পাক খেয়ে ওঠে।

কিন্তু তার অন্তরের ক্ষোভ সে প্রকাশ করতে পারে না। তাদেরই মধ্যে সে চলল। সেইখানে থাকতে হবে তাকে।

ভয় সে করে না। কিসের ভয়, কেন ভয়? অন্যায় সে করবে না, কারও অন্যায় সহ্যও সে করবে না! তবুও যেন কেমন মনে হচ্ছে!

স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে সে মাঠের পথে এগিয়ে চলল রত্নহাটার দিকে।

দুই

মস্ত বড় বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আধা শহর। সে দু দিকেই—ভিতর এবং বাহির দু দিকের রূপেই। সীতারামের জাঠতুত ভাই কিশোরকৃষ্ণ এম. এ. পড়ে। রত্নহাটার কথা উঠলেই সে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলে, রত্নহাটার তুলনা হয় একমাত্র পাড়াগাঁয়ের কলকাত্তাই কলেজী ছেলের সঙ্গে —অবশ্য নেহাত হালী নয়, আবার একেবারে পাকাও নয়, এই ফার্স্ট ইয়ার পার হয়ে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে আর কি। বাড়ির অবস্থা ভাল, নিয়মিত টাকা আসে, পনেরো দিন অন্তর চুল কাটে, এক দিন অন্তর কামায়, কিন্তু সেলুনে এখনও ঢুকতে পারে না। রেস্তোরাঁয় চা টোস্ট মামলেট খায়, কিন্তু ফাবুপো কি অন্য সাহেবী হোটেলে যায় না, ভয়ও করে, রুচিতেও বাধে; কবিতা লেখে না, কাব্যচর্চা করে, ইউরোপীয় লেখকদের এবং বইগুলোর নাম মুখস্থ করেছে, কিন্তু বইগুলো পড়ে নি, শক্ত ঠেকে, রাজনীতি কপচায়, বন্দেমাতরম্ থেকে ইনক্লাব পর্যন্ত বুলি সবই আওড়ায়। কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাঙ্গামায় থাকে দলের পিছনে, সঙ্গেও থাকে, কিন্তু স্ট্রাইক হলে কলেজে আসে চুপি চুপি। পোশাক ফ্যাশন-দুরস্ত, কিন্তু ইস্ত্রী খারাপ।

কিশোরকৃষ্ণ নিজে গোঁড়া হিন্দু, মস্ত টিকি রাখে। সুতরাং কথাগুলি মুখে শোনায় ভাল।

ধর না, সাবরেজেস্ট্রী আপিস, পোস্ট-আপিস, থানা আছে, এনন কি একজন সার্কেল ডেপুটি পর্যন্ত এখানে তাঁর হেডকোয়ার্টার করেছেন। স্কুল, বোর্ডিং, গার্লস ইউ পি স্কুল আছে, লাইব্রেরি আছে, অ্যামেচার থিয়েটার আছে, মহিলা-সমিতি আছে, এমন কি সাহিত্য-সভা পর্যন্ত আছে। ফুটবল ম্যাচ খেলার জন্য একটা কাপ পর্যন্ত রয়েছে, দিয়েছেন একজন ভদ্রসন্তান, ইস্কুলের পরলোকগত বাংলা-সাহিত্য-শিক্ষক পণ্ডিত মশায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে। প্রবীণেরা তামাক খান, নতুন কালের বাবুরা কিন্তু খান সিগারেট। সকলেরই কিছুটা দেবত্র সম্পত্তি আছে। কিন্তু তরুণেরা প্রায় সকলেই পৌত্তলিকতার বিরোধী। যাত্রাকালে দইয়ের ফোঁটা কপালে নিয়ে বাড়ি থেকে বার হন সকলেই, কিন্তু বাইরে এসেই সবাগ্রে রুমাল ঘষে ফোঁটাটা

মুছে ফেলেন। নতুন কালের মেয়েদের বউদের জুতো প্রায় সকলেরই আছে, কিন্তু গ্রামে কেউ পায়ে দেয় না, কোথাও যেতে হলে কাগজে মুড়ে নিয়ে ইষ্টিশনে এসে পায়ে দেয়।

প্রবীণ বাবুরা সোজা গালাগাল দেন, 'শালা, হারামজাদা, বদমাশ, বজ্জাত' বলে, নতুন বাবুরা গালাগাল দেন ইংরেজীতে, 'ড্যাম, সোয়াইন' বলে। কথায় কথায় বলেন, 'নন্‌সেন্স।'

কিশোরের কথায় সীতারাম কৌতুক বোধ করছে, খুশীও হয়েছে। তবে সে অবশ্য এত সব বিবেচনা করে কখনও দেখে নাই। তার নিজের খারাপ লাগে, এখানে নতুন আমলের কেউ তালব্য-শ উচ্চারণ করতে পারে না, সবই তাদের ইংরেজী 'এস্'। বাজারপাড়ার এবং বাবুপাড়ারও যারা নিম্নস্তরের, তারা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলেই সানন্দে সম্ভাষণ করে, কি রে স্লা ?

ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত উত্তর আসে, কেন রে স্লা ?

আর একটা ভয় আছে সীতারামের। ভয়ের সঙ্গে ঘৃণাও আছে। এখানে মদ প্রায় সকলেই খায়, প্রবীণেরা তন্ত্রমতে 'কারণ' করেন, নতুনেরা নিজেদের আড্ডায় ইজ্জত রেখে খান। জনকয়েক কিন্তু নিয়মিত মাতাল আছে, যারা দোকানের মদ খেয়ে রাস্তায় হল্লা করে, আস্তিন গুটিয়ে গুণ্ডামিও করে, কিন্তু ছুরি-ছোরা চালাতে সাহস করে না, তবে নিরীহ কাউকে পেলে অপরাধ খুঁজে বার করে দু-চারটে কিল-চড়-ঘুসি চালিয়ে দেয় অমিতবিক্রমে।

রত্নহাটায় ঢুকে গ্রামের মুখেই সীতারাম একবার থমকে দাঁড়াল। সামনেই মণিলালবাবুর বাড়ি। মণিলালবাবু কাছারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছেন। তাঁর ছোট ভাই ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে একখানা বাইসাইকেলের সীটে কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছেন, কোথাও যাবার মুখে বোধ হয় কিছু বলছেন দাদাকে।

কানাই রায় বললে, কি, দাঁড়ালে যে ?

সীতারাম পিছন ফিরে নিজের গ্রামের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। তাল, শিরীষ, আম এবং বাঁশ বনের ঘন নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে বসতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কানাই রায় আবার বললে, চল।

সীতারাম আবার একবার নিজেকে সংযত এবং দৃঢ় করে নিলে, বললে, চলুন।

মণিলালবাবুর কাছারির সামনে এসে তার বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ করে উঠল। মণিলালবাবুকে এখানে 'জাঁদরেল লোক' বলে থাকে, কথায়বার্তায়, চালচলনে সবেই তিনি বিশিষ্ট। সীতারামের মনে পড়ল, বাপের উপদেশ। তা ছাড়া কানাই রায় আগেই হেঁট হয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে তাঁকে প্রণাম জানালে, সীতারামও অনুরূপ ভঙ্গীতে প্রণাম করলে। সীতারামের ভাগ্য, মণিলালবাবু তাদের প্রণামটা আমলে আনলেন না। তারা পার হয়ে গেল মণিবাবুর কাছারি। কিন্তু খানিকটা আসতেই মণিলালবাবুর ছোট ভাই ডাকলেন, কানাই রায়, ওহে!

আজ্ঞে ?

কানাই ফিরল, সীতারাম দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কানাই ডাকলে, সীতারাম, শোন, বাবু ডাকছেন।

সীতারাম এসে দাঁড়াল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে মণিলালবাবু বললেন, রমানাথ মোড়লের ছেলে তুমি? নর্মাল পাস করেছ? বাঃ! কি নাম তোমার?

সীতারাম সবিনয়ে বললে, আজ্ঞে, আমার নাম সীতারাম মণ্ডল।

মণিলালবাবু বললেন, বাঃ! ভাল। নর্মাল পাস করেছ তুমি! ভাল, ভাল। বাবুদের ছেলেদের পড়াবে? বেশ বেশ। তোমাদের গ্রামে লেখাপড়ার বেশ ঢেউ উঠেছে, না?

চুপ করে রইল সীতারাম।

মণিবাবুর ছোট ভাই বললেন, হ্যাঁ, এর এক জাঠতুতো ভাই, কিশোরকৃষ্ণ পাল বি-এ পাস করে এম-এ আর ল পড়ছে। কিশোরেরই আর একটি ভাই এবার ম্যাট্রিক দেবে। সে ছেলেটিও ভাল।

মণিলালবাবু বললেন, বাঃ বেশ। খুব ভাল। ম্লেচ্ছ-বিদ্যার তো ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই, সবারই অধিকার; তোমরা লেখাপড়া শেখ, মানুষ হও, তোমাদের জাতের একটা দুর্নাম আছে মুখ্যু বলে, সেটা ঘোচাও তোমরা।

একটা অদম্য উচ্ছ্বাসে সীতারামের বুকটা ভরে উঠল, চোখ ফেটে জল এল তার। সে আশঙ্কা করেছিল তীক্ষ্ণ শ্লেষভরা আচরণ। এমন সস্নেহ আচরণ, এমন অকৃপণ প্রশংসা সে প্রত্যাশা করে নাই। সেই অপ্রত্যাশিত উদার ব্যবহারে তার অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, নত হয়ে পায়ে হাত দিয়ে সে মণিলালবাবুকে প্রণাম করলে।

মণিলালবাবুর মুখে অভিজাতসুলভ হাসি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন, বললেন, তুমি কাঁদছ?

সীতারামের চোখে জল এসেছিল, সেই জল তাঁর পায়ের উপর ঝরে পড়েছে। উত্তপ্ত সজল স্পর্শ থেকে অনুমান করে নেওয়া মণিলালবাবুর মত বিচক্ষণ লোকের পক্ষে কঠিন হয় নাই।

সীতারাম অপ্রতিভের হাসি হেসে চোখ মুছে বললে, আজ্ঞে না, তার পর সে মণিবাবুর ছোট ভাইকে প্রণাম করলে।

মণিলালবাবু বুঝতে পেরেছিলেন তার অন্তরের উচ্ছ্বাসের কথা। তাঁরও ভাল লাগল একটু, এবং এই উচ্ছ্বাসের স্পর্শে তাঁরও মধ্যে ঈষৎ ভাবস্পন্দন জেগে উঠল বোধ হয়। তিনি বললেন, আমাদের গ্রামে ইস্কুল,—ভদ্রলোকের গ্রাম, ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শেখে না। ইস্কুল হওয়া অবধি দুটি ছেলে বি-এ পাস করেছে, আর কেউ

এণ্ট্রান্স পাসই করতে পারলে না। তা তোমরা শেখো, তোমরা বড় হও।

হঠাৎ সীতারাম হাত জোড় করে বললে, আমি নর্মাল পাস করেছি—কে আপনাকে বলেছে জানি না, আমি পরীক্ষা দিয়েছি দুবার, পাস করতে পারি নাই।

মণিলালবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন এবার।

সীতারাম, বললে, আমি তা হলে যাই।

মণিলালবাবু বললেন, ভাল হবে তোমার। আমার সঙ্গে এর পর দেখা করো।

সীতারাম ভাগ্যকে মানে। সকল সুখ এবং দুঃখের নিয়ন্তা হিসাবে তাকে ভয় করে, ভক্তি করে। আপন ভাগ্যকে সে বার বার প্রণাম জানায়। আজকের দিনটির জন্য এত তৃপ্তি, এত আশ্বাস, এত আনন্দ সঞ্চয় করে সে রেখেছিল!

মণিলালবাবুর ওই আশীবাদ, স্নেহপূর্ণ ব্যবহারই সব নয়, আরও সে গেলে। তার কর্মস্থল, তাদের আট-আনা রকমের জমিদার বাড়িতে এসে ছেলেদের পড়ার ঘরে তার সুটকেসটি রাখলে। এ কাছারি সে আগেও দেখেছে। আগেও এসেছে এখানে। তখন জমিদারবাবু বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন ভয়ানক রাশভারী লোক। মণিলালবাবুর সমকক্ষ তো ছিলেনই প্রতাপে প্রতিষ্ঠায়—উপরন্তু তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তাঁর সহজ সত্য ব্যবহারের জন্য, স্পষ্টবাদিতার জন্য। বিষয়ী লোক ছিলেন, কিন্তু কুটিল পন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিরোধ বাধলে তিনি যা করতেন, বলে করতেন, এবং অন্যায় যারই হোক ও যেখানেই হোক—প্রতিবাদ করতেন। তাঁর একটা কথা দাগ কেটে রয়েছে সীতারামের মনে। এখানে একটা খুন হয়েছিল, এই গ্রামে এবং থানার সামনে। পুলিস সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করলে এই গ্রামেরই দুজন ভদ্রসন্তানকে, ভদ্রসন্তানদের মধ্যে যারা মদ খেয়ে গুণ্ডামির ভাঁড়ামি করে নিজেদের ভয়াল রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদেরই মধ্যে অমূল্য এবং ভূপতিকে। এ বিষয়ে পুলিস সাহেব গ্রামের সমাজপতিদের ডেকে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ বাড়ির কর্তাকেও ডেকেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অমূল্য আর ভূপতি—এদের দুজনকে জানেন? এরা মদ খায়?

কর্তা উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, জানি। দুজনেই গ্রাম-সম্পর্কে আমার আত্মীয় এবং মদ খায়।

এরা ভয়ানক প্রকৃতির লোক?

ভয়ানক প্রকৃতি বলতে কি বলছেন, আমি ঠিক জানি না। তবে মদ খেয়ে চীৎকার করে, আস্ফালন করে, হয়তো নিরীহ দু-এক জনকে দু-একটা ঘুষি মারে।

একে কি ভয়ানক প্রকৃতি বলেন না আপনি? মদ খায়, চীৎকার করে, লোককে মারে।

কর্তা উত্তর দিয়েছিলেন, দেখুন সাহেব, মদ অনেকেই খায়, আমিও খাই, হয়তো আপনিও খান ; স্থতরাং মদ খেলেই ভয়ানক প্রকৃতি হয় না ; মদ খেলেই তার একটা ক্রিয়া আছে। কেউ চীৎকার করে, কেউ রাস্তায় পড়ে থাকে, কেউ সাবধানে ইজ্জত বাঁচিয়ে ঘরে থাকে। সাধুরা কারণ ক'রে ভগবানের নাম জপ করে, কালীসাধনা করে। এরা চীৎকার করে, মদ খেয়ে কখনও রাস্তায় পড়ে থাকে, কিন্তু আপনি যে অর্থে ভয়ানক প্রকৃতি বলছেন, তা ওদের নয়। যা সন্দেহ করেছেন, সে ওদের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

সাহেব বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। কর্তা আবার হেসে বলেছিলেন, ওরা মদ খেয়ে আস্ফালন করে, লোককে মারে-ধরে এ থেকে যদি ভয়ানক প্রকৃতি হয় সাহেব, তবে আরও একটা কথা বলি, মদ খেয়ে পরের দুঃখে আমি ওদের কাঁদতে দেখেছি। আমি নিজের চোখে অনেকবার দেখেছি ; একবার এখানকার একজন মহৎ ব্যক্তির কঠিন অসুখের সময়, আমি দেখেছি, ওরা দুজনেই মদ খেয়ে ভগবানকে ডেকে বলছে, ভগবান, আমাদের পরমায়ু নিয়ে মহৎ লোকটাকে বাঁচিয়ে দাও। তা হলে কি ওরা মহৎ লোক নয় আপনার যুক্তি অনুসারে ?

এ বাড়ির কর্তা ওই কথার স্মৃতির মধ্য দিয়ে সীতারামের মনের মধ্যে বেঁচে আছেন। শ্রদ্ধা এবং ভয়, এই দুটো মিশে তাকে এ বাড়ি সম্বন্ধে বিহ্বল করে রেখেছে। সীতারামের ধারণা, এ বাড়ির ছেলেদের রক্তের মধ্যে প্রচণ্ড দম্ভের একটা ধারা আছে। সে শুনেছে, নাবালকের রাজত্বে, বড় ছেলেটি ভয়ানক উগ্রস্বভাবের। সীতারামের সৌভাগ্য, তাকে পড়াতে হবে না, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। পড়াতে হবে ছোট দুটিকে। কিন্তু তাদের মধ্যেও তো এই রক্ত। এ বাড়িব মালিক এখন রাণীমা ; সীতারামের ভরসা, তিনি নাকি বড় ভাল লোক।

স্থটকেসটি রেখে ঘরখানির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। বেশ ঝকঝকে তকতকে মাঝারি আয়তনের ঘর। আসবাবের মধ্যে কেবল একখানি তক্তপোশ আর একটি পুরানো আমলের টেবিল।

কানাই রায় বললে, এই ঘরে তুমি থাকবে। এখন চল, হাত-পা-মুখ ধুয়ে নাও, রাণীমাকে প্রণাম করে আসবে।

কাছারির একেবারে গায়েই বেশ বড় পুকুর, জলও বেশ ভাল, বাঁধানো ঘাট ; পুকুরটিও বাবুদের। সব মিলিয়ে এ দিকটা ভালই লাগল সীতারামের।

বাড়ির ভিতর ঢুকতে দুটো দরজা পার হতে হয়। দরজা দুটির মাঝখানের স্থানটুকু এমন যে, সেখানে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরের কথা শোনা যায়, কি দেখা যায় না। বাড়ির ভিতর বেশ একটি গোলমাল উঠছে। কানাই রায় থমকে দাঁড়াল, কি হল ? প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করলে অত্যন্ত মৃদুস্বরে এবং শঙ্কার সঙ্গে।

সীতারাম শুনতে পেলে, বাড়ির ভিতর ছেলেমানুষের গলায় কেউ বলছে, আমি চোর

নই, চুরি করতেও আমি যাই নি। ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরছিলাম, দেখলাম ও পাড়ার ছকু কড়ি আরও কজন ছেলে ক্ষেতের মধ্যে সন্ধ্যের অন্ধকারে মুলো আর বেগুন তুলছে। জিজ্ঞাসা করলাম তো ছকু বললে, আমরা ফীস্ট করব রাত্রে, তাই তরকারি চুরি করছি। আমিও ওদের কতকগুলো আলু তুলে দিলাম।

স্ত্রীকণ্ঠে প্রশ্ন হল, কেন দিলে ?

উত্তর হল, ওদের সাহায্য করলাম। আর—চুরি কখনও করি নি, চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম।

স্ত্রীকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, কিন্তু ওই চাষীটি যদি তোমাকে না দেখত, তা হলে তো সকাল-বেলায় নিশ্চয় গাল দিত, কোন গুখোরব্যাটা, কোন্ হারামজাদা আমার মূলো-বেগুন চুরি করেছে! তখন সে গাল তোমার মরা বাপকেও লাগত! গাল দিলে তো দোষ দিতে পার না তুমি! এই বর্ষায় অসময়ে ও কত কষ্টে মুলো-বেগুন লাগিয়েছে।

ভারী পুরুষের গলায় কেউ বললে, থাক্ মা, থাক্। ছেলেমানুষ করে ফেলেছেন।

ছেলেমানুষ বলবেন না নায়েববাবু, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে; ষোল বছর পার হতে চলেছে, ছেলেমানুষ কিসের ?

কানাই রায় বিস্ময়ে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সীতারামের উপস্থিতি সে বোধ হয় বিস্মৃত হয়েই বলে উঠল, রাণীমা বড়বাবুকে বকছেন!

ছেলেমানুষের গলায় এবার কথা শোনা গেল। সীতারাম বুঝতে পারলে এইটিই সেই উগ্রস্বভাবের বড় ছেলেটি। সীতারাম শিউরে উঠল, ছেলেটি অনায়াসে বলে গেল চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম! এবার সে কি উত্তর দেয় শুনবার জন্য সীতারাম উদ্গ্রীব হয়ে উঠল। ছেলেটি বলছে, সে শুনলে, হ্যাঁ, আমার অন্যায় হয়েছে, তার জন্য আমি ওর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তারপরই সে অন্য কাউকে বললে, আমি দোষ করেছি, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

বিব্রত কণ্ঠস্বরে বোধ হয় চাষীটি বলে উঠল, আজ্ঞে বাবু—আজ্ঞে বাবু—আজ্ঞে না। আমাকে বললে, আমি নিজে তুলে দিতাম আপনাকে।

রাণীমা আবার বললেন, নায়েববাবু, ওই লোকটিকে পাঁচ সের আলুর বাজার-দরে দাম দিয়ে দেবেন। দামটা ধীরার জলখাবারের টাকা থেকে কাটা যাবে।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল সীতারাম। এ কোথায় এসে পড়ল সে! এদের এই ধারা-ধরুন, এই রীতি-নীতি তার কাছে শুধু বিস্ময়করই নয়, কেমন যেন শ্বাসরোধী বলে মনে হচ্ছে তার। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে, ওরই মধ্যে কোথায় একটা এমন কিছু নিহিত আছে, যা ইঙ্গিতে তাকে শাসন করছে। সে যেন অত্যন্ত ছোট হয়ে গেল।

নায়েববাবুর গলা শোনা গেল, এস হে, এস।

পদশব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল; কানাই সচেতন হয়ে উঠল মুহূর্তে, এমন লুকিয়ে কথা শোনা তার অভ্যাস আছে। সে গলা ঝেড়ে শব্দ করে আগমনবার্তা জ্ঞাপন করে বললে, এস, এস। এ তো তোমাদের জমিদারের বাড়ি, আপন বাড়ি হে। এস, লজ্জা কি?

নায়েববাবু বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে একটি নিম্নশ্রেণীর চাষী। সীতারাম বুঝলে, এরই জমি থেকে আলু চুরি করেছে এ বাড়ির বড় ছেলেটি, পরীক্ষা করে দেখেছে, চুরি করতে কেমন লাগে!

কানাই নায়েববাবুকে বললে, এইটি আপনার—আমাদের রমানাথদাদার ছেলে, সীতারাম। মায়ের কাছে নিয়ে যাই?

নায়েব কিছু বলবার আগেই রাণীমা বেরিয়ে এলেন, নায়েববাবু, ওই লোকটিকে যেন আপনি কিছু বলবেন না। ও আমার কাছে নালিশ করে নি। আমি খবর পেয়েছি অন্য লোকের কাছে। যে দেখেছে ওদের আলু তুলতে, সে-ই আমাকে বলে গিয়েছে।

মায়ের কথা শেষ হবামাত্র কানাই বললে, সীতারাম এসেছে মা।

এইটিই সীতারাম? এস, এস বাবা, বাড়ির ভিতরে এস।

সীতারাম অবাক হয়ে এই মা-টিকে দেখছিল। দেহবর্ণের দীপ্তিতেই তাঁর সকল অবয়ব-বৈশিষ্ট্য যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, কৃশকায়া দীপ্তগৌরবর্ণা মধ্যবয়সী এই মা-টিকে দেখে মনে হয় যেন জ্বলন্ত একটি শিখা। চোখ দুটি বড় নয়—ছোট, কিন্তু দেহ-দীপ্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রখর দুটি চোখ। বিপরীত শুধু কণ্ঠস্বরটি, অতি মিষ্ট; সীতারামের মন অভয় পেলে তাঁর কণ্ঠস্বরে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করলে তাঁকে।

* * *

রাণীমা নয়, মা। সীতারামের মনে হল, রাণীমার চেয়ে অনেক বড় উনি—শুধু মা। মা বললেন, সীতারামকে বসতে আসন দে।

সীতারাম বাড়ি ঢুকে সর্বাগ্রে খুঁজছিল সেই উগ্র এবং বিচিত্র প্রকৃতির বড় ছেলেটিকে। কই সে? তার উগ্র প্রকৃতির কথা সে কানে শুনেছিল, তার উপর নিজের কানে তার অদ্ভুত কথা শুনে কৌতূহল এবং শঙ্কার তার আর সীমা ছিল না। অপরিসীম শঙ্কিত কৌতূহল! "চুরি করতে কেমন লাগে তাই দেখলাম।" এ কী ছেলে? কই সে? কিন্তু সে নাই, বোধ হয় উপরে গিয়েছে। এরই মধ্যে হঠাৎ আসনের কথা শুনে সে প্রায় চমকে উঠল, আসন সে প্রত্যাশা করে নাই। এর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। চঞ্চল হয়ে উঠল সে, হাত-পা ঘামতে লাগল। আত্মসম্বরণ করে সে বিব্রত এবং লজ্জিত হয়ে বললে, না না, মা। আসন কি জন্যে? আসন চাই না। আপনার সামনে—

তার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই কানাই রায় বলে উঠল, ঠিক কথা, আপনার সামনে

আমরা কি আসনে বসতে পারি মা ? আপনারই অন্নে বেঁচে আছি, তা ছাড়া প্রজা।

মা হাসলেন, আশ্চর্য স্নেহমধুর কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললেন, না না, রায়, এ বাড়িতে সীতারাম আজ এসেছে শ্যামু-দেবুর শিক্ষাগুরু হয়ে। এ বাড়িতে অন্নও আমরা দয়া করে দেব না, উনিই দয়া করে গ্রহণ করবেন। জমিদার-প্রজার সম্বন্ধ আলাদা। সীতারাম, আসনে উঠে বসো বাবা।

সীতারামের মনের মধ্যে সে এক আশ্চর্য আলোড়ন উঠল মুহূর্তে। তার স্পষ্ট কোন রূপ নাই, কিন্তু একটা আবেগ আছে ; সে আবেগ তাকে একটা মর্যাদাময় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করলে, সংকোচ কাটিয়ে দিলে। সে আসনটা টেনে নিয়ে বসল।

মা চলে গেলেন, বলে গেলেন—বসো, আমি আসছি।

সীতারাম বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলে এতক্ষণে। জমিদার হলেও ছোট জমিদার, ধনী বলা চলে না, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, ঘরদোরও অবস্থানুযায়ী। কতকটা অংশ পাকা দালান, কতকটা অংশ মাটির কোঠা ; মাটির হলেও কোঠাগুলি পাকা ঘরের মতই দেখতে ; থামওয়ালা বারান্দা, পাকা মেঝে, পরিপাটী মাটির পলেস্তারার উপর পাকা ঘরের মত চুনকাম করা ; উঠান-দাওয়া এগুলিও সবই পাকা।

কানাই হেসে কাউকে বললে, এস দেবুদাদা, তোমার মাস্টার মশাই। এস।

সীতারামের চোখ পড়ল সামনের বারান্দায় একটি থামের আড়াল থেকে ফুটফুটে একখানি মুখ উঁকি মারছে। তার চোখে চোখ পড়তেই সে ফিক করে হেসে মুখ লুকিয়ে ফেললে।

সীতারাম তাকে সস্নেহে ডাকলে, এস খোকাবাবু, এস !

ঠিক এই সময়েই মা এসে দাঁড়ালেন। নিজে হাতে নিয়ে এসেছেন একখানি রেকাবিতে দুটি মিষ্টি—দুটি ক্ষীরের নাড়ু, এক গ্লাস জল। নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তুমি ওদের 'বাবু' বলো না বাবা।

তার পর বললেন, খাও, জল খাও। প্রথম এলে, সকলের আগে মিষ্টিমুখ কর। ওই একটু মধু আছে, ওইটুকু আগে মুখে দাও।

সীতারামের এতক্ষণে চোখে পড়ল, এক পাশে একটু মধু রয়েছে।

কোন সঙ্কোচ প্রকাশ না করেই সে রেকাবিটি তুলে নিলে। মধুটুকু খেয়ে সে সন্দেশ একটি তুলে নিলে। দোকানের তৈরী নয়, বাড়ির তৈরী ; কিন্তু এমন চমৎকার মিষ্টি সীতারাম কখনও খায় নাই। মুখে রেখে গিলতে যেন ইচ্ছা হচ্ছিল না, খেলেই তো ফুরিয়ে যাবে, আর তো মাত্র একটি !

মা ইতিমধ্যে ছেলেটিকে এনে সীতারামের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।—তোমার মাস্টার মশাই, নমস্কার কর।

ছেলেটি মায়ের রঙ পেয়েছে, মুখখানিও বড় মিষ্টি, শুধু চোখ দুটি বড় প্রখর এবং চঞ্চল, আর ীরটি বড় হাল্‌কা, শীর্ণ বলে মনে হয়। সে মুখ টিপে টিপে হাসছিল, সে হাসির মধ্যে তার ল প্রকৃতির পরিচয় ফুটে বেরিয়ে আসছে, যেন ফুলের কুঁড়ির সবুজ আবরণের অন্তরালবর্তী তার ত দলগুলির ভিতরের রঙের খানিকটা আভাসের মত। চোখে চোখ পড়লেই সে চোখ মাচ্ছে। তাতে হাসি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মা আবার বললেন, নমস্কার কর।

ছেলেটি এবার চট করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সীতারামের পায়ে হাত দিয়ে গালে ঠেকালে।

সীতারাম বিব্রত হয়ে উঠল, না না; আমাকে এমন করে প্রণাম করতে নাই। নমস্কার তে হয়।

মা হেসে বললেন, তা করুক। ওদের প্রণাম নিলেও তোমার দোষ নেই।

সীতারাম বললে, কি নাম তোমার?

ছেলেটি নীরবে অভ্যাসমত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

মা বললেন, বল, নাম বল।

সিরি দেবানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বাঃ, ভারি ভাল নাম। তেমনই ভাল ছেলে।

মা হেসে বললেন, ভাল উনি মোটেই নয়। ভারি চঞ্চল। ওকে নিয়ে বেগ পেতে হবে মাকে। কিন্তু শ্যামু কোথা গেল? শ্যামু! শ্যামু!

উপরের কোন ঘর থেকে উত্তর এল, এই যে আমি।

কি করছ? নীচে এস।

উত্তর এল, দাদা আমায় কয়েদ করে গিয়েছে।

মা বললেন, তা হোক, তোমার মাস্টার এসেছেন, নেমে এস।

দাদা খালাস না দিলে কেমন করে যাব?

দাদাকে বল। ধীরা!

দাদা নাই।

তা হলে আমি খালাস দিচ্ছি। আমি মা, তোমার দাদারও গুরুজন। আমি খালাস দিলে কিছু বলবে না।

এইবার দোতলা থেকে বেরিয়ে এল একটি সাত-আট বছরের ছেলে; এ ছেলেটির রঙ বর্ণ, মুখখানি মিষ্টি, কিন্তু একটু গম্ভীর।

মা বললেন, তোমার মাস্টার মশাই, নমস্কার কর।

ছেলেটি ছোট হাত দুটি তুলে বেশ চমৎকার নমস্কার করলে। আড়ষ্টতা নাই, চাঞ্চল্য

নাই, ধীর এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে নমস্কার করলে।

মা বললেন, ও বড় ধীর, শান্ত। কথা কম কয়।

সীতারাম তাকে কাছে টেনে নিলে। বললে, কি নাম তোমার?

শ্রীশ্যামানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কি পড়?

শ্যাম বলে গেল, সরল বাংলা পাঠ প্রথম ভাগ, সহজ পাটিগণিত, শিশু ভূগোল পাঠ, ইতিহ গল্প প্রথম ভাগ, সচিত্র লিখনপ্রণালী, আর দাদা পড়তে দিয়েছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও কাহিনী'।

ওরে বাপ রে, তুমি যে অনেক বই পড়!

শ্যাম অসঙ্কোচে স্বীকার করে বললে, হঁ্যা।

বাঃ, খুব ভাল ছেলে।

ছোট দেবানন্দটি সম্ভবত দাদার সমাদর দেখে ঈর্ষাতুর হয়ে উঠে সে এবার এগিয়ে এসে বললে, আমিও কবিতা জানি, বলতে পারি। বলব? র সে আরম্ভ করে দিলে—সম্মতির অপেক্ষা রাখলে না, হাত-পা নেড়ে চমৎকার গেল—

"নামটি আমার গডাধর, সবাই বলে গডা,
সারা ডিনটা রোদে টো-টো গায়ে ধুলো কাড়া,
ডাডা বললে, গাটা তুই—লিখবি পড়বি নে?
অমনি আমি কেঁডে দিলেম—এঁ-এঁ-এঁ-এঁ।"

চোখে হাত দিয়ে সে এঁ-এঁ করে চমৎকার কান্নার অভিনয় করে গেল। সীতারাম সকলেই হাসলে সে ভঙ্গী দেখে। আরও উৎসাহিত হয়ে দেবু আবৃত্তি করে গেল—

"ডিডি বললে—না না না না, তুমি ভাল ছেলে,
সোনা মানিক এস খানিক—হাডুডুডু খেলে!"

বলেই সে 'চোল, চোল-মারা হাডু-ডু-ডু-ডু' বলে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল বাড়ি থেকে।

মা শ্যামুকে বললেন, তুমি কিছু শুনিয়ে দাও।

শ্যামু উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল দেবুর সাফল্যে। সে সীতারামের কোলের কাছ সরে এসে দাঁড়াল, একটি নমস্কার করলে, তার পর বললে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠা "প্রার্থনাতীত দান"—

"পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী শিখের দল,
সুহিদগঞ্জে রক্তবরণ হইল ধরণীতল।"

অবাক হয়ে গেল সীতারাম। স্পষ্ট উচ্চারণ, ছন্দপতন নাই আবৃত্তির র

ক্লোক্ষরগুলিতে ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ-কৌশলে দুই অক্ষরের ক্রিয়া এনে সুন্দর আবৃত্তি করে যাচ্ছে। এমন আবৃত্তি সীতারাম নিজে করতে পারে না। আর কবিতাটিও কি সুন্দর! র্মাল ইস্কুলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়ানো হয় না। এখানকার ইস্কুলে যখন সে পড়ত, তখনও হত না। তিনি নোবেল প্রাইজ-ই পেয়েছেন, সে কথা সীতারাম জানে। কিন্তু তাঁর কবিতা বিশেষ সে পড়ে নি। অথচ এই ছোট ছেলেটি!

শ্যামু শেষ করলে আবৃত্তি—

"তরুসিং কহে, করুণা তোমার হৃদয়ে রহিল গাঁথা,
যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দিব, বেণীর সঙ্গে মাথা।"

তার পর সে বললে, শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়। এ তথ্যটিও সীতারামের পক্ষে নূতন। সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এক মুহূর্তে মনে হল, এদের সে কেমন করে পড়াবে?

হাসিটি যেন মায়ের সহজাত, তিনি হেসে বললেন, ধীরা শিখিয়েছে এসব ওদের। ধীরানন্দকে চেন তো? আমার বড় ছেলে?

সীতারামের কণ্ঠতালু যেন শুকিয়ে গেল। ধীরানন্দ পরিচয়-বৈচিত্র্যে তার কাছে প্রায় বাড়ির কর্তাবাবুর কাছাকাছি ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছে। সে ঢোঁক গিলে বললে, না।

মা ডাকলেন, ধীরা!

শ্যামু বললে, দাদা সাহিত্য-সভায় লেখা দিতে গিয়েছে।

মা শ্যামুকে বললেন, যাও, মাস্টার মশাইকে নিয়ে যাও।

একা ঘরের মধ্যে বসে সে ভাবছিল। ভাগ্য তার আজকের দিনটিকে বিপুল সম্পদে ভরে দিয়েছে—রূপে-পরিমাণে সে সম্পদ বিস্ময়কর! অন্য দিকে কিন্তু ভয়ে তার মন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। সিমেন্ট-করা মেঝের উপর বসে ছিল সে, হঠাৎ এক বাড়ির পালিশ করা মার্বেলের মেঝের কথা মনে পড়ে গেল তার। হুগলীতে থাকতে এক বিখ্যাত ভদ্রলোকের বাড়ি দেখতে গিয়ে এই মেঝে সে দেখেছিল, হিমশীতল পিচ্ছিল, আলোকচ্ছটায় ঝকমক করছে; দেখে বিস্ময় যেমন তার হয়েছিল, তেমনই ভয় হয়েছিল ওই মেঝেতে পা দিতে। তাদের গোবর ও রাঙা-মাটি নিকানো গৃহাঙ্গণের মধ্যে যে সস্নেহ অন্তরঙ্গতা আছে, তার এক বিন্দুর সন্ধান না পেয়ে সেই মেঝেকে অনাত্মীয় মনে হয়েছিল, সেখানে সে পা দিতে পারে নাই, অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, দরজার মুখ থেকেই ফিরে এসেছিল। এখানকার পরিচয়ের মধ্যে সেই মার্বেলের মেঝের রূপ সেই অনাত্মীয়তায় ফুটে উঠেছে যেন। এদের এখানে কেমন করে সে পড়াবে?

বাড়ি ফিরে যাবে? যেমন সে ফিরে এসেছিল ওই মার্বেলের মেঝের প্রান্তসীমা ওই দুয়ারের মুখ থেকে?

না সেও ইচ্ছা হচ্ছে না।

তার জাঠতুত ভাই রত্নহাটা সম্বন্ধে যেসব কথা বলে, সে কথা শুনে, সে এবং তার গ্রামে লোক সকলেই আনন্দ পায়, কথাটা অসত্যও নয়; এতদিন এই পরিচয়ই পেয়েছে; কিন্তু আ আর একটা যে বিচিত্র পরিচয় পেলে সে, তাতে ব্যঙ্গ করার, উপেক্ষা করার শক্তি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে তার। এই স্নেহ, এই সমাদর এ যে তার কাছে দুর্লভ বস্তু। যারা এই দুর্লভ বস্তু দিতে পারে, তাদের কেমন করে সে মন্দ বলবে? ওরাও ভাল, এরাও ভাল—ভালতে-মন্দতে মানুষ, এরা মন্দও বটে, আবার ভালও বটে, যত ভাল তত মন্দ।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। ভাবলে।

না, ভয়ে সে পালাবে না। শিখে নেবে সে। কতদিন লাগবে শিখতে? এখানে সে অনেক শিখতে পারবে। ঘরে অবশ্য তার মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব নাই। কিন্তু তাই কি সব? ভাত-কাপড়ের অভাব থাকলে—চাষী সদ্‌গোপের ছেলে সে, তার লেখাপড়া শেখাই হত না, না, ভাত-কাপড়ের জন্য অন্যের জমি চাষ করত, চাষে খাটত। কিংবা এমন কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে চাকরের কাজ করত। ভাগ্য ভাল হলে বড় জোর কানাই রায়ের মর্যাদা পেতে পারত। কিন্তু যখন বহু চেষ্টায় বহু ব্যর্থতার মধ্যেও সেই অবস্থা থেকে সে উত্তীর্ণ হয়েছে, হোক সামান্য লেখাপড়া, কিছু শেখার ভাগ্য তার হয়েছে, তখন সে জীবনে ফিরে যাবে কেন?

এই যে আজ জমিদার-বাড়িতে, সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরে শিক্ষাগুরুর আসন সে পেলে, সে আসন উপেক্ষা করে উঠে যাবে সে ভীরুর মত?

না। যাবে না সে।

কিছুক্ষণ পর তার কি খেয়াল হল, পকেট থেকে পেন্সিল বার করে তক্তপোশের গায়ে যে জানালাটি, তার মাথার উপর লিখলে—৮ই শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। আজকের তারিখ।

আজকের দিনটি তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। তার পিতৃ-পিতামহের গ্রাম ও বংশের কুলকর্মের গণ্ডিকে অতিক্রম করে সে আজ ভদ্র শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম এই রত্নহাটায়—তাদের গ্রামেরই জমিদার-বাড়িতে শিক্ষকরূপে সসম্মানে আসন পেয়েছে। এ কি কম গৌরবের কথা! অনেকক্ষণ চুপ করে সে বসে রইল। এই ক্ষুদ্র স্বার্থকতাটুকুর উপর ভিত্তি করে সে ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনার দেউল গড়তে লাগল। বাবুদের বাড়ির এই চাকরিটুকু নিয়ে থাকলে তো তার চলবে না। মাসিক চার টাকায় জীবন কাটাতে পারবে না; সংসার আছে, সংসার বাড়বে। তা ছাড়া দেবু-শ্যামু বড় হলে তখন তার কি হবে? অবশ্য ওই বড় ছেলেটির ততদিনে বিয়ে হবে—হয়তো ছেলেও হবে। দেবু-শ্যামুর

পর সে তাদের পড়াতে পারবে। তার পর শ্যামুর সন্তান হবে, তার পর দেবুর সন্তান হবে। কল্পনাটা বড় বেশি মিষ্টি হল। এ যেন ওই বাড়িতে মৌরসীখত লিখে দেওয়া—মাস্টারির মৌরসীখত। তার চেয়ে সে যদি এখানে একটি পাঠশালা করতে পায়!

পাঠশালার কথা সে কানাই রায়কে বলেছে। কানাই রায় এ বাড়ির মাকে বলেছে। মাও আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি চেষ্টা করবেন। পাড়ার ঠিক মাঝখানে এঁদের চণ্ডীমণ্ডপ। সেইখানে পাঠশালার স্থান করে দেবেন বলেছেন, কিন্তু—। কিন্তু বাবুদের ছেলেরা কি তার কাছে পড়বে—বড় ইস্কুলের পাঠশালা ছেড়ে? সীতারাম ভাবে।

ব্রাহ্মণ জমিদারদের ছেলে নিয়ে পাঠশালার কল্পনায় সে আশাও পায় না, স্বস্তিও পায় না। মন কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। বেনেপাড়ায়, সাহাপাড়ায়, কৈবর্তপাড়ায় পাঠশালা হলে বড় ভাল হয়। তাদের সে পড়াতে পারে। তারা যেন এদের চেয়ে অনেক সহজ, অনেক আপনার।

অন্যমনস্কভাবে পেন্সিল বুলিয়ে বুলিয়ে দেওয়ালে লেখা ৮ই শ্রাবণ তারিখটাকে মোটা ডগডগে করে তুলতে আরম্ভ করলে।

তিন

সাত দিন পর। আজ মাসের পনেরোই।

মাটির প্রদীপের আলোয় অভ্যস্ত মানুষের হঠাৎ জোরালো ইলেকট্রিক আলোর সামনে এসে চোখ ধেঁধে যায়, চোখের স্নায়ু-শিরাগুলো টনটন করে ওঠে; আবার দু-চার দিনের অভ্যাসেই সে তীব্রতা চোখে সয়ে যায়, ক্রমে ওই আলোর উজ্জ্বল মনোহারিত্বই দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়। তেমনই এই কয়দিনের অভ্যাসেই, সীতারামের মনের সঙ্কোচ এবং ভয়টা ক্রমশঃ কমে এসেছে। এখানকার হালচাল ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে আসছে। এ বাড়ির মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাদের ভালও লাগছে। এ বাড়িতে ঢুকেই যাকে তার সব চেয়ে বেশী বিস্ময়কর এবং ভয়ের পাত্র মনে হয়েছিল, যার উগ্রস্বভাব-খ্যাতি বাইরে থেকেই সে শুনেছিল, এবং বাড়িতে প্রবেশমুখে 'দেখলাম চুরি করতে কেমন লাগে, এই বিচিত্র বিস্ময়কর উক্তি শুনেছিল, এ বাড়ির সেই বড় ছেলেটির সঙ্গেও তার বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল সে প্রথম পরিচয়ের সময়, এবং এখনও মনে মনে ওইটাই সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে পরিচয় হল অত্যন্ত সহজ ভাবে, পথে যেতে পাশের পথিকের সঙ্গে যেমন সহজভাবে আলাপ হয়, তেমনই সহজভাবে। আশ্চর্য!

ওই প্রথম দিনেই সন্ধ্যার সময় ধীরানন্দের সঙ্গে দেখা হল। মেজো ভাইয়ের মত অবিকল

চেহারা। খালি পায়ে, মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে ঘামে ভিজে গেঞ্জি গায়ে এসে কাছারির দাওয়ায় উঠে থমকে দাঁড়াল। সীতারাম ঘরে আলো জ্বেলে বসে ছিল ছাত্রদের প্রতীক্ষায়। অন্য কেউ ছিল না বাইরের বাড়িতে। ধীরানন্দ এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল।

আপনি নতুন মাস্টার মশাই?

মেজো খোকার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখে তাকে চিনতে সীতারামের দেরি হল না। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। বুঝতে পারলে না, প্রণাম করবে অথবা নমস্কার করবে—কোন্‌টা করা উচিত।

আপনার আলোটা একবার নেব? ফুটবল খেলে এলাম, পা-হাতটা ধুয়ে নিই।

চলুন। আমিই দেখাই আলো।

ঘাটে হাত-পা ধুয়ে বললে, তা হলে বাড়ির গলিটাতেও একটু আলো দেখান, আমাদের বাড়ির চারিপাশে বেজায় সাপ।

সীতারাম উৎসাহিত হল এবং সহজ আলাপের ধারার মধ্যে স্বচ্ছন্দগতিতে অনায়াসে ধীরানন্দের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে, দাঁড়ান, তা হলে আলো নিয়ে আমি আগে যাই।

ধীরানন্দ বললে, গেল বার আমাদের বাড়িতে একদিনে ছত্রিশটা গোখরোর বাচ্চা বেরিয়েছিল।

ছত্রিশটা! বাড়িতে কোথাও বাচ্চা হয়েছিল তা হলে।

না। বাড়িতে হয় নি। সবগুলোই প্রায় বাড়ির বাইরে থেকে ভিতরের দিকে আসছিল। রান্না-ঘরেই মারা পড়েছিল ষোলটা, বারদরজায় পাঁচটা, সব বাইরে থেকে বাড়ির দিকে ঢুকেছিল। উঠানে তেরোটা। ঘরের ভেতরে কেবল দুটো। একটা ভাঁড়ার-ঘরে, আর একটা—সেইটেই অবাক করে দিয়েছিল সকলকে। দালান—ঘর—দরদালান পার হয়ে লক্ষ্মীর ঘর, তার পিছনে বাসনের ঘর, তার জানলা নাই, একটি শুধু দরজা, দিনের বেলা আলো নিয়ে ঢুকতে হয়। সেই ঘরে গঙ্গাজলের বড় হাঁড়ির মধ্যে কেমন করে গিয়ে পড়েছিল। আচ্ছা, আপনাদের গাঁয়ে সাপ কেমন?

সাপ আছে বৈকি।

কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে সাপ কখনও মেরেছেন?

না। সীতারাম বললে, তবে শুনেছি বটে যে, কার্বলিক অ্যাসিড দেবামাত্র সাপ মরে যায়।

দেবামাত্র মরে না। সেবার আমি দিয়ে দেখেছি। কুঁকড়ে অনেক ছটফট করে মরে। ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। তবে গন্ধে সাপ আসে না, এটা ঠিক।

বলতে বলতে তারা বাড়ির মধ্যে এসে পড়েছিল। ধীরানন্দ হেঁকে বললে, শ্যামু, দেবু, মাস্টার মশায় দাঁড়িয়ে আছেন তোমাদের। মেক হেস্ট্।—বলেই সে উপরে চলে গিয়েছিল।

সে চলে গেলে সীতারামের মনে হয়েছিল, বড় চমৎকার লোক তো! কোথায় উগ্রভাষী! বিস্ময়জনকই বা কি আছে এর মধ্যে!

এই সাত দিনের মধ্যে আরও অনেকবার দেখা হয়েছে, বিশ-ত্রিশ বার তো হবেই, কথাবার্তাও হয়েছে বার দশেক। ওই এক ধারারই কথা।

ধীরানন্দ সকালবেলা পড়তে যায় এখানকার স্কুলের অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টারের কাছে। রাত্রে পড়ে বাড়িতে, বাড়ির ভিতরে উপরে ধীরানন্দের পড়ার ঘর। সেখানে নাকি অনেক বই আছে। ভাল ভাল বাংলা ইংরেজী বই। সীতারামের ইচ্ছা হয়, বই নিয়ে পড়ে। পড়ার ঘরও দেখতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বলতে পারে না। আলাপ-পরিচয় হয়েছে, বেশ সহজ সরল ভাবেই হয়েছে, কোথাও কোনখানে এতটুকু বাধার কাঁটাও অনুভব করে না; কিন্তু তবু ছেলেটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে ওকে জড়িয়ে ধরবার মত সান্নিধ্যে আসা যায় না। সংসারে এক-একজন লোক আছে, যাদের গায়ে হাত রাখলে মুখেও কিছু বলে না, হাতও ঠেলে ফেলে দেয় না, অথচ হাসতে হাসতে এমন অত্যন্ত সহজভাবে হাতখানি নামিয়ে দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নেয়, যাতে আঘাত লাগে না, এমন কি এতটুকু অপ্রতিভও হতে হয় না—তেমনই ভাবে ও নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে।

সীতারামও অগ্রসর হয় নাই। সেও এরই মধ্যে নিজের দৈনন্দিন কাজের একটি বাঁধাধরা ছক তৈরী করে নিয়েছে। রাত্রে বাড়ি যায়। ভোরবেলা তার বাবার সঙ্গেই ওঠে। জামা এবং গেঞ্জিটি কাঁধে ফেলে ছাতা, লণ্ঠন ও লাঠি হাতে সে রওনা হয়। রত্নহাটা এবং তাদের গ্রামের মধ্যে ছোট নালা আছে, উপরের একটি ঝরনা থেকে জল বারো মাস প্রবাহিত হয়ে নদীর দিকে চলে যায়, সেই নালার কাছে এসে জামা গেঞ্জি ছাতা লণ্ঠন লাঠি রেখে প্রাতঃকৃত্য সেরে নেয়, নালার দুই ধারে অজস্র বাঘাভেরেণ্ডার গাছ, একটি গাছ তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে দাঁতন করে। আরও খানিকটা এসে রত্নহাটার প্রান্তভাগে বহুকালের পুরানো ছায়াঘন যে বটগাছটি আছে, তার তলায় এসে গেঞ্জি জামা পরে নেয়; চাপ দিয়ে দুই হাত বুলিয়ে চুলগুলিকে বসিয়ে আঙুল চালিয়ে বিন্যস্ত করে, কোঁচাটি বার দুয়েক ঝেড়ে নিয়ে আবার রওনা হয়; সাড়ে ছটার মধ্যেই সে এসে বাবুদের বাড়িতে হাজির হয়। ঘরখানার চাবি দুটি—একটি থাকে বাড়িতে, অন্যটি থাকে তার কাছে। ঘর খুলে সে জামা গেঞ্জি রাখে; একটি দেওয়াল-আলনা সে এনেছে বাড়ি থেকে, হুগলীতে কিনেছিল, সেই আলনায় ঝুলিয়ে দেয়। নিজের গাড়ু এবং গ্লাসটি মেজে নেয়। গামছাখানিতে বারকয়েক মুখ মুছে কেচে মেলে দেয়। তারপর ঘরে যে পুরানো আমলের টেবিলটি আছে, সেই টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ায়। টেবিলটির একটি ড্রয়ার সে নিয়েছে, সেই ড্রয়ারটি একবার গুছিয়ে নেয়; পেন্সিলের কাটা মুখ ঘুরিয়ে দেখে, কাটবার প্রয়োজন থাকলে কাটে, ভোঁতা হয়ে থাকলে লঘুহাতে ছুরি চালিয়ে সূচালো করে; তার পর এক টুকরো ভাঙা শ্লেটে ছুরিটিতে বারকয়েক

শান দিয়ে নেয়। এই সময় আসে শ্যামু এবং দেবু, সদ্য-ঘুমভাঙা ফুলো ফুলো মুখে এসে দাঁড়ায়। মায়ের ব্যবস্থায় এবং শৃঙ্খলায় তারা পরিচালিত, মুখ ধুয়েই তারা আসে। সীতারাম তবু নিজের কর্তব্য করে, সে দেখে তাদের দাঁত বেশ ভাল পরিষ্কার হয়েছে কিনা, চোখের কোণে পাতায় পিচুটির কণা লেগে আছে কিনা। দেখবার সময় সীতারাম ওদের মুখ থেকে সদ্য-লুচি-খাওয়ার দরুন একটা গন্ধ পায়। এই গন্ধে এবং তাদের গ্রামের আপনাদের ছেলেদের পাটালি-গুড়মুড়ি-খাওয়া মুখের গন্ধের সঙ্গে একটা পার্থক্য সে অনুভব করে। যতদিন ছেলেরা দুধ খেয়ে বড় হয়, ততদিন সব ছেলের মুখের গন্ধ একরকম। তার পরই তফাত আরম্ভ হয়।

ছেলেরা পড়তে বসে। কানাই রায় চা নিয়ে আসে বাড়ির ভিতর থেকে, নায়েব খায়, কানাই রায় খায়, সীতারাম কিন্তু খায় না। নিয়মিত খায় না। মাত্র একদিন সে এর মধ্যে খেয়েছে, সেদিন খুব বর্ষা নেমেছিল।

আটটা নাগাদ আসে জলখাবার। সীতারাম জল খেতে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু মা শুনবেন না কিছুতেই। তিনি পাঠাবেনই, চাকর নিয়ে আসে—চারিখানি রুটি, ঘিয়ে-ভাজা মরিচ-মাখানো চারটি সিদ্ধ আলু, খানিকটা গুড়। সীতারাম রোজই একটা রুটি, দুটি আলু এক চামচে পরিমাণ গুড় নিয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দেয়। আজই অবশেষে একটা রফা হয়েছে, মা সীতারামের একখানি রুটি নেওয়াই মেনে নিয়েছেন।

সীতারাম হাত জোড় করে বলেছে, আর তো দুদিন বাদেই পাঠশালায় বসতে হবে মা, এগারোটার সময়, সাড়ে দশটায় ভাত খেতে হবে। চারখানা রুটি খেয়ে কি আর ভাত খেতে পারব মা?

চারদিন পর বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতি হলেন দেবতাদের গুরু, স্বর্গের বিদ্যাদাতা তিনি, তাঁর নামাঙ্কিত বারেই পাঠশালা খোলা প্রশস্ত, তা ছাড়া ওই দিন দিনটাও ভাল আছে। ওই দিনই সীতারামের পাঠশালা বসবে। পাঠশালার জন্য মা অনেক চেষ্টা করেছেন। ফলও অবশ্য কিছু সীতারাম যা আশা করেছিল, তা হয় নাই।

মা বলেছিলেন, ছোট ছোট ছেলেদের দশটার সময় ভাত খেয়েই ইস্কুলে ছুটতে হয়, আধ মাইলের বেশি পথ। তুমি যদি পাড়ার মধ্যে ঘরের দরজায় চণ্ডীমণ্ডপে এগারোটায় পাঠশালা খোল, ইস্কুলের মাইনে কম নাও, তবে সকলেই ছেলে তোমার পাঠশালায় দেবে।

সীতারামের কাছেও এ যুক্তি আকাট্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে গেল, যুক্তি অকাট্য হলেও লোকে যুক্তির ধার দিয়ে গেল না। তারা ইস্কুল ছাড়িয়ে ছেলেদের পাঠশালায় পড়তে দিতে রাজী হল না।

জগদ্ধাত্রী-ঠাকুরুন এ পাড়ার প্রবীণা ঝিউড়ি মেয়ে। তিনি সেদিন এই বাবুদের বাড়িতেই মাকে বললেন, সীতারাম উপস্থিত ছিল তখন, বললেন, হাজার হলেও ইস্কুলের পড়ায় আর

পাঠশালার পড়ায় ধীরুর মা ! তুমিই বল। কই, তুমি ছাড়াবে ইস্কুল ছেলেদের ?

হেসে মা বললেন, আমার ছোট ছেলে দুটি তো ইস্কুলে পড়ে না ঠাকুরঝি, তারা তো ওর কাছেই পড়ে।

সে পেরাইভেট পড়ে। দুটি ছেলেকে নিয়ে মাস্টারটি দু বেলা ঘষে। সে এক, আর তোমার পাঠশালার গোলে হরিবোল এক। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমার ভাইপো তিনটিকে দিতে পারি যদি মাস্টার তোমার ছেলেদের মত পেরাইভেট পড়ায় দু বেলা। তা তিনজনের জন্যে তিন টাকা দোব। ছোটটি তো ধর পড়ে না—অ-আ আর ক-খ। তার পড়া নামে, আগলানো শুধু। তা তবুও তোমার তিন টাকাই দোব।

এ পাড়ার পতিতপাবনবাবু একজন প্রবীণ এবং মাতব্বর—তাকেও মা ডেকেছিলেন, তিনি বললেন, ও তো একটা বালক। শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ও কি জানে ? ইস্কুলে পাঠশালা থাকতে আবার পাঠশালা ! হুঁ !

এখানকার ইস্কুলের প্রাইমারী বিভাগ ইস্কুলের সঙ্গে নামে স্বতন্ত্র হলেও ইস্কুলেরই একটা অংশ। সেখানে তিনজন মাস্টার আছেন। একজন শুধু প্রবীণ, সে আমলের ছাত্রবৃত্তি পাস, আর দুজনের একজন ম্যাট্রিক ফেল, অন্যজন নর্মাল পাস। দুজনের একজন সেকেণ্ড মাস্টারের জামাই, অন্যজন হেডমাস্টারের গুরুদেবের ভাইপো। এদের কিন্তু দুজনেরই বয়স কম, সীতারামেরই বয়সী, পচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। প্রবীণ যিনি তিনি প্রবীণ হয়েছেন বলে পাচ ঘণ্টা ইস্কুলের মধ্যে আড়াই ঘণ্টা চেয়ারে বসে না ঘুমিয়ে পারেন না।

মা সীতারামকে তবু আশ্বাস দিলেন, হাসিমুখে বললেন, ওদের কথায় তুমি দমে যেয়ো না বাবা। একটা ভাল কাজে অনেক বাধা আসে।

এল, পরের দিনই আবার বাধা এল। সীতারাম খেতে বসেছিল, হঠাৎ একটি মহিলা এসে উপস্থিত হলেন। কই ধীরুর মা ?

কে ?—মা বেরিয়ে এলেন।

আমি। দাদা পাঠালে তোমার কাছে।

বাইরে থেকে পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল, বল্, আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

কি বল ?

মহিলাটি গম্ভীরভাবে বলে গেলেন, চণ্ডীমণ্ডপের তোমরা অবিশ্যি মোটা শরিক, বারো আনা অংশ তোমাদের—সব সত্যি কথা, কিন্তু তা বলে তো যা-ইচ্ছে তাই করতে পার না চণ্ডীমণ্ডপ নিয়ে।

মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কি ব্যাপার ?

তিনি বললেন, পাড়ার মধ্যে মাঝখানে দেবস্থান, বউ-ঝি এরা সব যায় আসে, এখানে তুমি তোমার স্বামীর নামে নাকি পাঠশালা বসাচ্ছ ? এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

বাইরে থেকে মহিলাটির দাদা এবার হেঁকে বললেন, ঠিক হচ্ছে-টচ্ছে নয়। সে হবে না। সে আমি করতে দোব না। চলে আয় তুই।

তিনি চলে গেলেন।

সীতারাম বললে, থাক্ মা, যখন এত—। কথা শেষ করতে পারলে না সে।

মায়ের মুখ থমথম করছিল। তিনি একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে ভাবছিলেন কিছু, হঠাৎ বললেন, আমাদের কাছারির পূর্ব দিকেব বারান্দায় পাঠশালা খুলবে তুমি।

সেই স্থির করেই সন্ধ্যার মুখে সে গেল ইস্কুল-সাব্-ইন্সপেক্টারের কাছে। রত্নহাটায়ই একজন সার্কল সাব্ইন্সপেক্টার থাকেন। পাঠশালাগুলির তিনিই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। সাব্ইন্সপেক্টার বসে ছিলেন বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের বাসায়। ভালই হল সীতারামের, হেডমাস্টার মশায় তার এককালের শিক্ষক, তাঁব কাছেও অনুমতি নেওয়া হবে। তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে সে, সাব্ইন্সপেক্টারবাবুকে নমস্কার করলে। তার পর সবিনয়ে নিবেদন জানালে।

সাব্ইন্সপেক্টার বললেন, বেশ, করুন পাঠশালা, চলুক কিছুদিন, বছরখানেক যেতে দিন, তার পর দরখাস্ত করবেন। তখন দেখেশুনে যা উচিত হয় করা যাবে।

হেডমাস্টার গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন প্রথম থেকেই, তিনি বললেন, এর জন্য আমায় বলছ কেন তুমি ?

আমি আপনার ছাত্র। আমি এখানে পাঠশালা করছি, তাই অনুমতি চাচ্ছি।

অনুমতি তো পারব না দিতে। এখানে আমাদের একটি প্রাইমারী সেক্শন রয়েছে তোমাকে পাঠশালা করবার অনুমতি দিয়ে কেমন করে তার ক্ষতি করতে বলব, বল ?

এর উত্তর দিতে পারলে না সীতারাম ; শুধু একটু দুঃখিত হল। সেও তো তাঁর ছাত্র। তার মঙ্গল দেখাও কি তাঁর কর্তব্য নয় ?

মাস্টার মশায় আবার বললেন, নিজের গ্রামে পাঠশালা করলে না কেন ?

আজ্ঞে, সেখানে আমার জাঠতুত ভাই পাঠশালা করেন।

তবে ? এখানে যে আমাদের নিজেদের পাঠশালা-বিভাগ আছে বাপু।

এবার সীতারাম উত্তর দিলে, বললে, আমাদের গ্রাম ছোট, সেখানে কটিই বা ছেলে। এখানে বড় গ্রাম, কুড়িটা ছেলে হলেই আমাব পাঁচটা টাকা হয়ে যাবে। আর অনেক ছেলে তো পড়ে না আপনাদের পাঠশালায়, বেশি মাইনে—

তা হলে, ভদ্রপাড়া ছেড়ে তুমি অন্য পাড়ায় পাঠশালা করবার চেষ্টা কর। হেসে বললে দেশের সেবাও হবে। তাদের জুটিয়ে পাঠশালা করে যদি 'অন্ধকার থেকে আলোকে' আনতে পার, তবে একটা কীর্তি থাকবে তোমার

সীতারাম মর্মাহত হল তার কথার ভঙ্গীতে। সে চলে এল সেখান থেকে।

মা আবার পাঠালেন তাকে মণিলালবাবুর কাছে।—ওকে একবার বলে এস। উনি বললে, চণ্ডীমণ্ডপের আপত্তি আর কেউ তুলবে না।

মণিলালবাবুকে প্রণাম করে সে দাঁড়াল। বললে সব। আশ্চর্য! সেদিনের সে মানুষই নন ইনি, কথার সুরও আলাদা। তিনি শুধু বারকয়েক বললেন, হুঁ। হুঁ। হুঁ। শুনলাম বটে। শেষে নির্লিপ্তের মত বললেন, দেখ, চেষ্টা কর। তার পর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ডাকলেন, চৈতন! চৈতন!

উত্তর না পেয়ে বললেন, গড়গড়ার কল্কেটা নিয়ে বাইরে কাউকে দাও তো হে ছোকরা, আগুন কেটে গেছে, আগুন দিতে বল।

সীতারাম স্তম্ভিত হয়ে গেল, কিন্তু আজ্ঞা পালন না করে পারলে না। মা শুনে বললেন, মণি ঠাকুরপো এমন অদ্ভুত মানুষই বটেন। যখন যেমন খেয়াল হয় বলেন।

বৈঠকখানায় এলে কানাই বললে, ভদ্দলোক মাত্রেই খেয়ালী হে।

সীতারাম মর্মান্তিক বিষণ্ণতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। উত্তর না দিয়ে সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তার পর মুখ নামিয়ে বসে রইল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল; হেডমাস্টার মশায়ের কথাটা মনে পড়ল। ভদ্রলোক পাড়া বাদ দিয়ে অন্য পাড়ায় পাঠশালা করলে কি হয়? অনেক ভেবে সে একটি ক্ষেত্রও আবিষ্কার করলে। সাহাপাড়া এবং জেলেকৈবর্ত-পাড়ায় পাঠশালা খোলার কথা মনে হল।

সাহাপাড়ার ছেলেরা অবশ্য অধিকাংশই লেখাপড়া শেখবার চেষ্টা করে। সাহা অর্থাৎ শৌণ্ডিকেরা সমাজে জল-অচল সম্প্রদায় হলেও, আর্থিক অবস্থায় খুব সম্পন্ন শ্রেণী। কুলগত মদের দোকান তো আছেই, তার উপরে এদের আছে মহাজনী ব্যবসা। যে যেমন, তার তেমন কারবার—গহনা বাসন বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়; খালাসের একটা সময় নির্দিষ্ট থাকে, সে সময় পার হলেই খাতককে জানিয়ে দেয়, ও জিনিস আর তুমি পাবে না। আচারে বেশ-ভূষাতেও ওরা ভদ্র, কিন্তু তবু ইস্কুলে পাঠশালায় ওদের স্থান নীচে। শিক্ষকেরা ওদের ঘৃণার চোখে দেখেন। সীতারামের মনে আছে, তাদের সঙ্গে পড়ত, সাহাদের খুদে আর পচা। মাস্টারেরা ডাকতেন, এই শৌণ্ডিক!

কেউ কেউ বলতেন, মদ-ঘাঁটার বেটা। সীতারামের মনে হল, ওদের জন্য যদি সে পাঠশালা করে, তবে ওরা নিশ্চয়ই খুশি হয়ে তার পাঠশালায় পড়বে।

জেলে-কৈবর্তদের ছেলে অনেক। শীত গ্রীষ্ম বারোমাস বটতলায় সকাল থেকে সন্ধ্যে এক জায়গায় জমে বসে তারা, হি-হি করে হাসে, পরস্পরকে গালিগালাজ করে। ওরা পাঠশালায় যায় না। ওদের অনেকের ধারণা, লেখাপড়া শিখতে নাই ওদের। যে শিখবে, সে মরে যাবে। অথচ কৈবর্তদের পয়সা আছে—মাছের ব্যবসার পয়সা। ওদের মোড়ল বিপনের একান্ত ইচ্ছে ছেলেকে পাঠশালায় দেবার। হাইস্কুলের পাঠশালায় ভর্তি করেও দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে

দুদিন গিয়েই ছেলেটা আর যেতে চায় নাই। কেন যেতে চায় না, সে সীতারাম অনুমান করতে পারে। সে ভয় না থাকলে, ওরাই বা আসবে না কেন?

উঠে বসল সীতারাম। জ্যোতিষ সাহা সাহাপাড়ার মাতব্বর, লোকও ভাল। কৈবর্তরাও সাহা মহাশয়ের অনুগত। বিপনেকে জ্যোতিষ 'কাকা' বলে, বিপনে বলে, 'জ্যোতিষ বাবা'।

হ্যাঁ, তাই করবে সে। ওদের কাছেই যাবে।

শ্যামু এবং দেবুকে দশটার সময় ছুটি দিয়ে স্নান সেরে নিলে; স্নান করতে তার খানিকটা সময় লাগে। পুকুরে সে স্নান করে না। এ বিষয়ে তার স্কুল-জীবনে দুজন প্রাচীন শিক্ষকের সে অনুগামী হয়েছে। যে পণ্ডিত মশায়টি তার বাপকে, তাকে নর্মাল ইস্কুলে পড়াতে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি এবং এই স্কুলের থার্ডমাস্টার দুজনে ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর খব পবিত্র-চরিত্রের মানুষ। কর্মজীবনে যতদিন ছিলেন, ততদিন তাঁরা দুজনে সাড়ে নটায় গাড়ু নিয়ে গামছা এবং কাপড় কাঁধে ফেলে চলতেন, গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরবর্তী ঝরনার দিকে। ঝরনায় স্নান করে গাড়ু দুটিকে ঝরনার জলে ভরে নিয়ে ফিরতেন। সমস্ত দিন সেই ঝরনার জলই খেতেন। সীতারামও গাড়ুটি হাতে নিয়ে গামছা এবং কাপড় কাঁধে ফেলে ঝরনায় যায়। দ্রুতপদে যায়, দ্রুতপদে ফেরে। নিজের ঘরের মধ্যেই একটি দড়ির আলনা টাঙিয়েছে সে। সেই আলনায় কাপড়খানি মেলে দেয়, গাড়ুটি রাখে টেবিলের নীচে। কোন বাক্সভাঙা এক টুকরো বেশ প্লেন কাঠ যোগাড় করেছে, সেটি ঢাকা দিয়ে তার উপর একটি নুড়ি চাপা দেয়, তার পর ছাত্রজীবনের অভ্যাসমত বা হাতে আয়নাটি ধরে চিরুনি চালিয়ে চুল আঁচড়ায়। টেরি কাটে না; সমান করে সামনে টেনে কপালের উপরে চুল বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দেয়। একটি টিকি আছে, সেটিকে সযত্নে সামনের দিকের চুলের সঙ্গে টেনে মিশিয়ে সেমালুম মিলিয়ে দেয়। এর পর ভাত খায়।

আজ ভাত খেয়েই গেঞ্জি জামা পরে ছাতাটি হাতে বার হল। গেল সাহাপাড়ার দিকে জ্যোতিষ সাহা মশায়ের পাকি মদ ও গাঁজা-আফিং-সিদ্ধির দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

জ্যোতিষ আশ্চর্য হয়ে গেল। তার দোকানে রমানাথ মোড়লের ছেলে কেন? ছেলেটি লেখাপড়া শিখছে, তা ছাড়া ভাল ছেলে বলেই তো সকলে জানে তাকে।

একটি নমস্কার করে সীতারাম বললে, আপনাকে একটা কথা বলব।

কি? বল।

আপনাদের পাড়ায় আমি পাঠশালা করতে চাই। আপনাদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা।

জ্যোতিষ সবিস্ময়ে বললে, পাঠশালা!

হ্যাঁ, পাঠশালা। সীতারাম তার ভেবে-রাখা যুক্তিগুলি সাহাকে জানাল। বললে ইস্কুলে ছোট ছেলেদের দশটার সময় ভাত খেয়ে ছুটতে হয়—দেড় মাইল পথ—ভদ্রলোকের বাড়িতে অবিশ্যি দশটায় ভাত হয়, কিন্তু আমাদের মত গেরস্ত-বাড়িতে মেয়েদের অসুবিধে

হয়। এ ধরুন, আমি এগারোটার পাঠশালায় আসব; বাড়ির দোরে পাঠশালা—মেয়েরা এক ঘণ্টা সময় পাবে, তা ছাড়া ভাত না হল, মুড়ি খেয়ে পাঠশালায় এল, একটায় টিফিন—দিব্যি এক দৌড়ে বাড়ি এসে খেয়ে আবার চলে গেল। হঠাৎ কারও ছেলেকে দরকার হল, হাঁক দিলে—মাস্টার, রামকে ছুটি দাও। হয়ে গেল। তা ছাড়া মাইনেও কম করব আমি, গেরস্ত-ঘরে দু আনা পয়সা কম নয়।

এতগুলি যুক্তির অবতারণা করে সে সাহার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, কথাগুলি সাহা মশায়ের মনে লাগল কিনা! সাহা মশায় ভাবছিল। কথাগুলি তার সত্যই মনে লেগেছে।

সীতারামের আবার একটা কথা মনে এল, বললে, এ ছাড়াও ধরুন, ইস্কুলের মাইনে মাসের সাত তারিখে না দিলে ফাইন লাগে, তার পর মাস শেষ হল, অমনিই নাম কেটে দিলে। গরিব গেরস্ত যারা, তারা প্রতি মাসেই কি মাইনে ঠিক ঠিক দিতে পারে? পাঠশালাতে সেও একটা সুবিধে, নাম কাটা যাবে না, ফাইন লাগবে না।

এতে সাহা মশায় হাসলেন, বললেন, ফাইন লাগবে না, সেটা সুবিধে বটে, কিন্তু মাইনে না দিলে মাসের শেষেও যদি নাম কাটা না যায়, তবে তাতে তোমার সুবিধে হবে না, মাইনে আর কেউ দেবে না।

লজ্জিত হল সীতারাম, মনে হল, সে যেন কাঙালপনা করে ফেলেছে। নিজেকে সম্বরণ করে সে বললে, তার জন্যে একটা কমিটির মত থাকবে, আপনারা পাঁচজন একমত হয়ে একটা কমিটি করে দেবেন। আপনি প্রেসিডেণ্ট হবেন। মাসের শেষে আমি খাতাপত্র একদিন দেখাব। আপনার নাম কেটে দিতে বলেন, দোব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বললে, অবিশ্যি আমি প্রাণ দিয়ে খেটে পড়াব, মাইনে চাই বৈকি আমার। কিছু পাব বলেই তো কাজ করতে এসেছি। কিন্তু আমিও তো চাষী গেরস্ত-ঘরের ছেলে—গেরস্ত-ঘরের দুঃখ বেদনা আমি জানি। আমার দুঃখের সঙ্গে ছাত্রদের বাড়ির দুঃখের কথাও তো আমাকে ভাবতে হবে। কেউ যদি এক মাস মাইনে দিতে না পারে, আপনারা যদি দেখেন, মাইনে বাকি ইচ্ছে করে পড়ে নাই, তবে তার নাম কাটব না, থাকবে। আর অভাব যদি বেশী হয়, তবে থাকবে দু মাস মাইনে বাকি। দেবে পরে। তাও যদি মনে করেন আপনারা যে, বাকি মাইনে ছেড়ে দিলে ভাল হয়, তাই দোব আমি।

সাহার দোকানের সামনেই বাবুদের একটি বাগানওয়ালা পুকুর। সেই পুকুরের জলে তখন বাতাসে ঢেউ উঠেছে, শ্রাবণের বর্ষার উতলা বাতাস। ঢেউয়ের মাথায় সূর্যের ছটা ঝকমক করছে। সাহা সেই দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বললে, আমি ভাই ভেবে দেখি। পাড়ার পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

সীতারাম এইবার শেষ কথা বললে, তা ছাড়া এ হবে আপনাদের ছেলেদের জন্যে

পাঠশালা, বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে আপনাদের ছেলের তফাত থাকবে না। অসম্মান হবে না আপনাদের।

জ্যোতিষ চকিত হয়ে মুখ তুললে, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রথমে সীতারামের মুখের দিকে, তার পর সামনের দিকে ওই আলো-ঝলমল পুকুরের দিকে।

* * *

আরও দুদিন চলে গেল।

পাঁচজনকে নিয়ে সেই পরামর্শই চলছে এখনও।

গন্ধবণিকপাড়ায় কয়েকজন ইস্কুলের বন্ধু আছে তার। দুদিন সে তাদের ওখানেও গেল। সেখানে বিশেষ উৎসাহ পেলে না। এরা আবার এক বিচিত্র মানুষ। ওদের মহলেই অল্পবয়সীরা তালব্য 'শ' ইংরাজী 'এস' এর মত উচ্চারণ করে। বন্ধু দেখলেই সমাদর করে সম্ভাষণ করে বলে—স্রা। এদের প্রবীণেরা অত্যন্ত বিজ্ঞ। বললে, আচ্ছা, কর পাঠশালা। দেখি পড়াশুনা কেমন হয়, তারপর দেখা যাবে।

সেদিন সমস্ত দিনটা দোরে দোরে ঘুরে বিকেলে ফিরল। জল খেয়ে অবসন্ন মনেই গাড়ু হাতে নিয়ে গামছাটি কাঁধে ফেলে খালি গায়ে সে বেরিয়ে পড়ল। এটি তার নিত্যকর্ম। ঝরনার ধারে বেড়াতে যায়। আরও একটি জিনিস থাকে—একখানি আসন, আসনখানি সে বাড়ি থেকে এনেছে। আকাশে মেঘ থাকলে ছাতাটি নেয় বগলে। গ্রাম পার হয়ে চলে যায় সেই ঝরনার ধারে। একটা কাঁকর-পাথর-ভরা গাছপালাশূন্য অনুর্বর টিলার নীচে ঝরনা। সে ওই টিলাটার কোন একটা স্থানে গিয়ে আসনখানি পেতে বসে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসেই থাকে। এইটুকুও তার সেই পুরানো আমলের পণ্ডিত মশায়ের অনুকরণ। ভাবে বসে বসে। ভাবনা তার—পাঠশালার ভাবনা। পাঠশালা না হলে খাওয়াদাওয়া আর চার টাকা মাইনেতে চাকরি সত্যই অত্যন্ত লজ্জার কথা। বাবার কাছে মুখ দেখাবে কি করে?

বাবা তার এখনও বলছেন, ঘরে বসে চাষবাস দেখ বাবা। মা-লক্ষ্মীর সেবা কর। "নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন, এই খেয়ে যায় যেন জন্ম জন্ম।" চাষ ছাড়লে চাষ জাহান্নমে যাবে। আমি আর কদিন! এসব হল পিতিপুরুষের কথা।

কথা পিতিপুরুষের বটে। সত্যও বটে। তার জাঠতুত ভাইয়েরা—ওই কিশোরদের চাষের অবস্থা সত্যই খারাপ হয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। বড়দাদা মাইনর পড়ে পাঠশালা করেছে গাঁয়ে, সে হাল ধরে না, চাষও দেখে না। মেজো চাকরি-চাকরি করে ঘুরে বেড়ায়। কিশোর এম. এ আর ল পড়ছে। ছোটকা এবার ম্যাট্রিক দেবে। জেঠা বুড়ো হয়েছে, চোখে ভাল দেখতে পায় না। তবুও চাষের ভার সব ওই বুড়োর উপর। কৃষাণের উপর

ল আনা নির্ভর। ফলে, জেঠার ক্ষেতে তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সকলের চেয়ে কম ফসল। কথা ঠিক। কিন্তু বাড়িতে থেকে চাষ নিয়ে থাকার কথা ভাবতে গেলে বুকের তরটা কেমন করে ওঠে। চাষ করলে আর কি তাকে জমিদার-বাড়িতে বসতে আসন বে? ওই মণিলালবাবু সেদিন তাকে কল্কেটা নিয়ে বাইরে দিতে বলেছেন, সে চাষীর লে বলে। বললেও, তাকে তামাক সেজে আনতে বলতে পারেন নাই। লেখা-পড়া শিখে ন্টারি করবে শুনে তাঁকে সেদিন ভালও বলতে হয়েছে। নিজ হাতে চাষ করলে আর কি নি এটুকুও বলবেন? এবার তামাক সেজে আনতে বলবেন।

পেটে খেয়ে বেঁচে থাকাই কি সব?

তার সেই পুরানো পণ্ডিত মশায় বলতেন, শূকরেও দিনাতিপাত করে, সমস্ত দিন ঘুরে সেও জর উদরপূর্তি করে।

তার বাবা আরও বললেন, বেশ তো পাঠশালা করলি যদি, তবে গাঁয়ে তোর দাদা করছে, দাদার সঙ্গে লেগে যা। না হয় তো পাশের গাঁয়ে এই রাধিকাপুরে কর্।

রাধিকাপুর তাদের গ্রামের পাশেই, তাদেরই গ্রামের মতো ছোট চাষীর গ্রাম, করলে অবশ্য হয়! হয়তো মাসে পাঁচ-সাত টাকা মাইনে উঠবে। কিন্তু সেও তার মনে ধরে না। রাধিকাপুরের পণ্ডিত মশাইয়ে আর রত্নহাটার পণ্ডিত মশাইয়ে কি তুলনা হয়। তা ছাড়া ছাত্র? ওই যে জমিদার-বাড়ির দুটি ছেলে, ফুটফুটে মুখ, ঝকঝকে চোখ, টপটপ কথার উত্তর দেয়, চটপটে ভাব, এসব রাধিকাপুরের ছেলেরা পাবে কোথায়? মণিবাবু সেদিন বলেছেন বটে, গ্রামে ইস্কুল থাকতেও আমাদের ছেলেরা কেউ কিছু করতে পারলে না, তোমরা করছ, ভাল, ভাল। তবু ওরাই তো এ অঞ্চলের প্রধান। ওরাই তো এগিয়ে যায় সব কাজে। সাহেবসুবোরা এসে ওদের সঙ্গেই আলাপ করে, কথা বলে। ওরা লেখাপড়া শেখে না অবহেলা করে, জানে, পাস না করলেও ওদের প্রতিষ্ঠা কেউ কাড়তে পারবে না। ওদের মাস্টার মশায় হতে পারায় একটা কত বড় গৌরব! শ্যামুকে আর দেবুকে যদি সে পড়ায় তারা যদি এককালে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়, তা সে তো বলতে পারবে, শ্যামু-দেবুর মাস্টার সে। শ্যামু-দেবুর একজন যদি জজ হয়, একজন হয় ম্যাজিস্ট্রেট—তা হলে? বুকের ভিতরটা তার কেমন করতে থাকে।

ঝরনার কাছাকাছি গ্রাম তাদেরই গ্রাম। তাদের গ্রাম থেকেই মেয়েরা এসে ঝরনার জল নিয়ে যায়। সবুজ ধানে ভরা মাঠের পথ দিয়ে ক্ষারে কাচা মোটা কাপড় পরে বউয়েরা মেয়েরা জল নিয়ে যায়। বউদের মাথায় ঘোমটা, মেয়েরা ঘোমটা দেয় না, তাদের মাথার খোঁপাগুলির উপর সন্ধ্যার সূর্যের আলো পড়ে; রুক্ষ চুলের এলো-খোঁপাগুলি কলসী নিয়ে চলতে পা ফেলার ঝোঁকে ঝোঁকে দোলে, বাঁধা খোঁপা যাদের তাদের তৈলাক্ত চুলে আলোর

ছুটা বাজে।

মনোরমাও আসবে জল নিতে এদের সঙ্গে। তার সঙ্গে এই সুযোগে রাত্রে বাড়ি গিয়ে দেখা হবার আগেই একবার দেখা হয়ে যাবে। মনোরমা আসছে শুক্রবারে। তার ইচ্ছা ছিল, ওই বৃহস্পতিবারেই আসে। আসবার ট্রেন পাঁচটায়। বৃহস্পতিবার এগারোটায় পাঠশালা খুলবে, ওই দিন পাঁচটায় মনোরমা আসবে, এটা ভাবতে তার ভাল লেগেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার শুধু গুরুবারই নয়, লক্ষ্মীবারও বটে। ধান বেচতে নাই, কন্যা ঘরের লক্ষ্মীস্বরূপা—কন্যাও পাঠাতে নাই। কাল বাবা রওনা হবেন। তার শ্বশুর-বাড়ি থেকে গঙ্গা খুব নিকটে, মাইল দুয়ের মধ্যেই। চাষ শেষ হয়ে গেছে, নিড়ানোর কাজেও কয়েকদিন দেরি আছে। শ্রাবণের শেষে নিড়ান দিলেই ভাল হবে, আগাছাগুলো এখনও বেশ মাথা তুলে উঠে নাই। এই অবসরে বাবা গিয়ে কয়েকদিন থাকবেন, গঙ্গাস্নান হবে। এই চার দিনের মধ্যে বাড়িতে তার কাজ অনেক। বাবা থাকবেন না, এই সময়েই নিজের মনোমত করে ঘরখানিকে সাজিয়ে ফেলতে হবে। বাবা নিজেই অবশ্য বলেছেন, কিন্তু তবুও বাবার সামনে এই সব করতে কেমন লজ্জা লাগে।

আলনাটা সে রত্নহাটায় নিয়ে গিয়েছে। আলনাটা বড় ছোট। ওটাতে ঘরে কোন কাজও হত না। মনোরমার কাপড়, তার জামা কাপড় গেঞ্জি রাখতে একটা বড় আলনা চাই। আলনা একটা সে কিনতে দিয়েছে বাবুদের বাড়ির নায়েবকে, তিনি সদরে গিয়েছেন। দুটো প্যাকিং কেস কিনে রত্নহাটায় সতীশ সূত্রধরকে দুটো শেল্‌ফ করতে দিয়েছে—বড়টা বাড়ির জন্য, ছোটটা সে রাখবে রত্নহাটার পাঠশালায়।

সন্ধ্যে হয়ে এল, সে উঠল। ঝরনায় মুখ হাত ধুয়ে গাড়ুটি ভর্তি করে নিয়ে সে ফিরল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভ—

"অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধূলি ·
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কৌমুদী .
মুদিলা সরমে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী।"

তার পর আর ঠিক মনে নাই। স্মৃতিশক্তিটা ভাল নয়। তার জীবনের অকৃতকার্যতার এইটাই সব চেয়ে বড় কারণ। সে কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। আবার ফিরল ঝরনার ধারে। কিছু ব্রাহ্মীশাক তুলে নিয়ে সে ফিরল। রান্না করে খাওয়ার তো সুবিধা হবে না, ছেঁচে রস করে নিয়ে খাবে সকালে। হ্যাঁ। আরও আছে, সামনে আসছে ভাদ্র মাস, পিত্তবৃদ্ধির সময়, এ সময় চিরোতর জল অন্তত এক সপ্তাহ খেতে হবে। শরীরটা ভাল রাখতে হবে। শরীরমাদ্যম্।

বাবুদের বাড়ি ফিরতেই কানাই রায় বললে, কি গো পণ্ডিত, ভ্রমণ হল নাকি?

অর্থাৎ ভ্রমণ।

কথাটা একটু যেন বিঁধল সীতারামের গায়ে। কানাই রায় যেন কেমন কদিন ধরে বাঁকা কথা কইছে। 'সীতারাম' বলে ডাকে না। বলে পণ্ডিত। মধ্যে মধ্যে 'পণ্ডিত মশায়' বলে। বুঝতে পারে সীতারাম কানাই রায়ের কথা। কিন্তু সে কি করবে তার!

'মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে!'

বণিক সেই যে কুক্কুটকে বলেছিল—"নহে দোষ তোর মূঢ়, দৈব এ ছলনা, জ্ঞানশূন্য করিল গোসাঁই।" মিথ্যা কথা নয়।

কানাই রায় বললে, কি রকম? কথা বলবে না নাকি?

হেসে সীতারাম বললে, রায়, তোমাকে আমি 'কাকা' বলি, তোমাকে অমান্য করতে, কি অশ্রদ্ধা করতে কবে দেখেছ বল দেখি?

রায় একটু অপ্রস্তুত হল। না, না, না।—বলেই কণ্ঠস্বরে গুরুত্ব ফুটিয়ে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বললে, জ্যোতিষ সাহা লোক পাঠিয়েছিল। তোমাকে একবার যেতে বলেছে সন্ধ্যেতে।

সীতারাম গাড়ুটি রেখে জামা ও গেঞ্জি টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতেই বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত দেরি করলে না সে।

সাহার দোকানের বারান্দায় একটি গোলমাল হচ্ছে। সীতারাম দোকানের সামনেই থমকে দাঁড়াল। জ্যোতিষ হাত জোড় করে বলছে এই গ্রামেরই বাবুদের ছেলে শিবকিঙ্করকে, আমাকে মাপ করবেন বাবু, আমি হাতজোড় করছি। আমি পারব না। দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে; খাতায় ঠিক দিয়েছি, এখন আর দিতে পারব না।

জড়িত কণ্ঠেই শিবকিঙ্কর বললে, আর দিতে পারবে না?

আজ্ঞে না। জোড়হাত করছি আপনাকে।

জোড়হাত করছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ?

জ্যোতিষ এ কথার উত্তর খুঁজে পেল না।

শিবকিঙ্কর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জড়িত স্বরে বললে, বেশ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

জ্যোতিষের এবার নজরে পড়ল, সীতারাম দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে ডাকলে, এস এস। পণ্ডিত এস।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। শিবকিঙ্কর দাওয়া থেকে নামছিল, সে থমকে দাঁড়াল। বললে, পণ্ডিত? কে পণ্ডিত? পণ্ডিতে মদ খায়?

সীতারামের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করে উঠল। কি বলবে সে বুঝতে পারলে না। সাহা মশায় তাড়াতাড়ি বললে, আজ্ঞে না, ওটি আমাদের পাশের গাঁয়ের রমানাথ মণ্ডলের ছেলে সীতারাম। নর্মাল পাস করেছে।

রমানাথ মণ্ডলের ছেলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সীতারাম? সীতারাম মণ্ডল?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নর্মাল পাস করেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখানে কি? মদ খায় না তো, হিঁয়া কাহে?

আমাদের পাড়ায় পাঠশালা খুলবে, তাই।

হঠাৎ হাসতে লাগল শিবকিঙ্কর। বললে, মণ্ডল, মণ্ডল! অ্যাঁ! মণ্ডল!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চাষা! চাষা! অ্যাঁ! চাষা পণ্ডিত হয়েছে! অ্যাঁ! চাষা কথাটার 'চ'য়ের উচ্চারণটা অদ্ভুত শ্লেষ-তীক্ষ্ণ, ইংরেজী 'এস' এর সঙ্গে উচ্চারণকে মিশিয়ে এমন ধারালো, এমন তীক্ষ্ণ করে তুলেছে যে, ওই শিসালো শব্দটা ধারালো অস্ত্রের মত সীতারামের অন্তরটা ছিন্নভিন্ন করে যাচ্ছে বলে মনে হল। সে সবল যুবা। তার দেহের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল।

জ্যোতিষ তাড়াতাড়ি বললে, ছি, আপনি ভদ্রসন্তান, বাবুলোক, আপনার কি ওই রকম করে কথা বলতে হয়?

মাতাল শিবকিঙ্কর নেশার ঘোরে ক্রমাগত হেসেই চলেছিল, বলছিল, চাষা পণ্ডিত অ্যাণ্ড শুঁড়ি ছাত্র? চাষা পণ্ডিত হয়েছে, এইবার শুঁড়ি পণ্ডিত হবে। হে-হে-হে—হে-হে-হে!

সীতারাম এবার এগিয়ে এল—বাবুটির সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

শিবকিঙ্কর তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলে। কালো চেহারা, পাথরের মত শক্ত শরীর, চোখের দৃষ্টি যেন রাগে জ্বলছে। সে কোন কথা না বলে চলতে আরম্ভ করলে। সীতারামও এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু জ্যোতিষ বাধা দিলে, থাক, যেতে দাও।

কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়ে তখন শিবকিঙ্কর আবার হাসতে শুরু করেছে, হে-হে-হে—হে-হে-হে। চাষা পণ্ডিত অ্যাণ্ড শৌণ্ডিক ছাত্র! কাগজং কলমং খরচং মাত্র।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সীতারাম ভদ্রঘরের ছেলের মনের কদর্যতা দেখে। জ্যোতিষও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রৌদ্রতপ্ত পাথরের মূর্তির মত।

চার

আকস্মিক একটি ছোট ঘটনা থেকে অঘটন অর্থাৎ যা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না তেমন ঘটনা অনেক সময় ঘটে। ঘটলে, সীতারাম তাকে ভাগ্যের খেলা বলে। শিবকিঙ্করের এই গালি-গালাজ করাটা, ওটা যেন সীতারামের ভাগ্যের খেলা। জ্যোতিষ সাহা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সীতারামকে বললে, ওই হল পণ্ডিত। তুমি পাঠশালা খোল।

সীতারাম তখনও আত্মসম্বরণ করতে পারে নাই। সে শিবকিঙ্করের গমনপথের দিকে রূঢ় পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। শিবকিঙ্করকে দেখা যায় না, শুধু অন্ধকার থমথম করছে। মনের জ্বালায় আবেগভরে—রূঢ়ভাবেই বলে উঠল, শিবকিঙ্করের ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক চাষা শব্দটা নকল করে সে বললে, চাষা, চাষা! চাষারা মানুষ নয়! শুঁড়িরা মানুষ নয়!

জ্যোতিষ বললে, শুঁড়ির দোর না হাঁটলে বাবুদের দিন যায় না। মদের দোকান নেবার জন্যে বাবুদের ছেলের চেষ্টা কত! দশ-বারোটা দরখাস্ত করেছে আমার নামে, আমি রাত্রে মদ-গাঁজা বিক্রি করি। তা ছাড়া—। হাসলে জ্যোতিষ। শিবকিঙ্করের পথের দিকে সেও একবার তাকালে, তার পর বললে, শুধু মদ নয়। বাবুদের টাকার দরকার হলে তখন কাপড় ঢাকা দিয়ে গয়না এনে—মিষ্টি কথা কত? জান পণ্ডিত, দু-তিনটি ঘর ছাড়া হেন বাবু নাই এখানে, যার কিছু-না-কিছু আমার বাড়িতে নাই। এই যুদ্ধের বাজারে বাবুদের সম্পত্তি আমরাই তিন-চার ঘরে বাঁচিয়ে দিয়েছি।

সীতারাম বললে, আপনি যদি না মাঝখানে পড়তেন, তবে আমি আজ শিক্ষা দিতাম ওকে।

কজনকে শিক্ষা দেবে? জ্যোতিষের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। নিম্নস্বরে বললে, ও না হয় মাতাল। মুখের সামনে বললে। ওই কথা বাবুদের না বলে কে? আমরা জাতিতে সাহা, আচ্ছা. ভাল। আমাদের জল খায় না, আমরা নীচে মাটিতে বসি, ডাকে আমাদের শুঁড়ি বলে। দেশ. দেশের আচার চলে আসছে, শাস্ত্রে আছে, বহুত আচ্ছা। কিন্তু আমাদের জ্ঞাতি নরেন সাহা ডাক্তারী পাস করে এসেছে, কই, তার ওষুধ—জল-মেশানো ওষুধে তো আপত্তি হয় না? কই, তার বেলা তো এসব কথা বলতে পারে না কেউ? জান, ইস্কুলে তার ছেলেদের মেয়েদের খাতির আলাদা। হঠাৎ জ্যোতিষের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল, বললে, আমার মনে আছে, ইস্কুলে পড়তাম, পড়াশুনায় ভাল ছিলাম না। একটু থামলে সে। থেমে আবার বললে, তা এখনকার বাবুদের ছেলেরাও তো ভাল ছিল না। এই শিবকিঙ্কর, ও তো আমার সঙ্গে পড়েছে। আমরা যাও বা পারতাম, ও তাও পারত না। মাস্টারের একটি কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না। আর আমাকে কি বলত জান? বলত, মেয়া-ঘাঁটা শুঁড়ি, মেয়া ঘাঁট্‌গে যা। পচুই বেচ্‌গে যা।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার পর চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল

বোধ হয় সেই আমলের এই ধরনের অনেক কথা। সীতারামের মনে পড়ে গেল। ইংরেজী উচ্চারণ তাদের গ্রামের এবং তাদের সজাতিদের অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের শুদ্ধ হত না। 'এম্'কে 'অ্যাম', 'এন'কে 'অ্যান', 'এল্'কে 'অ্যাল', 'এস'কে 'অ্যাস' ব'লে ফেলত তারা, সেকেণ্ড মাস্টার বলতেন, 'অ্যাল' নয়—'এল', 'অ্যাম' নয়—'এম', 'অ্যান' নয়—'এন', 'অ্যাল' নয়—'এল' 'র‍্যাল' নয়—'রেল' বুঝলে? 'এস'টা 'অ্যাস' নয়—'এস', অ্যাস তুমি। গর্দভ কোথাকার!

লজ্জিত হত তারা। রসিকতা করে তিনি আবার বলতেন, ভাল করে জিভ ছুলবে বুঝেছ? পার তো কামার বাড়ির উখো দিয়ে ঘষে পাতলা করে নিও। তার পর শাসন করে বলতেন, এবার যদি 'অ্যাল', 'র‍্যাল' বলবে তো, একটা ব্যাল এনে ঠুকে ঠুকে তোমার মাথায় ভাঙব। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। দিয়ে কুলকর্ম যা আছে করগে যা।

জ্যোতিষ সাহা বললে, তা হলে তাই হল। তোমাকে ডেকেছিলাম, বলতে চেয়েছিলাম, এখন পাঠশালা তুমি বাবুদের ওখানেই কর, আমাদের সব দোনা-মোনা করছে। তুমি আমাকে বলেছিলে বৃহস্পতিবারই খুলতে চাও পাঠশালা। তাই বলেছিলাম আমি সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখি। তা—। মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ থেকে সে বললে, না, তা বৃহস্পতিবারে তুমি এই পাড়াতেই পাঠশালা খোল। শুঁড়ির ছেলে, কৈবর্তের ছেলে পড়বে, চাষাপণ্ডিতই আমাদের ভাল। হ্যাঁ তাই ভাল। কথা পাকা।

সীতারাম বললে, দেখবেন আপনি, বছর বছর যদি আমি বৃত্তি নেওয়াতে না পারি, তবে—। কি শপথ সে করবে বুঝতে পারলে না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, দেখবেন, আপনি দেখবেন!

পরের দিন থেকে পাঠশালা খোলার আয়োজন নিয়ে মেতে উঠল। এমন উৎসাহটি সে যেন মায়ের সাহায্যে পাঠশালা খোলার প্রস্তাবে পায় নাই। ওই প্রস্তাব অনুযায়ী পাঠশালার উদ্যোগ-আয়োজনে তার যেন কিছু করবারই থাকত না। সব ব্যবস্থাই হত মায়ের হুকুমে। আর এ পাঠশালার উদ্যোগ সমস্তই নির্ভর করছে তার উপর। সাহা সম্মতি দিয়েছে, কিছু ছাত্র সে প্রথমে সংগ্রহ করে দেবে এবং পাঠশালার জন্য জায়গাও সে-ই দেবে। সাহা একটা নতুন খামার-বাড়ি করেছে; সেই খামার বাড়িতে পাঠশালা বসাবার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। সাহাপাড়া এবং কৈবর্তপাড়ার প্রান্তভাগেই একটি পুকুরের পাড়। পুকুরের মালিক এখানকার এক ঋণগ্রস্ত বাবু, অর্থের জন্য বন্দোবস্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সাহার বাড়ির কাছেই পুকুর। সাহা নেহাত দর্শক হিসাবে বন্দোবস্তের ডাক দেখতে গিয়েছিল। তার পর চেপে গেল কেমন নেশা, সে-ই সর্বোচ্চ দরে বন্দোবস্ত নিয়ে ফেললে। বন্দোবস্ত যখন নিলে, তখন পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখতেও হল; পাঁচিল দিয়ে ঘেরার সময়

কখানা ঘরও তুলে ফেলেছিল। সাহার তিন-চার ছেলে, ভবিষ্যতে লাগবে কাজে।

সাহা নিজেই হেসে বললে, কোন্ কাজের জন্য যে কি হয়, কার ভাগ্যে কে ভোগ করে, কেউ বলতে পারে না। ইদানীং ভাবছিলাম, গাঁজা-আফিঙের দোকানটা এইখানে আনব। । পাঠশালা হয়ে গেল। এখন যোগাড়যন্ত্র কর তুমি।

একখানা চেয়ার চাই, একটা টুল, টেবিলও একটা হলে ভাল হয়। বোর্ড—ব্ল্যাকবোর্ড কখানা তো চাই-ই। তা ছাড়া একটা ঘড়ি। দুটো জলের কলসী, দুটো গেলাস, ানকয়েক খেজুরপাতা অথবা তালপাতার চ্যাটাই; কলসী-গেলাস অবশ্য এগুলো সামান্য াপার। অল্প কয়েকটা টাকা হলেই হয়ে যাবে। চিন্তা প্রথম কয়েক দফা নিয়ে। ই' সব চিন্তায় সে-রাত্রে তার ভাল ঘুম হল না। সকালে উঠেই সে অন্যদিন অপেক্ষা অনেক ত পদক্ষেপে রত্নহাটার পথে চলতে আরম্ভ করলে। হয়ে যাবে, কোন রকমে সব হয়ে বে। "উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ!" চেয়ার-টুল পাওয়া যাবে, ও দুটো বাবুদের ড়ি থেকেই এখন নেবে, শেষ পর্যন্ত মোড়া দিয়েও কাজ চলতে পারে। টেবিল একটা তৈরী রিয়ে নেবে প্যাকিং কেস কিনে। ভাবনা কেবল ঘড়ি আর ব্ল্যাকবোর্ডের। এখানকার মিনী বাঁড়ুজ্জে ঘড়ি মেরামত করে, দরকার হলে নতুন ঘড়িও আনিয়ে দেয়; একটা ইমপিস তার কাছে কিনলেই এখন চলবে। সাত-আট টাকা হলেই হবে। অবশ্য একটা ক হলেই ভাল হয়। আধ ঘণ্টায় বাজবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠিক ঠিক ঘণ্টার আওয়াজ দিয়ে বে, ছেলেরা শুনবে এক-দুই-তিন-চার—। জাপানী ঘড়ি সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে এখন, নেরো-ষোল টাকায় পাওয়া যেতে পারে। এ টাকাটা না হয় ধার করবে। কিন্তু াকবোর্ড? ভাবতে ভাবতে এ সমস্যারও সমাধান করে ফেললে সে। খানিকটা কাঁঠাল-াঠের তক্তা যোগাড় করে রত্নহাটার পাকা মিস্ত্রী সতীশকে দিয়ে ছোটখাটো বোর্ড বানিয়ে লেও তো হবে! কাঁঠালকাঠে পালিশ হবে ভাল, ভাল করে পালিশ করিয়ে তার উপর রোসিন মিশিয়ে পাতলা আলকাতরার আস্তরণ মাখিয়ে দিলেই চলবে। ফ্রেমের বদলে খায় দুটো কড়া বসিয়ে দিয়ে দড়ি বেঁধে দেওয়ালে-পোঁতা হুকে ঝুলিয়ে দেবে।

রত্নহাটায় পৌঁছেই সে সতীশ মিস্ত্রীর কাছে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেললে। নষ্ট করবার ত সময় কোথায়? "সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।" যামিনী বাঁড়ুজ্জের কাছে কটা ক্লক ঘড়িও সে ঠিক করে ফেললে। এর পর হিসেব করলে টাকার। তার নিজের সম্বল ছিল, তা থেকে চার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, কাঁঠালতক্তা কিনতে। আরও দু কা গিয়েছে কেরোসিন, আলকাতরা, লোহার পেরেক কড়া প্রভৃতির দামে, এ ছাড়া ডোমদের ছে চ্যাটাই কিনতে হয়েছে। সম্বল এখন আর ছটি টাকা।

স্তব্ধ দুপুরবেলায় বাবুদের বাড়ির ঘরের ভিতর বসেছিল। টাকা ছটি কয়েকবার নাড়া-ড়া করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্থির করলে, এখন একটা টাইমপিসই ভাল। আঃ,

মনোরমা যদি আগে আসত। তার কাছে কয়েকটা টাকা নিলেই হত। মনোরমার কি সঞ্চয় আছে, সে জানে। ভারি লক্ষ্মী, সঞ্চয়ী মেয়ে সে। ত্রিশ-চল্লিশ টাকা তার আছে যখন যা সে পেয়েছে, সব সঞ্চয় করে রেখেছে—পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি, টা সব নিয়ে তার সঞ্চয়। খুচরো ঘুচিয়ে টাকা করতেও তাব মনে হয় নাই। একবার শুধু খরচ করেছে—কানের পুরানো মাকড়ি ভেঙে পার্সী মাকড়ি গড়িয়েছে, আর আংটি ভে লাল পাথর বসিয়ে নতুন আংটি গড়িয়েছে।

হঠাৎ সে উঠে পড়ল। উপায় সে খুঁজে পেয়েছে। ঘরটি বন্ধ করে একেবারে এ উঠল কেষ্ট স্বর্ণকারের বাড়ি। নাকের ডগায় ঝুলেপড়া চশমা পরে কেষ্ট কাজ করছিল চশমা এবং ভুরুর ফাঁক দিয়ে সীতারামের দিকে তাকিয়ে বললে, এস পণ্ডিত; আম ছেলেটাকে তোমার পাঠশালাতেই দোব। বেজায় মোটা বুদ্ধি হে। একটুকু দেখে বসো। সামনেই ছিল কয়েকটা মোড়া, কেষ্ট সেই সবগুলোকেই দেখিয়ে দিলে।

সীতারাম নিজের হাত থেকে খুলে দিলে দুটি আংটি, দেখুন দেখি, কত ওজন। সোনা অবিশ্যি গিনি, আমি জানি।

আংটি দুটির একটি দিয়েছেন তার বাবা, অন্যটি তার বিয়ের যৌতুক।

বিক্রি করব আমি।

স্বর্ণকার আংটি দুটি হাতে নিয়ে একবার তাকালে সীতারামের মুখের দিকে, তার আংটি দুটি হাতের তালুতে নিয়ে ওজনটা অনুভবে অনুমান করে নিয়ে বললে, ভরি দেড়ে কি ছ আনা, মানে এক ভরি ছ আনা হবে। তার পর সে নিক্তি বার করে ওজন করলে নিক্তির মাথায় সুতোটি সন্তর্পণে তুলে ধরে দুটি কুঁচ ফেললে ওজনের দিকে; নিক্তির দাঁ স্থির হয়ে দাঁড়াল। কেষ্ট হেসে বললে, এক ভরি সাড়ে ছ আনা।

আংটি বেচে হল তেত্রিশ টাকা কয়েক আনা। আজ সে যুদ্ধের বাজারকে ধন্যবাদ দিলে যুদ্ধ বাধার জন্য দেশের বাজারে প্রায় আগুন লেগে গিয়েছে। যুদ্ধ থেমে গিয়েছে, গ নভেম্বর মাসে, কিন্তু আগুন আজও নেবে নাই। সীতারাম নিজেই কত সময় বলেছে কাল-যুদ্ধ। কিন্তু আজ সে সোনা বেচে এতগুলি টাকা পেয়ে যুদ্ধ বাধার জন্য খুশী হল উনিশ শো উনিশ সালের যুদ্ধের বাজার।

টাকা নিয়ে সে প্রথমেই গেল অনন্ত বৈরাগীর বাড়ি; বৈরাগী মাথায় করে মনিহা ফিরি করে বেড়ায়। মালা-ডোর-আয়না-চিরুনি, পুতুল-তেল-সাবান, কিছু কিছু গিলটি গয়না। সে দেখেছে বৈরাগীর দোকানে কাচের কেসের মধ্যে কালো ভেলভেটের খোপে খোপে হরেক রকমের আংটি থাকে। দুটি আংটি সে বেছে কিনলে, অনেকটা তার আংটি দুটির মত। তার বাবা এবং মনোরমাকে সে এ কথা জানতে দিতে চায় না। বাব দুঃখিত হবেন, রাগ করবেন, তাঁর দেওয়া আংটি সে বিক্রি করেছে; হয়তো বকবেন, বলবেন

লক্ষ্মী ছাড়াবি তুই। মনোরমা হয়তো মুখ ভার করবে, বিয়ের আংটি, তার বাপের দেওয়া জিনিস সে বিক্রি করে দিয়েছে।

তারা তো বুঝবে না, তার মনের কথা।

তার পর সে গেল রঘুনাথ রাজমিস্ত্রীর বাড়ি। ঠিক করে এল, কাল সকাল থেকেই সে লোকজন নিয়ে সাহার খামার-বাড়িতে যাবে। টুকরো-টাকরা মেরামত যা আছে সেরে দেবে এবং কলি-চুন দিয়ে ঘরখানা এবং বারান্দাটাকে চুনকাম করে দেবে। রঘুনাথকেই সে কলি-চুন এবং তুলির পাটের জন্য দাম দিয়ে এল। খানিকটা এসে আবার ফিরে গিয়ে সে বললে, খানিকটা নীল ওর সঙ্গে না দিলে ভাল হবে না। নীলও খানিকটা কিনে নিও।

রঘুনাথ বললে, তা হলে চিনিও খানিক দেন এর সাথে। নইলে তো ধরে না, গায়ে ঘ্যাষ লাগবে আর উঠে যাবে চুন। টাক-পড়া মাথার মত মাটি বেরিয়ে পড়বে।

তা বেশ। কত লাগবে বল ?

চিনি আপনার আধপোটাক, আর নীল। তা দিয়ে যান আনা চারেক পয়সা।

আরও একটু ভেবে নিয়ে সীতারাম বললে, আর একটি কাজের ভার নিতে হবে। ঘরের ভার তো তোমার। বাইরে উঠানটিকেও ঝরঝরে করে দিতে হবে। বেশ সমান করে চেঁচে-ছুলে গোবরমাটিতে নিকিয়ে দিতে হবে। একটি বাড়তি মজুর আর একটি মজুরনী নেবে, কেমন ?

তা বেশ। তাও করিয়ে দোব।

কালকের মধ্যে আমার সব শেষ চাই। আজ ধর মঙ্গলবার। কাল বুধবার সব তোমরা শেষ করবে। পরশু দিনই আমার পাঠশালা খোলা হচ্ছে, বুঝেছ ?

আপনি দেখে নেবেন। বেলা চারটার সময় আসবেন। সব কম্‌পিলিট করে রাখব। না হয়, কানটা ধরে আমার ম'লে দেবেন, ব্যাস্।

চারটের সময় পর্যন্ত তার ধৈর্য থাকল না, ছাত্রদের পড়িয়ে তাড়াতাড়ি সে স্নান সেরে নিলে পুকুরে। ঝরনা পর্যন্ত যাওয়ার সময় নাই আজ। স্নান সেরে খেয়েই এসে হাজির হল পাঠশালা-বাড়িতে। সমস্ত কাজ শেষ করিয়ে সে যখন বার হল, তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত চুনের দাগে ভরে গিয়েছে। পা-হাত চুনের তেজে হেজে গিয়েছে। নিজেও সে সমানে খেটেছে রঘুনাথের সঙ্গে। বেলা প্রায় পাঁচটা। জামা গেঞ্জি জুতো পুকুরের পাড়ে রেখে সে জলে নেমে পড়ল।

বৈকালে বেড়াতে যাওয়াও হল না। আরও অনেক কাজ বাকি। আজ একটু চা খেলে সে। পরিশ্রম হয়েছে, দুবার পুকুরে স্নান হয়েছে। চা খেয়ে আবার চলল সে। এইবার আসবাব। বাবুদের বাড়ি থেকে একখানা চেয়ার পেয়েছে,—সাহা একখানা চেয়ার দিয়েছেন। সতীশ মিস্ত্রীর বাড়ি থেকে ছোট সেল্‌ফ, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড আনালে। ঠিক

দরজার সামনে দেওয়ালের গায়ে রাখলে নিজের চেয়ার, তার সামনে টেবিল, চেয়ারের ডা দিকে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলে ব্ল্যাকবোর্ড, এ পাশে বড় দুটো হুকে প্যাকিং কেস থেকে তৈ সেল্‌ফটি বসালে। চেয়ারের ঠিক মাথার উপরে শক্ত করে লম্বা আড়াই ইঞ্চি পেরেক ঠু ক্লক-ঘড়িটা বসিয়ে দিলে। দম দিয়ে চালিয়ে দিলে ঘড়িটা। পাড়ার ছোট ছোট ছেলে এসে জুটেছিল। তাদেরও উৎসাহের অন্ত নাই। তাদের জন্য পাঠশালা হচ্ছে, এইখা তারা পড়বে। এরই মধ্যে তারা সীতারামকে 'মাস্টা-মশায়' বলে ডাকতেও শুরু করেছে ঘড়িটা চালিয়ে দিয়ে সে তাদেরই মধ্যে বড় দেখে একজনকে বললে, সাহা মশায়ের দোকা শুধিয়ে এস তো কটা বাজছে। কটা ক মিনিট ঠিক ঠিক জেনে আসবে।

আর একজনকে বললে, তুমি যাও, ধীরানন্দবাবুদের বাড়ি যাও তো এই চাবি নিয়ে কানাই রায় আছে, তাকে দেবে, বলবে, মাস্টার মশায়ের লণ্ঠনটা দেন।

তার পর সে ঘড়ির কাঁটা ঘোরাতে আরম্ভ করলে। নটা বেজে রয়েছে। শ্রাবণ মা সন্ধ্যা হয়েছে। এখন অন্তত সাড়ে ছটা পৌনে সাতটা। দশ এগারো বারো ঢং ঢং শ ঘড়িটা বেজে চলেছে। সুন্দর আওয়াজ এবং জোর আওয়াজ।

মাস্টার মশাই!

চমকে উঠল সীতারাম। ধীরাবাবুর গলা। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল চেয়ার থেকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার বুকটা আবেগে পূর্ণ হয়ে গেল। আপনি, ধীরাবাবু?

ধীরানন্দই বটে! সে একা নয়, খ্যামু-দেবুও এসেছে, সঙ্গে কানাই রায়ের দুই হা দুটি লণ্ঠন। তার মধ্যে একটি সীতারামের।

ধীরানন্দ বললে, দেখতে এলাম আপনার পাঠশালা কেমন হল। খ্যামু-দেবুও এসেছে।

সীতারাম দেবুকে কোলে তুলে নিলে। দেবু হাসি চাপবার চেষ্টায় দাঁতে খামচ কেটে মু ঘুরিয়ে নিল।

ধীরানন্দ বললে, বাঃ! বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে।

সীতানাথ লজ্জা পেলে অকারণে। তার পর কুণ্ঠিত স্বরে বললে, পাঠশালা তো!

ধীরানন্দ বললে, পাঠশালার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। বাঃ! ঘড়িটা নতু দেখছি।

মাথা নীচু করে সীতারাম বললে, সুন্দর হয়েছে?

সীতারাম এই মুহূর্তটিতে নিজের একটি খুঁত আবিষ্কার করলে। পাশের দেওয়ালে যেম ঘড়ি রয়েছে, ওদিকের দেওয়ালেও যদি তেমনি একখানা ছবি থাকত।

ধীরানন্দ বললে, খুব ভাল হয়। এক দেওয়ালে নয়, তিন দেওয়ালে তিনখানা—স্বা বিবেকানন্দ, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর একখানা—বিদ্যাসাগরের ছবি তো পাওয়া যা না, একখানা মা-সরস্বতীর ছবি। খুব ভাল হয়।

ধীরানন্দের কথাটি ভাল লাগল সীতারামের। তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে, মনে হল, এই ছেলেটি যদি ছোট হত! এ যদি তার ছাত্র হত! এমনই না হলে ছাত্র!

ধীরানন্দ বললে, এর পর কতকগুলো হাতী ঘোড়া গরু মোষ সাপ—এই সব রঙিন ছবি আনাবেন। দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবেন, ছেলেদের ভাল লাগবে।

আবার সে বললে, পাঠশালার কি নাম দিলেন? নাম দিন—সন্দীপন পাঠশালা। সন্দীপন মুনির পাঠশালায় শ্রীকৃষ্ণ লেখাপড়া শিখেছিলেন। এই বারান্দায় দেওয়ালে মোটা মোটা করে লিখে দিন। না হয় নিজেই তৈরি করে নিন একটা সাইনবোর্ড।

বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে শুনছিল সীতারাম। প্রথম দিন বাইরে থেকে ছেলেটির কথা শুনে তার যেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এই দশ দিন পর আবার তার কথায় তেমনই বিস্ময় জেগে উঠল।

কানাই রায় বললে, চলুন দাদাবাবু।

চল। ধীরানন্দ উঠল।—আপনিও আসুন মাস্টার মশায়।

চলুন। আমি একটু পরে যাচ্ছি। কিন্তু দেবু যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরানন্দ বললে, ওটা ভারি চঞ্চল, একটু স্থির হলেই ঘুমিয়ে পড়ে, রায়জী তুমি ওকে নাও।

চলে গেল তারা। সীতারাম একা বসে রইল। টেবিলের উপর আলোটা রেখে, চেয়ারে বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল সে। তার পাঠশালা! ছেলেরা কলরব করে পড়বে, সে বসে থাকবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, যেখানে যার ভুল হবে সংশোধন করে দেবে। তারা সব লোহার তাল। সে কামার। সে লোহার তাল থেকে নানান অস্ত্র গড়ে তুলবে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তার গায়ে ঘাম ঝরবে। সযত্নে শান ধরাবে তাদের ধারের মুখে। বছর বছরে ছেলেদের কতক লোয়ার প্রাইমারী পাস করে চলে যাবে, তারা বড় ইস্কুলে যাবে, সেখান থেকে যাবে কলেজে। কতজন কৃতী হবে জীবনে। দেখা হলে সবিনয়ে সম্ভ্রম করে 'পণ্ডিত মশায়' বলে তাকে সম্বোধন করবে। এখানে পড়াতে পড়াতে প্রৌঢ় হবে, বৃদ্ধ হবে, মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে, চালশেধরা চোখে চশমা নিয়ে সে তখনও পড়াবে। তারা তার চারিপাশে থাকবে, কচিকচি মুখ কলরব করে পড়বে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। অনেক রাত্রি হয়েছে; বাবুদের বাড়ির খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার সময় হল। সে উঠল। আলোটা নিয়ে আবার একবার ঘরখানি দেখলে। তার পর দুয়ারে তালাবন্ধ করে উঠানে নামল। তার পাঠশালা! আঃ!

উঠানে একটি বাগান করতে হবে। ছোট খুরপি কয়েকটা আর দুটো ছোট বালতি কিনবে। ছেলেরা গাছের গোড়া খুঁড়বে, পুকুর থেকে জল তুলে গোড়ায় দেবে;—চারিদিকে ফুল ফুটে থাকবে, চমৎকার শোভা হবে।

ছেলেদের একটা ফুটবল কিনে দিতে হবে। কয়েক পা গিয়ে মনে হল ঘড়িটার তলায়

দম দেওয়ার দিনটা লিখে দিতে হবে—বুধবার, সন্ধ্যা সাতটা।

নিত্য ভোরবেলা উঠে সে পুণ্যশ্লোকদের স্মরণ করে। বাল্যকাল থেকেই বাবার কাছ থেকে এটি সে শিখেছে। বাবা যা বলেন, ছেলেবেলায় সে যা শিখেছিল, তাতে ভুল ছিল কয়েকটা; এখন অবশ্য সে শুদ্ধ শ্লোকই বলে। আজ সে প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে শ্লোকটি উচ্চারণ করলে। সরস্বতীর মূর্তি মনে মনে কল্পনা করলে, সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করলে। তার পর সে স্মরণ করলে পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদের, রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করলে; সেই নর্মাল পাস পণ্ডিত মহাশয়কে স্মরণ করলে, প্রণাম করলে; এখানকার হেডমাস্টারকেও স্মরণ করলে, প্রণাম করলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীনের মূর্তি। তাঁকেও প্রণাম জানিয়ে সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে সে অত্যন্ত খুশী হল। সামনেই বাগানে ভোরের আবছায়ার মধ্যে বাঁধানো বেদীর উপর বসে ছিল ধীরানন্দ। আঃ, ভাল লোকের মুখই দেখলে সে; দিন তার ভাল যাবে। আজকের দিন ভাল যাওয়ার মানেই হল—তার পাঠশালার ভবিষ্যৎ ভাল হবে। গত রাত্রে সে বাড়ি যায় নাই। সকাল থেকে অনেক কাজ আছে। স্মিতমুখে এগিয়ে এসে সে ধীরানন্দকে বললে, বাঃ, আপনি তো খুব ভোরে ওঠেন।

ধীরানন্দ কিছু লিখছে। সে বললে, হ্যাঁ। লিখতেই থাকল সে। সীতারাম এই ছোট্ট উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। সে একটু ক্ষুণ্ণ হল। তবুও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বললে, আজ আপনাকে প্রণাম করব।

কেন? প্রণাম করবেন কেন?—মুখ না তুলেই বললে ধীরানন্দ।

আজ আমার পাঠশালা খুলব।

কিন্তু আমি তো কারও প্রণাম নিই না, নিজের লোক, মানে—ভাই-বোনদের ছাড়া।

আমিও তো আপনাদের আপনার লোক হয়ে গিয়েছি।

ধীরানন্দ লিখতেই লাগল, উত্তর দিলে না।

সীতারাম বিস্মিত হল না, কিন্তু মনে হল, এটা ধীরাবাবুর বাড়াবাড়ি, খানিকটা চালবাজির মত। সে প্রণাম না করেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল এবং ফিরল যথাসম্ভব দ্রুত। অনেক কাজ আছে। শুভ কাজ, তার জীবনের সাধের কাজ আরম্ভ করবে সে। গ্রামের সমস্ত দেবমন্দিরগুলিতে প্রণাম করতে হবে। তার পর এখানকার গ্রাম্যদেবতা—জাগ্রত বুড়ীকালী মায়ের স্থানে পূজা করাবে। পূজা শেষে নির্মাল্য নিয়ে কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে পাঠশালার দুয়ারের মাথায় টাঙিয়ে দেবে। মায়ের প্রসাদী সিঁদুর দিয়ে দরজার মাথায় লিখবে—সিদ্ধিদাতা গণেশ জয়তি! তার নীচে পাঠশালা খোলার দিনটি লিখে রাখবে, ২০ শ্রাবণ সন ১৩২২ সাল।

ঝরনা থেকে ফিরে দেখলে, ধীরানন্দ আর লিখছে না, লেখাটা পড়ছে। সীতারাম গাড়ুটি রেখে দিয়ে জামা-গেঞ্জি পরে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘরে তালা দিলে। এই সকালেই মন্দিরে প্রণাম সেরে আসবে।

ধীরানন্দ বললে, কতদূর বেড়িয়ে এলেন ?

ঝরনা পর্যন্ত।

আমিও সকালে বেড়াই রোজ, কিন্তু আজ আর হল না। ঘুম পাচ্ছে বড্ড।

বেশি সকালে উঠেছেন বলে বোধ হয়।

না, কাল রাত্রে ঘুমুই নি একেবারে। সমস্ত রাত্রি ধরে একটা কবিতা লিখেছি।

কবিতা!—অবাক হয়ে গেল সীতারাম, এইটুকু ছেলে কবিতা লেখে! সে প্রশ্ন করলে—কবিতা লিখলেন ?

হ্যাঁ। কিন্তু আবার এখন যাবেন কোথায় ?

ঠাকুর-দেবতাকে একটু প্রণাম করে আসি। একটা শুভ কাজ করতে যাচ্ছি—

একটু চুপ করে থেকে ধীরানন্দ বললে, কিন্তু একটা দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে যে। রঘুনাথ বাজের ছেলে এসেছিল আপনার খোঁজে। কাল রাত্রে কজন লোকে পাঠশালার উঠোনে খুব উপদ্রব করেছে। ওদের বাড়ি তো কাছেই। ওরা দেখেছে। মদ-টদ খেয়ে নেচেছে বোধ হয়, ক্ষতিও করেছে কিছু। কয়েকজন বাবুপাড়ার লোকের নাম করলে।

সীতারামের মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটল।

দাঁড়াম, আমিও যাব।

পাঠশালায় ঢুকে সীতারাম স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠান এবং বারান্দাটাকে কদর্যভাবে নোংরা করে গিয়েছে। উচ্ছিষ্ট শালপাতা, মাংসের অবশিষ্ট, হাড়ের টুকরা পড়ে আছে চারিদিকে। এঁটো মাটির হাঁড়ি ভেঙে ছড়িয়েছে। সাদা ধবধবে দেওয়ালে কাঠকয়লার টুকরো দিয়ে লিখেছে—চাষা-চাষা-চাষা, শুঁড়ি-শুঁড়ি-শুঁড়ি। একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখেছে। বিচিত্র তার ভাষা, বিচিত্র তার ভাব।—

“অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে যদি বা—
দোলায়াং যাতে—
ন চাষা সজ্জনায়তে।”

উঠানটা দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে। ইতরতম উপায়ে উঠানটাকে ময়লায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছে; এর মধ্যে দর্শকও অনেক জমে গিয়েছে। নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে তারা কেউ বা মন্দ বলছে ওই কুকীর্তির কর্তাদের, কেউ কেউ এই রসিকতার রসগ্রাহীর মত মৃদু

হাস্যের সঙ্গে মৃদুস্বরে তাদের তারিফ করছে। সীতারাম মাটির পুতুলের মত নির্বাক নিস্পন্দ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। এমন নিষ্ঠুর এবং ইতর অপমানের দুঃখ সে জীবনে অনুভব করে নাই। এর চেয়ে শিবকিঙ্কর যদি তাকে ধরে পথের উপর হাজার লোকের সামনে অকারণে জুতা খুলে মারত, তা হলেও তার এত দুঃখ হত না। জ্যোতিষ সাহাও এসে উপস্থিত হল; সে-ও স্তব্ধ হয়ে গেল প্রথমটা। তার পর সে সজাগ হয়ে উঠল। দৃষ্টি ফিরিয়ে চারিদিকে লোকদের দেখে নিয়ে ব্যস্তভাবে বললে, এই, যা তো, আমার বাড়ি থেকে টামনাটা নিয়ে আয় তো। রঘুনাথ, আছ ?

রঘুনাথ ছিল। সে বললে, আজ্ঞে।

চুন আছে আর ?

তা, খানিক-আধেক আছে বোধ হয়।

আছে ভাল, না থাকে দেখে-শুনে নিয়ে এস। দেওয়ালের লেখাগুলো ঘষে মুছে চুন লাগিয়ে দাও। যাও যাও, দেরি করো না। এই যে টামনা এনেছিস ? আচ্ছা, চার আনা পয়সা দোব, টামনা করে চেঁচে ময়লাগুলো ফেলে দে দেখি কেউ।

কেউ সাড়া দিলে না। সকলে সরতে আরম্ভ করলে।—আজ্ঞে, উ কে করবে !

আট আনা পয়সা দোব।

একজন বললে, গোটা টাকা দিলেও উ মাশায় হবে না। মতিয়া মেথরকে ডেকে পাঠান।

হঠাৎ একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল ; ধীরানন্দ এগিয়ে এসে টামনাটা তুলে নিলে।

জ্যোতিষ হাঁ-হাঁ করে উঠল, এ কি, ধীরাবাবু ?

ধীরানন্দ মালকোঁচা মেরে জামার আস্তিন গুটিয়ে টামনাটা নিয়ে একটা স্তূপের ময়লার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচে টামনায় তুলে নিলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

তার পর বললে, ব্যস্ত হয়ো না জ্যোতিষ। মতিয়াকে এগারোটার আগে পাবে না।

কিন্তু তাই বলে আপনি ! দেন, দেন, আমাকে দেন।

আমার অভ্যেস আছে। মতিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের বাড়ির ড্রেন আমি নিজে এক বছর পরিষ্কার করেছি। পাড়ার কুকুর মরলে সে বেওয়ারিস পচা জানোয়ার আমিই ফেলি। ধীরানন্দ হাসলে।

সীতারাম এবার এগিয়ে এল, তার নিস্পন্দ অসাড়তাটা এতক্ষণে কাটল বিপরীত একটা ভাবের আঘাতে। সে বললে, না, আমাকে দেন। আমার পাঠশালা।

তার চোখ দুটি থমথম করছে, ঠোঁট কাঁপছে। ধীরানন্দ বললে, এটা আমি ফেলে দি, এটা নিয়ে টানাটানি করে লাভ নাই। তাই সে করলে, ফেলে দিয়ে টামনাটা সীতারামের হাতে দিলে, বললে, আপনার পাঠশালা আপনি করবেন বৈকি, নিন।

সকল ক্লেদ যেন ধীরানন্দই মুছে দিলে। আবার সমস্ত পরিষ্কার করে স্নান করে যখন

সে দেবস্থানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, তখন তার মন দিব্য প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। সকল দেবস্থানে প্রণাম করে বুড়ীকালীমায়ের পূজা করিয়ে সে এসে পাঠশালায় উঠল। ততক্ষণে পাড়ার মাতব্বরেরা এসে বারান্দায় জমিয়ে বসেছে সব। জ্যোতিষ সাহা একজন মজুরকে দিয়ে আমের পল্লব খড়-পাকানো দড়িতে গেঁথে বারান্দাটার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত টাঙিয়েছে; দরজার দু পাশে, আমের পল্লব মুখে দুটি জলপূর্ণ কলসীও দিয়েছে; কলসী দুটির পাশে দুটি ছোট কলাগাছ। উঠানে ছেলেদের ভিড় জমেছে। তারা কলরব করছে। সীতারাম প্রসাদী নির্মাল্য নিয়ে উঠানেই দাঁড়াল। ভারি ভাল লাগল। সকালে যতখানি দুঃখে ভরে উঠেছিল তার মন, যতখানি ক্ষোভে বিষিয়ে উঠেছিল, তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি সুখে এবং আনন্দে তার মন ভরে উঠল। পৃথিবীতে মন্দ মানুষ যত আছে ভাল মানুষ তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি আছে; পাপের চেয়ে পুণ্য বেশি। এতে আর সন্দেহ নাই আজ তার। ভগবানের সৃষ্টি যে। ভগবানকে আবার একবার এই মুহূর্তে স্মরণ করে প্রণাম করে সে বারান্দায় গিয়ে উঠল।

নির্মাল্য বাঁধা, নাম লেখা শেষ করে সে চেয়ারে বসল।

জ্যোতিষ বসল পাশের চেয়ারে। নাও, ভর্তি আরম্ভ কর। আমার ছেলের নাম লেখ প্রথম—সীতেশচন্দ্র সাহা। ও বাবা সীতেশ, প্রণাম কর্ মাস্টার মশাইকে। দে, ভর্তির ফী দে। হ্যাঁ। আচ্ছা, স্বর্ণকারকাকা তোমার ছেলে কই গো?

একে একে ষোলোটি ছেলে ভর্তি হল। তার প্রসন্ন মনের কাছে এই ষোলো সংখ্যাটিও ভাল লাগল। ষোলো, শুভ সংখ্যা, পূর্ণতার লক্ষণ।

বিকেলবেলা চারটের সময় ছুটি। ছুটি দিয়ে, সমস্ত গুছিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে যখন পথে বেরিয়ে এল, তখন সে ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছে। চাবিটা দিতে হবে সাহা মশাইকে, তিনি লোক শোবার ব্যবস্থা করেছেন।

একটা জিনিস ভুল হয়েছে। টিফিনের সময় সেটা মনে হয়েছিল, ছুটির সময়েও আবার মনে হয়েছে। একটা ঘণ্টা চাই। ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বেজে ইস্কুল বসবে। ঢং ন-ন শব্দে ঘণ্টা বাজলে ছুটি হবে। তার পাঠ্যজীবনের কথা মনে পড়ল, ইস্কুল বসবার ঘণ্টা বাজত, সে যেন ডাক দিত। আবার ছুটির ঘণ্টা। ওঃ, এই শব্দটা কি ভাল লাগে ছেলেদের কানে। ঘণ্টা একটা চাই!

একটা দুঃখ। ধীরাবাবু এমন ব্যবহার করলেন, মা এত আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু স্থানু দেবুকে কিছুতেই ভর্তি করলেন না তার পাঠশালায়। বলেছেন—নানা রকমের সঙ্গ থেকে বাঁচাবার জন্যেই তো বাড়িতে তোমাকে রেখেছি বাবা। তুমিই তো পড়াবে ওদের।

ট্রেনের বাঁশী বাজল দূরে, গ্রামের স্টেশনে। চমকে উঠল সীতারাম। পাঁচটার ট্রেনে

মনোরমা আসবে। ইচ্ছা হল ছুটে যায়। পর-মুহূর্তেই সে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হল। আজ নয়, সে কাল। আজ বৃহস্পতিবার।

পাঁচ

বৃহস্পতিবারটা সে বাবুদের বাড়িতে ছুটি নিয়েছিল। শুক্রবার সকালে মনে হল, শুক্রবারটাও তার ছুটি নেওয়া উচিত ছিল। আজ মনোরমাকে নিয়ে বাবা আসবেন। পাঠশালা খোলার মত এটাও তার একটা সাধের দিন। কিন্তু লজ্জায় সে বলতে পারে নাই। হয়তো কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করত না, কিন্তু তবু লজ্জা বোধ করেছে সে।

মনটা খুঁতখুঁত করছে। মনোরমা আসবার আগে সে যা যা করবে ভেবেছিল, তার কিছুই করতে পারে নাই। এ কদিন সে কথা মনে করবার অবসরই হয় নাই; অবসর কেন মনেই যেন পড়ে নাই। ঘরখানা শুধু খড়িমাটি দিয়ে কৃষাণটা আর তার বউ দুজনে মিলে নিকিয়ে দিয়েছে। বাবা বড় তক্তপোশখানা মেরামত করতে দিয়েছিলেন, সেখানা যা হোক মতিলাল সূত্রধর পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেখানা বাইরেই পড়ে আছে। বড় শেল্‌ফ যেটা তৈরী করিয়েছে, সেটাও রত্নহাটার সতীশ মিস্ত্রীর বাড়ি থেকে আনা হয় নাই। আলনা এনেছেন নায়েববাবু, সেটা পড়ে আছে বাবুদের বাড়িতে। ইচ্ছা ছিল চার-পাঁচ টাকা দিয়ে একটা টাইমপিস অথবা পকেটওয়াচ কেনার; টাকায় টান পড়ায় তা হল না। মনে পড়ল ওখানকার ওষুধের দোকানে আরও দুটো প্যাকিং কেস কিনেছে; পুরানো কাপড় অথবা রঙিন গামছা ঢাকা দিয়ে রাখলে চমৎকার দেখাবে। একটার উপর থাকবে মনোরমার বাক্স। অন্যটা তক্তাপোশের পাশে রাখলে তার উপর আলো, জলের গ্লাস, পান, মশলা রাখা চলবে। বিছানায় শুয়ে মনোরমা না আসা পর্যন্ত বইটই পড়বে সে, বই রাখা চলবে। ইচ্ছা আছে, একখানা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ সে নেবে। পাঠশালার টিফিনের সময় কিছু পড়বে, বাকিটা রাত্রে বাড়ি ফিরে পড়বে, সেখানা রাখবে ওইটার উপর। আর একটি ইচ্ছা আছে তার, রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় বাবুদের বাড়ি থেকে কিছু ফুল নিয়ে যাবে। বাবুদের বাড়িতে রজনীগন্ধা, বেলা, জুঁই ফুলের কয়েকটা গাছ আছে; আর আছে একটি মালতীলতার গাছ, অজস্র ফুলে ভরে থাকে, সন্ধ্যার সময় থেকে গোটা বাড়িটাকে যেন মন্দির করে রাখে। প্রতি সন্ধ্যায় কিছু ফুল বাবুদের বাড়ির চাকর তুলে দিয়ে আসে ধীরাবাবুর পড়ার ঘরে। মাঝে মাঝে ডাঁটা সুদ্ধ রজনীগন্ধা কেটে নিয়ে যায়। ফুলদানিতে জল ভরে বসিয়ে রাখলে নাকি অনেক দিন থাকে। ফুল সে নিয়ে যাবে রোজ রাত্রে। ফুলগুলি কাঁসার রেকাবিতে সাজিয়ে ওই বাক্সের উপর রাখবে। কিন্তু প্যাকিং কেস দুটো রত্নহাটায়—ওই দোকানেই

পড়ে রয়েছে। খড়িমাটি নিকানো দেওয়ালে জানলা-দরজা কুলুঙ্গির মাথায় গিরি রঙ দিয়ে কয়েকটি আলপনা আঁকবার ইচ্ছা ছিল তাও হয় নাই। কিছু ছবি তার সংগ্রহ আছে, হুগলীতে থাকতে মাসিকপত্র থেকে কেটে একখানি খাতার মধ্যে রয়েছে, সেগুলির কয়েক-খানা পিসবোর্ডে আঠা দিয়ে এঁটে চারিধারে কালো কাগজের সরু পাড়ের মত বসিয়ে টাঙাবার কল্পনাও তার আছে। কিন্তু কিছুই হয় নাই। না হয়েছে, হবে। সব চেয়ে যেটা বড় কাজ সেটা তো হয়েছে, পাঠশালা তো হয়েছে। এই তার সব চেয়ে বড় আনন্দ। এইবার এগুলিও সে একে একে করবে। জয় ভগবান!—বলে সে শুয়ে পড়ল।

ভোরবেলা উঠে জামা গেঞ্জি লণ্ঠন লাঠি ছাতা নিয়ে বেরিয়েও কিন্তু গ্রামের প্রান্ত থেকে ফিরে এল। কিছুতেই তার যাবার ইচ্ছা হল না। সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত গুছিয়ে নিলে সে অনেক গুছিয়ে নিতে পারবে।

কৃষাণটাকে নিয়ে সে প্রথমেই চৌকিখানা ঘরের মধ্যে এনে পাতলে ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। শিয়রেই একটি জানলা, পাশেও একটি। জানলা অবশ্য নামেই, চওড়ায় এক হাত, লম্বায় দেড় হাত মাত্র। হোক, উপায় কি! পুরানো আমলের ঘর। হোক ছোট, তবু তো জানলা। তার পর সে কৃষাণটাকে বললে, রত্নহাটায় যা তুই। দৌড়ে যেতে হবে, আসতে হবে কিন্তু। প্রথমেই যাবি বাবুদের বাড়ি। বলবি, এ বেলা আমি যেতে পারলাম না। যদি বলে, কেন? তবে বলবি,—। সে চুপ করে গেল।

কি বলব?

বলবি,—। আরও কিছুক্ষণ ভাবলে সে, মিথ্যা শরীর খারাপ বলতে কেমন সঙ্কোচ হল তার। সত্য কথাটা শোভনভাবে কি করে বলা যায় ভেবে না পেয়ে সে বললে, বলবি, সে তিনিই বলবেন এসে। হ্যাঁ, সেখানে আমি যে ঘরে থাকি সেই ঘরে একটা নতুন আলনা আছে, কাঠের আলনা, নায়েববাবু বর্ধমান থেকে কিনে এনেছেন, সেইটা নিবি, কানাই রায়কে বললেই সে দেবে বার করে। এই ঘরের চাবি। ওষুধের দোকানে, সেখানে দুটো কাঠের বাক্স কেনা আছে। বলবি, সীতারাম মাস্টারের কৃষেণ আমি, দেন আমাকে। হাল্কা বাক্স, সে দুটোকে নিয়ে তার পর আসবি সতীশ মিস্ত্রীর কাছে। সেখানে আর একটা কাঠের জিনিস আছে।—সতীশকে বলবি, সেই কাঠের তাকটা দাও। সেও খুব হাল্কা। উপরে উপরে সাজিয়ে মাথায় নিয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে চলে আসবি, বুঝলি? জোর কদমে যাবি, জোর কদমে আসবি। তার জন্যে এই তোমায় দু আনা আগাম দিলাম, তাড়াতাড়ি এলে আরও দু আনা দোব।

কৃষাণটা চলে গেল। কৃষাণের বউটাকে বললে, ঘরের মেঝেটা, উঠোন বেশ করে নিকিয়ে দাও ভাজ বউ। তুমিও দু আনা পাবে।

তরুণী নয়, মধ্যবয়সী, সীতারামকে সে কিশোর দেখেছে, দেবর সম্পর্ক ধরে

কথাবার্তা বলে, সে হেসে বললে, আজ পয়সা লোব না। আজ তোমার বউ আসবে, আজ যা বলবে খুব ভাল করে করে দোব। কিন্তুক পূজোতে কাপড় লোব। কি, পলাইছ যি? ও দেওর!

আসছি। সীতারাম ছুটে বেরিয়ে গেল। ভাল কৈফিয়ত খুঁজে পেয়েছে সে। কৃষাণটাকে ডেকে ফিরিয়ে বললে, যদি বাবুদের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে, এল না কেন, তবে বলবি,—

হ্যাঁ, বলব, সে তিনি এসে বলবে।

না। বলবি—বাবা বাড়িতে নাই, বাড়ির কি কাজ আছে, তাই এ বেলা আসতে পারলে না! একেবারে পাঠশালায় আসবে। কেমন?

হ, তাই বলব।

হঠাৎ সত্য কথাটা বেশ সুন্দরভাবে গুছিয়ে তার মনে এসে গিয়েছে। সেই কথাটা বলে দিয়ে খুশি মনে সে বাড়ি ফিরল। পথে একটা গলিতে ঢুকে খানিকটা গেলেই তাঁতীদের বাড়ি। দুখানা বেশ রঙিন গামছা আনতে হবে। আঃ, বড় ভুল হয়ে গেল! কিছু ছোট পেরেক কিনতে দিলে হত। আকাশের দিকে চাইলে সে। উঠানে ছায়া দেখলে। সে আমলে উঠানের এই ছায়া দেখে সে ইস্কুলে যেত। শ্রাবণ মাসে বোধ হয় এইখানে—সিঁড়ির মাঝখানে পূবদিকের ঘরখানার ছায়া পড়লে, সাড়ে নটা বাজত, তারা ইস্কুলে যেত। এখনও সময় আছে অনেক। পাঠশালা তার এগারোটায়, সে এখান থেকে যাবে দশটায়। তন্তুবায়দের বাড়ি থেকে গামছা কিনে এনে ছবিগুলি বের করলে। আঠা তৈরি করে ছবিগুলো তৈরি করতে বসল।

বাবুদের সম্পর্কে কোথায় যেন তার একটা সঙ্কোচ আছে। হাতের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই একসময় সে ছুটল বাবুরের বাড়ি। পৌঁছল ঠিক সময়েই—সাড়ে দশটার মিনিট পাঁচেক আগেই। সংকল্প ছিল, ওখানে গিয়ে স্নান করে খেয়ে নিয়ে পাঠশালা যাবে। কিন্তু রাস্তাটা পৌঁছে বাবুদের বাড়ির কাছাকাছি এসে সে একটা সঙ্কোচ অনুভব করলে। যদি না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে? জিজ্ঞাসা করে, কি এমন কাজ ছিল গো? তবে সে কি বলবে? মনোরমা আসবে আজ, তারই জন্য ঘর-দুয়ারগুলো একটু গুছিয়ে রাখছিলাম—এ কথা কি বলা যায়? তা ছাড়া, সীতারামের বুকটা টিপটিপ করে উঠল, যদি বলে—এমন করে কামাই করলে কি কাজ চলে? বলা তো অসম্ভব নয়। মা হয়তো মিষ্টি কথায় বলবেন, ধীরাবাবু ঘুরিয়ে বলবেন। কিন্তু ওই ট্যারা নায়েববাবুটি তো সোজাই বলে দেবে, এমন কি কানাই রায়ও বলতে পারে। ওই মধ্যপদলোপী কর্মধারয় আর উপপদ এই দুজনের উপর ক্রমশ যেন তার মন বিরূপ হয়ে উঠছে। নায়েবের নাম দিয়েছে সে মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, সবের মধ্যেই আছেন, কেউ নন অথচ উনিই সব ঘটান। কানাই রায় নিতান্ত অপ্রধান

হয়েও, সকল কথাতেই আছে, অধিকার থাক না থাক, মাতব্বরি করবেই, তাই ওর নাম দিয়েছে 'উপপদ'। ওরা যদি কৈফিয়ত চেয়েই বসে, তখন উপেক্ষা করে জবাব না দিলে মান অবশ্য তার বাঁচবে, কিন্তু কাজ না করে ভাতের জন্য গিয়ে দাঁড়ালে, অপমান তার হয়ে যাবে, নিজেই করে ফেলবে ; তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল। সে ফিরল। অস্নাত অভুক্ত অবস্থাতেই এসে পাঠশালা খুলে বসল।

ছুটির পর সে বাবুদের বাড়ি গেল। কিন্তু এবারও তার আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। নায়েব হেসে বললে, কই পণ্ডিত, সন্দেশ কই ?

সন্দেশ !

কানাই হেসে বললে, শ্বশুরবাড়ির ?

নায়েব বললে, বউ এল ! ও, না, পাঁচটার ট্রেনে আসবে বুঝি ?

সীতারামের কান দুটো লজ্জায় গরম হয়ে উঠল। সে বুঝলে হতভাগা কৃষাণটা সব বলে ফেলেছে।

কানাই বললে, যাও, বাড়ির ভেতর যাও। শ্যামু-দেবু খেপেছে, মাস্টার মশায়ের বউ দেখতে যাবে।

সীতারাম আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এবং ও-বেলার সঙ্কোচের জন্য নিজের কাছেই সে লজ্জিত হল। নায়েব এবং কানাইয়ের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্যও গ্লানি কম হল না। সে ঠিক করলে, ঠকতে যদি হয় তবে মানুষকে ভাল ভেবে ঠকাই ভাল। মন্দ ভেবে ঠকার চেয়ে অপরাধ আর হয় না, তাতে অপরাধী সাজতে হয় নিজের কাছে। এই মুহূর্তে সেই সংকল্পই নিলে সে।

শ্যামু আর দেবু ঝগড়া বাধিয়ে যুদ্ধ লাগিয়েছিল, আর কেউ নাই বাড়িতে। নির্জনে দ্বন্দ্বযুদ্ধটা জমেছে ভাল। শ্যামু বড়, তার সঙ্গে দেবু পেরে উঠছে না, মাটির উপর পড়েছে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু আশ্চর্য ছেলে, তবু কাঁদছে না। সীতারাম একটু হেসে এগিয়ে গেল, ছাড়, ছাড় শ্যামু।

এই সময়টিতে মা বেরিয়ে এলেন। তিনিও বললেন, শ্যামু ! দেবু !

সীতারাম দেখলে, মায়ের গলার শব্দে ম্যাজিক হয়ে গেল, শ্যামু সরে এল, কিন্তু দেবু উঠল না, স্থির হয়ে মাটির উপর পড়ে রইল।

সীতারাম সস্নেহে তাকে তুলতে চাইলে, কিন্তু কিছুতেই সে উঠবে না। কোন অবলম্বন না পেয়ে সে উঠানটাকে নখে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। সীতারাম হেসে তাকে কোলে তুলে নিলে। সে মুহূর্তে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দুই হাত দিয়ে পাগলের মত মাস্টারের মুখে চড়-কিল মারতে লাগল। সীতারাম বিব্রত হয়ে তাকে দুই হাতে ঝুলিয়ে একটু দূরে ধরলে। সে এবার পা দুটো ছুঁড়তে লাগল। অত্যন্ত অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছে সে পরাজয়ের লজ্জায়।

মা আবার একবার বললেন, দেবু!

দেবুর পা দুটো স্থির হল, হাত দুটো শিথিল হয়ে গেল, মাথাটা ঝুঁকে পড়ল, পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মত।

মা বললেন, সীতারাম, ওকে নামিয়ে দাও এইখানে—নামিয়ে দাও।

সীতারাম অমান্য করতে সাহস করলে না সে কণ্ঠস্বরের আদেশ।

মা বললেন, দেবু, তোমার এই দোষের জন্যে তুমি স্টেশনে যেতে পারবে না মাস্টার মশায়ের বউ দেখতে। শ্যামু, তুমি জামা গায়ে দাও।

সীতারাম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বড়লোকের বাড়ির শাসন অদ্ভুত; তার মনে হল এই ব্যাপারটায় সে যেন অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, এমন শাসনপ্রণালী যাদের তাদের পড়াবার যোগ্যতা তার নাই। তার বড় ইচ্ছা ছিল, শ্যামুর হাত ধরে, দেবুকে কোলে নিয়ে স্টেশনে যাবে, মনোরমাকে দেখাবে তাদের। দেখাবে কেমন তার ছাত্র দুটি। কিন্তু এই ঘটনার পর সে কথা তুলতে তার সাহস হচ্ছে না।

মা বললেন, বউমাকে এখানে জল খাইয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে বাবা?

সীতারাম বললে, অন্য একদিন আসবে। আজকে—। অভিমান করেই কথাটা বললে সে। নইলে ইচ্ছা ছিল তার। পাঠশালাটি পর্যন্ত দেখাতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু—, ক্ষুণ্ণ মনে শ্যামুকে নিয়েই সে স্টেশনে গেল।

মনোরমা নামল ট্রেন থেকে। ট্রেনের মধ্য থেকেই ঘোমটার ভিতর দিয়ে তার চোখের কালো তারা দুটি সীতারাম দেখতে পেলে, তারই দিকে সে চেয়ে আছে। ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছে। লজ্জা হল সীতারামের, সে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং কর্মতৎপর হয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে ফেলতে আরম্ভ করলে।

বাবা বললেন, তুই এত ব্যস্ত হোস না, লাগাবি কোথায়। কৃষাণটাকে দে না নামাতে।

কৃষাণটা এসেছে, সেই সব জিনিসপত্র নিয়ে যাবে, তার বউটাও এসেছে, ওদের বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেটাও এসেছে। মুনিবান যে ওদের! তা ছাড়া প্রথম বউ যখন আসছে, তখন জিনিসপত্র একজনের ভারের চেয়ে বেশি হবে এ ওরা জানে। জিনিসপত্র বেশ দিয়েছেন শ্বশুর।

সীতারাম বললে, বাবুদের মেজো ছেলে, আমার বড় ছাত্র এসেছে দেখতে।

বাবা বললেন, কই?

ঘোমটার ভিতর থেকে মনোরমার উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সীতারামের মুখের উপর নিবদ্ধ হল। সীতারাম হেসে পিছন ফিরে দেখলে, শ্যামুর পাশে কানাই রায় দেবুকেও কোলে নিয়ে কখন এসে দাঁড়িয়েছে। দেবু মুখ টিপে হাসছে।

কানাই হেসে বললে, মা পাঠিয়ে দিলেন। বউমাকে জল খাইয়ে নিয়ে যেতে বললেন।

সীতারাম দেবুকে কোলে নিয়ে বললে, তুমি চল রায়কাকা, আমি যাচ্ছি।

বাবা কৃষাণদের মাথায় জিনিসপত্র চাপাতে ব্যস্ত। সীতারাম মৃদুস্বরে দেবুকে বললে, এই দেখ, মাস্টারের বউ—তোমাদের মাস্টারনী। যাও কোলে যাও। সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা হাত বাড়াল।

দাঁতে খামচ কেটে হাসি চেপে দেবু আঁকড়ে ধরলে মাস্টারকে।

সীতারাম হেসে মনোরমাকে বললে, ভারি লাজুক আর জেদী। আজ আমাকে মেরেছে। তুমি বরং শ্যামুকে নাও।

মনোরমা শ্যামুকে কোলে তুলে নিলে। সীতারাম বললে, এস, রাণীমা বলেছেন, বাড়িতে জল খেয়ে তবে যেতে পাবে। আমার ছাত্র বটে, জমিদার-বাড়িও বটে—দেখাও হবে।

মা বললেন, বেশ বউ। চমৎকার মেয়ে। আশীর্বাদ করলেন দুটি টাকা দিয়ে। বললেন, নিজে সুখী হও, স্বামীকে সুখী কর। সীতারামকে বললেন, তুমি আজ বউমাকে নিয়ে বাড়ি যাও বাবা। শ্যামু-দেবুকে আজ ছুটি দাও, ওদের গুরুমা এসেছেন।

সীতারাম মুগ্ধ হয়ে গেল কথা কটি শুনে। এমন কায়দা করে কথা বলা সে আর শোনে নাই। শ্যামু-দেবুর ছুটি তাকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে তাকে ছুটি দিচ্ছেন। সে বললে, না। আমি পড়িয়ে খেয়ে যেমনই যাই, তেমনই যাব। নাঃ, আর কর্তব্যে অবহেলা করবে না সে।

সন্ধ্যার পর ছেলেদের পড়িয়ে খেয়ে যাবার সময় সে সকলের অলক্ষ্যে কতকগুলি মালতী ফুল তুলে নিলে। দিনের বেলায় তুলতে পারে নাই লজ্জায়। ছুটি নিতে আপত্তি ছিল না তার, কিন্তু ফুলগুলি তোলা হত না।

মনোরমা খুশী হল। বললে, পণ্ডিত লোক।

সীতারাম হাসলে। তার পর বললে, ঘরদোর পছন্দ হয়েছে?

মনোরমা বললে, আমার লজ্জা লাগছিল।

কেন?

বাবা ঘরে ঢুকে বললে—বাঃ, এ যে খুব ভাল করে রেখেছে সীতারাম। বা, বা, বা! তার পর বললে—বউমা, সীতাকে নিয়ে আমার ঘরটাও এমনিই করে দিও বাছা। শুনে, আমার ভারি লজ্জা লাগল বাপু।

সীতারামও লজ্জা পেলে। ছি ছি ছি! শুধু ছি-ছি-ই নয়, অন্যায় হয়েছে। বাবার ঘরখানা আগে সাজানো উচিত ছিল তার। ছি!

মনোরমা বললে, সেই থেকেই তো দেখছি আর ভাবছি, পণ্ডিত লোক বটে বাপু!

সীতারাম তাকে এবার সাদরে বুকে টেনে নিলে।

ঘাড়ে মুখ রেখে মনোরমা বললে, জান, যখন খবর গেল, তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পার নাই, তখন আমার কান্না পেয়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিলাম আমি। তা, আর খেদ নাই আমার। বাবুদের বাড়িতে খাতির দেখলাম, ছাত্র দেখলাম, এই আমার ঢের।

আবেগে সীতারামের বুক ভরে উঠল। মনে হল তার চেয়ে সুখী আর কেউ নাই।

ছয়

সুখী সীতারাম। সুখের জীবনে বর্ষার সতেজ গাছের মত সে বাড়তে আরম্ভ করেছে। সুস্থ দেহে সবল পদক্ষেপে সে পথে হেঁটে চলে, উৎসাহদীপ্ত চোখে ছাত্রদের মুখের দিকে চেয়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ায়। প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাদের মনের মত গড়ে তুলতে। আদর করে, তিরস্কার করে, প্রহারও দেয়। মনোরমাকে সুখী করবার চেষ্টা করে, মনোরমা তাকে সুখী করেছে। বাবার সেবা করে। কিন্তু ওইখানে যেন হঠাৎ একটা কাঁটা উঠেছে, অহরহ খচখচ করছে—নিষ্ঠুররূপে দুঃখদায়ক সেটার স্পর্শ। বুঝতে পারে না—এ কাঁটাটা কেমন করে কোথা থেকে উঠল।

না বুঝলেও সীতারাম ধীরভাবেই এ দুঃখকে গ্রহণ করলে।

সুখ আর দুঃখ—এই নিয়ে জীবন। আলো আর অন্ধকার, দিন আর রাত্রি—এই নিয়ে কাল। পৃথিবীর মাটি, যে মাটিতে ফসল ফলে, যে মাটিতে শুলে মনে হয়, মায়ের কোলে শুয়েছি, সেই মাটিতে পাথর আছে, সে পাথর পায়ে বেঁধে, নখে আঘাত দেয়, তার উপর আছাড় খেয়ে মানুষ মরেও যায়। জল, যে জলে অঙ্গ শীতল হয়, বুকের ভিতরটা জুড়িয়ে যায়, সেই জল মধ্যে মধ্যে বন্যা হয়ে এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এসব কথা সীতারাম জানে। তাই ছোটখাটো বাধা-বিঘ্ন এবং দুঃখ সত্ত্বেও সে তার জীবনকে সুখের জীবন বলেই মনে করে।

হঠাৎ এই দুঃখের মধ্যে একদিন বাবা রমানাথ মারা গেলেন। আঘাতটা তার পক্ষে ভয়ঙ্কর আঘাত; মর্মান্তিক হয়ে উঠল। চার বৎসর বয়সে সে মাতৃহীন হয়েছিল, সেই সময় থেকেই বাবা তার মা এবং বাবা দুই-ই হয়েছিলেন।

মরবার সময় বাবা তাকে বললেন, কাঁদিস না যেন। আমি তোর সুখের যাওয়া যাচ্ছি রে। তুই আমার বংশের মান বাড়িয়েছিস, দশজনা তোকে পণ্ডিত বলে খাতির করছে, ঘরে আমার লক্ষ্মীর মতন বউমা; আমার যেতে খেদটা কিসের? একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিলেন, খেদ একটি থাকল, তোর ছেলে দেখতে পেলাম না। তা—তা আমিই আসব ফিরে তোর ছেলে হয়ে।

সীতারাম পাথরের মূর্তির মতন বসেছিল। সে চঞ্চল হলে, তার চোখে জল দেখলে তার বাবা হয়তো মহাযাত্রার সময় চঞ্চল হবেন। একটা গল্প তার বার বার মনে পড়ছিল। সে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। সে সময় শান্তিনিকেতনে একটা বিষণ্ণ ছায়া পড়েছিল সর্বত্র। পূর্বে পূর্বে যেমন দেখেছিল, ঠিক তেমনটি যেন নয়। খবর নিয়ে জেনেছিল, কবিবর রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলে দীপেন্দ্রনাথ সদ্য মারা গিয়েছেন। সে নিজেও দুঃখিত হয়েছিল, আহা, বৃদ্ধ বয়সে এ কি দুঃখ পেলেন তিনি! এত বড় কঠোর আঘাত কি আর হয়? ভগবানকে বলেছিল, তোমার কি এই বিচার? ফিরবার সময় দ্বিজেন্দ্রনাথের বাংলো-বাড়িটির পাশ দিয়েই সে ফিরেছিল। একবার তাঁকে দেখবার ইচ্ছা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের বাংলোর সামনে খোলা বারান্দায় বোলপুরের উকিলেরা এসে বসে ছিলেন, তাঁকে সমবেদনা জানাতে এসেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রশান্ত মুখে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, কটি কথা তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। দেহের লয় মৃত্যু, এ তো অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য শোক—। কথা শেষ না করেই তিনি হেসেছিলেন। অপূর্ব সে হাসি! এমন হাসি সীতারাম জীবনে কাউকে হাসতে দেখে নাই। তার পর তিনি অন্য কথা বলতে আরম্ভ করলেন! উকিলদের জনে জনে কুশল জিজ্ঞাসা আরম্ভ করলেন।

তিনি অবশ্য মহাপুরুষ, ঋষিতুল্য মানুষ; সে সামান্য জন; তাঁর সঙ্গে তুলনা কার? কিন্তু মহাজনদের অনুসরণই তো মানুষের করা উচিত। সে কাঁদলে না।

লোকে কিন্তু অন্য কথা বললে, জঘন্য নিন্দা করলে তার। বললে, বাবা ম'ল ভাল হল— কথায় বলে না, সীতারামের তাই হয়েছে। বুড়ো অহরহ খিটখিট করত, বুড়ো মরেছে, ও খালাস পেয়েছে।

ইদানীং বাবার ওই একটা কেমন ভাব হয়েছিল। সুখের জন্য যে সংসার তিনিই পেতেছিলেন, সে সংসার যেন তাঁর অসুখের কারণ হয়েছিল। সর্বদা যেন অসন্তোষ লেগেই থাকত। কিছুই পছন্দ হত না। মনোরমার উপর বিরূপতাটা ছিল বেশী, কোন যত্ন করতে গেলেই বলতেন, থাক্, বাছা, থাক্! 'বাছা' বলতেন, 'মা' বলতেন না।

মনোরমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অপরাধিনীর মত।

বাবা এতেও রাগ করতেন, রাগ যেন বেড়ে যেত, বলতেন, যাও না বাছা, কাজকর্ম যা আছে করগে যাও। যাও, সীতা কি চাইছে দেখ।

শেষের কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকত, ছাইয়ের পাতলা স্তরঢাকা জলন্ত অঙ্গারের মত। উত্তাপের জ্বালা গায়ে লাগত সঙ্গে সঙ্গে।

একদিন বাবা খাবারের থালা পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অরুচি ধরেছিল তাঁর। সীতারামই বলেছিল, রাত্রে একটু হালুয়া করে দিও, মুখেও ভাল লাগবে, ঘি-দুধও একটু পেটে পড়বে। চাষীর বাড়িতে মুড়িই জলখাবার, গুড়ই মিষ্টান্ন, সুজি-চিনির কারবার ছিল

না। ঘি চিরদিনই আছে, দুধের সর জমিয়ে ঘি তোলা হয়, অবশ্য বিক্রির জন্যই তোলা হয়। সুজি-চিনি সীতারাম এনে দিয়েছিল রত্নহাটা থেকে। মনোরমা রাত্রে হালুয়ার থালাখানি তাঁর সামনে নামিয়ে দিতেই তিনি হাত দিয়ে নেড়ে নাকে শুঁকে, আলোটা উস্কে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, এ আবার কি?

একটু হালুয়া তৈরী করেছি আপনার জন্যে।

হালুয়া? মোহন-ভোগ?

হ্যাঁ। কিছুতেই খেতে পারছেন না। খই-দুধই বা আর খাবেন কত? তাই—

তাই হালুয়া হয়েছে?

এবার ভয় পেয়ে গিয়েছিল মনোরমা। সে উত্তর দিতে পারে নাই।

চিনি আমার ক্ষেত থেকে হয়? না, সুজি আমার ক্ষেত থেকে হয়? এর পর আকস্মিক বিস্ফোরণের মত তিনি ফেটে পড়েছিলেন, আমি চাষার ছেলে চাষা। নুন ছাড়া বাদে ক্ষেতের জিনিস ছাড়া আর কিছু কিনে আমি তো আমি—আমার চৌদ্দপুরুষ খায় নাই। আমি খাব হালুয়া?—বলে থালা-খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে গিয়েছিলেন। আক্ষেপ তখনও তাঁর থামে নাই, তিনি বলেই গেলেন, লক্ষ্মী ছাড়ালে, তুমিই আমার লক্ষ্মী তাড়ালে।

সমস্ত পাড়াময় তিনি এই কথা বলেও বেড়িয়েছিলেন। লক্ষ্মীছাড়া বউ আমার লক্ষ্মী ছাড়ালে।

সীতারামকেও তিনি রূঢ়ভাবে অকারণে তিরস্কার করতেন মধ্যে মধ্যে। রবিবার দিন, সে এখন রবিবার দিনেও বাড়িতে থায়, ভোরে বাবুদের বাড়ি গিয়ে ছেলেদের পড়িয়ে সাড়ে দশটায় বাড়ি ফেরে, সমস্ত দিনটাই বাড়িতে থাকে, সন্ধ্যায় আবার যায়, রাত্রে ফিরে আসে নিত্যকার মত। একটা রবিবারে বাবা মাঠ থেকে ফিরেছিলেন ক্লান্ত হয়ে, সীতারাম গিয়েছিল বাতাস করতে। পাখাখানা হাত থেকে নিয়ে বলেছিলেন, থাক্ বাবা, থাক্, আমি চাষার ছেলে চাষা, রোদে জলে চাষে খেটেই জীবন গেল, যাবেও। আমরা চেয়ারে বসে পণ্ডিতি করি না। পাখার বাতাস খাওয়া আমাদের অভ্যেস নাই।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সীতারাম।

বাবা তবু ক্ষান্ত হন নাই, বলেছিলেন খুব মিষ্ট ভাবে, রবিবার ছুটির দিন, আজ একটুকু আমোদ-আহ্লাদ করগে যাও।

এজন্য সীতারাম একটু দূরেই থাকত। মনোরমার সে উপায় ছিল না, সেইজন্য সে মনোরমাকে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু মনোরমা অদ্ভুত মেয়ে, সে হেসে বলত, তোমারই বাবা, আমার কেউ নয় বুঝি?

তবু লোকে এই কথা বললে! বলুক, তার জন্য সীতারামের আক্ষেপ নাই। সে শুধু মধ্যে

মধ্যে ভেবে দেখে, বাপের সেবায় কোন ত্রুটি সে করেছে কিনা। তার পারলৌকিক কাজ সে যথাসাধ্য করেছে কিনা।

মধ্যে মধ্যে গভীর চিন্তা করে সে, খতিয়ে হিসেব করে দেখে।

পাঠশালার ছেলেরা তার অন্যমনস্কতা ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে চেয়ে দেখে; একজন অন্যজনকে ইশারা করে দেখায়। বড় ছেলেরা মধ্যে মধ্যে ফিসফাস শব্দে গবেষণা করে।

কি রকম হয়ে গিয়েছে পণ্ডিত।

হুঁ ভাই।

বাবা মরেছে কিনা।

হুঁ।

বেঁচেছি কিন্তু। আর মারে না। আকু বলে ছেলেটা খুকখুক করে হাসতে আরম্ভ করে। ছোট ছেলেরা গবেষণা করে না, তারা একটু অবাক হয়। মাস্টার আর মারে না কেন ভাই?

বাবার মৃত্যুকে উপলক্ষ করে এটা সীতারামের একটা অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, যার ফলে ছেলেদের সে আর মারবে না, অন্তত গুরুতর অপরাধ না হলে মারবে না ঠিক করেছে। সে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

বাবার অসুখের প্রথম দিক তখন। সেই দিনই সকালে সে অসুখের গুরুত্ব বুঝে ডাক্তার ডেকেছিল। ডাক্তারকে দেখিয়ে সে ডাক্তারের সঙ্গেই এল রত্নহাটা, তখন সবে সাড়ে দশটা। ছেলেরা সব এসে পাঠশালায় কলরব করছিল; সে পাঠশালায় ঢুকে তাদের বললে, তোমরা নিজেরা বসে পড়। আমি একবার ডাক্তারবাবুর দোকানে যাচ্ছি; ওষুধ নিয়ে শিগগির আসব আমি, বুঝলে?

ডাক্তারের কাছে ওষুধ নিয়ে কৃষাণটার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু ডাক্তার বললেন, আপনি নিজে নিয়ে যান। ও বলতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলবে। প্রথমে পারগেটিভ, তার পর একটা পাউডার, তার পর মিক্‌স্চার দু দাগ পর পর, বিকেলবেলা আবার একটা পাউডার, এ ও বুঝতেও পারবে না, বোঝাতেও পারবে না।

সীতারাম বললে, হ্যাঁ, তা ঠিক বলেছেন। আবার বাড়ি ফিরল সে। ফিরবার সময় পাঠশালায় বলে গেল, পড় তোমরা, আমি আসছি। আমার বাবার অসুখ, ওষুধটা দিয়ে শীগ্‌গির আসছি।

একবার ছুটি দিতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সে তার ভরসা হল না। রত্নহাটা বড় কঠিন স্থান। এখানে দশ দিনের সেবার বিনিময়েও একদিনের ত্রুটির মার্জনা নাই। ওদিকে বড় স্কুলের পাঠশালার সজাগ দৃষ্টি তার গলদের দিকে। তাই সে ওষুধটা দিয়ে ফিরে আসাই

স্থির করলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, সওয়া এগারোটা। দু মাইল পথ, যেতে আসতে চার মাইল। একটার মধ্যেই সে ফিরতে পারবে। টিফিনের পর থেকে পড়ানো হবে। কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেরি হয়ে গেল। খাওয়া হয় নি, মনোরমা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লে না। পাঠশালায় ফিরতে বেজে গেল দুটো। পাঠশালার বাইরের দরজায় এসে সে থমকে দাঁড়াল। ভাবছিল, পা ধুয়ে ঢোকাই উচিত। ভিতরে ছেলেরা কলরব করছে, হঠাৎ ভেতর থেকে তার কানে এল—একজন বলছে :

চল্ রে চল্, আজ আর আসবে না। বক্তা আকু। আকু বাবুদের পাড়ার একটি বিচিত্র জন্তু। সীতারাম বলে, জন্তু, মূর্তিমন্ত বিঘ্নরাজ। সীতারাম ওকে 'আকু' বলে না, বলে 'অক্রূর'। অক্রূরের কথা শুনে সীতারামের হাসি পেল ; ওরা বেরিয়ে আসবে এই প্রত্যাশায় সে দরজার বাইরেই দাঁড়াল, এসেই থমকে যাবে ওরা। কানে এল, জ্যোতিষের ছেলে সীতেশের কথা, না ভাই, যদিই আসে !

কক্ষনো না। আমি বলছি। আমি ঠিক জানতে পারি যে। মাস্টার বাড়ি গিয়েছে, আর তার বাবাও মরে গিয়েছে। বাস্। এখন আর এক মাস আসবে না। এক মাস অশুচ তো। ভারি মজা, এক মাস এখন কিলচড় নাই।

সীতারামের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করে উঠল। রাগে ভিতরটা গর্জে উঠল।

একজন বললে, তার পরে তো আসবে, তখন সুদে-আসলে পুষিয়ে দেবে ; লাগ্ ধমাধম, লাগ্ ধমাধম ! বাবা রে ! ছেলেটা বোধ হয় শিউরে উঠল।

আকু বললে, দাঁড়া, দাঁড়া, আমি ধ্যান করে দেখি ! হ্যাঁ। শোন্, ঠিক তখুনি মাস্টারের বউ মরে যাবে। বাস্, আবার এক মাস। তার পরে, অশুচটি যেই যাবে, হ্যাঁ, ঠিক তখুনি মাস্টার নিজেই মরে যাবে। বাস্ !

সীতেশ বললে, না ভাই। আহা, কি দোষ করেছে পণ্ডিত যে মরে যেতে বলছ ?

বেজায় মারে ভাই। বাবাঃ! আমাকেই বেশি মারে। এক-একসময় মনে হয়, আমি এইবার মরেই যাব।

সীতারাম ভিতরে ঢুকল। পা ধুতে সে ভুলে গেল। চুপ করে গিয়ে চেয়ারে বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলে। হঠাৎ তার চোখে জল এল। ছোট কচি দেহে বড় লাগে, বড় যাতনা হয় ওদের, মনে হয়, মরে যাবে। না, ওদের দোষ নাই। দোষ তার। না, আর সে তাদের মারবে না !

বাবার মৃত্যুর মাস দুয়েক পর পাঠশালায় বসে সে কথাগুলি মনে করছিল। আজও সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবছিল এদের দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তাপেই হয়তো সে বাবাকে হারিয়েছে। আজও সে বাবার কথাই ভাবছিল।

বাবা নাই। সংসারটা খাঁ-খাঁ করছে। অশান্তি ছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না; কন্তু বাবার জমজমাট ছিল কত। কথার ছল বাদ দিলে, আবদেরে ছেলে আর বাবার ধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। অন্যদিকেও অসুবিধা হয়েছে, চাষের ভার এসে পড়েছে তার উপর। অবশ্য মনোরমা খুব হিসেবী মেয়ে, চাষের কাজকর্ম সবই সে জানে। কিসে কী াগে, কত লাগে, ও-ও জানে। কিন্তু মাঠের অবস্থা সে তো বউ হয়ে দেখতে পারে না। ীতারামকেই এখন একটু বেশী ভোরে উঠতে হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠ ঘুরতে ঘুরতে া রত্নহাটায় চলে যায়। ভর্তি চাষের সময়, ঝরনার ধারে আর বসে না, বাড়ি আসে, মাঠ খে। তা সত্ত্বেও চাষের অবনতি কিছু হয়েছে। তার আর উপায় কি? কথাটা বাবা দতেন।

মধ্যে মধ্যে বাবুদের বাড়ির চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু বড় বেশি তো পড়ে গিয়েছে শ্যাম-দেবুর উপর। তা ছাড়া মায়ের স্নেহ, ধীরাবাবুর স্নেহ, সেও তার বনের একটা সম্পদ। ধীরাবাবু এখন কলকাতায় পড়ছেন, তিনি তাঁর পড়ার ঘরের বইগুলি থবার ভার দিয়ে গিয়েছেন তাকে। সীতারাম যখন সেই ঘরে ঢোকে, তখন মনে হয়, টা নতুন রাজ্য। বই পড়ে। বই বাড়ি নিয়ে যায়। বই নিয়ে যেতে ধীরাবাবুর বারণ। লছেন, ঘরে বসে পড়বেন, কিন্তু বাইরে নিয়ে যাবেন না। বাইরে গেলে বই ফেরে না। শ্য আপনাকে অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু আমি ওটা পছন্দ করি না। সীতারাম কাপড় া দিয়ে বই নিয়ে যায়, আবার ফিরিয়ে আনে, রেখে দেয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, সব বই বত দেওয়া হয় নাই।

এই, এই, কি হচ্ছে সব?

পাঠশালার ছেলেরা অঙ্ক কষছিল, চমকে উঠল। ভাল ছেলেরা স্লেট নিয়ে আরও ধান হয়ে বসল। কেউ দেখছে, টুকছে। যারা দেখছিল, তারা নিজেদের স্লেটের দিকে াযোগী হয়ে পড়ল। দু-একজন ঢুলছিল, তারা জেগে নড়ে-চড়ে বসল। সীতারাম কিন্তু া পেলে,—ছি, ছি, অন্যমনস্কভাবে ধমকটা দিয়ে ফেলেছে সে। ব্যাপারটাকে সহজ করে ার জন্য সে গম্ভীরভাবে বললে, অঙ্ক কষ। হল সব? শেষ কর। সে চুপ করলে। নো কথা আবার মনে হল। বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে, কয়েকখানা বই দীর্ঘদিন ধরে র ঘরে রয়ে গিয়েছে। বই কখানা ভাল লেগেছিল, তাই আরও দুই-একবার পড়বার ইচ্ছায় খ দিয়েছে।

আবার সে সজাগ হয়ে পড়াতে বসল।

বাইরে রাস্তার উপর থেকে কেউ হেঁকে উঠল, হ্যাঁ রে অর্বাচীন, আঁচলে করে মুড়ি খাচ্ছিস —ন, আঁচল যে অঁ—টো—হবে।

সীতারামের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। তাকেই কেউ ব্যঙ্গ করে গেল। সে পণ্ডিত

শিক্ষক, তাই যথাসাধ্য শুদ্ধ উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে তার অজ্ঞাতসারে তার বাল্যজীবনের শেখা তাদের গ্রাম্য চাষী-সমাজের দু-একটা কথা বেরিয়ে যায় মুখ থেকে, গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটে যায়। একদিন একটি ছেলেকে আঁচলে মুড়ি খেতে দেখে, আঁচলটা উচ্ছিষ্ট হল এই বিষয়ে তাকে সচেতন করতে এঁটোর পরিবর্তে গ্রাম্য কথা অঁটো সত্যিই বেরিয়ে পড়েছিল। রত্নহাটার উচ্চনাসার দল কি করে জেনেছে এবং এই নিয়ে তাকে ব্যঙ্গ করে। প্রথমে 'কেন'র শহুরে উচ্চারণের উপর জোর দিয়ে, পরে গ্রাম্য কথা অঁটোর উপর জোর দিয়ে ব্যঙ্গটাকে প্রকট এবং প্রখর করে তোলে। এর মূলে আছে শিবকঙ্কর।

তার পাঠশালার ছাত্রই কথাটা প্রথম বলতে আরম্ভ করে। এমন কি ব্যঙ্গের সুরটুকু পর্যন্ত সংযোজন করেছে সে-ই, এবং সে ছেলেটি হলেন শ্রীমান আকু। তার কাছে শুনে শিবকিঙ্কর হাটে বাজারে ছড়িয়েছে। আজকাল তার পাঠশালায় কিছু বাবুদের ঘরের ছেলে আসছে। বেশী বেতন এবং বেতন দেওয়ার সমস্যায় বড় ইস্কুলের পাঠশালায় তাদের পড়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এখানে ছেলে পড়ানো অনেক সুবিধাজনক মনে হয়েছে অভিভাবকদের। এ ছাড়া ছেলেগুলিও অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির, তাই বড় বড় ইস্কুলের পাঠশালায় মাস্টারেরা মাইনের জন্য কড়া তাগাদার অছিলায় কঠোর শাসনে তাদের তাড়িয়েই দিয়েছে ওখানকার পণ্ডিতেরা বলেও দিয়েছেন, যা না বাবা, রত্নহাটায় রত্নতৈরির আখড়া সীতারামের পাঠশালায়। এখানে কেন? বাধ্য হয়েই ওরা এসেছে।

বড় ইস্কুলের এই ধরনের কথায় এবং আচরণে সীতারামের দুঃখ হয়। খারাপ ছাত্র দিয়ে তার পাঠশালার ভাল ছাত্রগুলিকে ভাঙিয়ে নেয় ওরা। ছ মাস চেষ্টা করে পাঠশালার সরকারী গ্র্যান্ট পেয়েছে মাসিক চার টাকা। কিন্তু সে গ্র্যান্ট রাখা দায় হয়ে উঠেছে। আজও তার একটি ছাত্রও বৃত্তি পায় নাই। গতবার কৈবর্তদের একটি ছেলের উপর খুব ভরসা ছিল। বৃত্তিও সে পেয়েছে। কিন্তু তার পাঠশালা থেকে তার ছাত্র হিসেবে নয়, ইস্কুলের পাঠশালার মাস্টারেরা তাকে ভাঙিয়ে নিয়েছিল। ওখান থেকেই সে বৃত্তি পেয়েছে।

ছেলেদের একজন অঙ্ক শেষ করে স্লেট এনে নামিয়ে দিলে, সব চেয়ে ভাল ছেলে এইটি এর উপরই তার এখন ভরসা আছে। আগামী বৎসর ছেলেটি নিশ্চয় বৃত্তি পাবে। একে ভাঙিয়ে নিতে পারবে না বড় ইস্কুল। ছেলেটি জ্যোতিষ সাহার ভাগ্নে। স্লেটখানি তুলে নিলে সীতারাম।

বা বা বা! রাইট। রাইট। এটাও রাইট। এটা—এটা কি করলি রে? কোথায় মাথা খেলি আমার, অ্যাঁ? হাঁ, এই যে ফাদার মণি আমার, বাবামণি, এটা কি করেছ মানিক, অ্যাঁ? পাঁচ-সাতে কত হয় বাবা, কত হয়?

পঁয়ত্রিশ শ্যায়। উচ্চারণের সময়, ওদের 'মশায়ে'র 'ম' উড়ে যায় বলে 'শ্যায়'।

পঁয়ত্রিশের কত নামবে? পাঁচ, না শূন্য?

পাঁচ। ওই তো পাঁচই লিখেছি শ্যায়।

এটা পাঁচ তো, যোগের সময় কি করেছ? নিজেই যে শূন্য ধরে নিয়েছ বাবা। বলি, বার বার বলি, মানিকচাঁদ, পাঁচ লেখাটা ঠিক করে ফেল। তা তুমি করবে না। এর ফল দেখ। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গো-মূত্র। সব বরবাদ। তবে প্রসেস রাইট। আচ্ছা যাও, তুমি টিফিনে বাড়ী যাবে তো চলে যাও। আর পাঁচ মিনিট আছে।

আর একজন এসে দাঁড়াল। বাবুদের ছেলে আকু, যে তার কথার বিকৃতি প্রচার করেছে সেই শ্রীমান। সীতারাম জানে, ওর কোন অঙ্কটাই ঠিক হয় নাই। তবু এসেছে, স্লেটখানা দিয়েই সে টিফিনের ছুটিটা পাঁচ মিনিট বাড়িয়ে নেবে। সে বক্রহাসি হাসলে, বললে, কি, অক্রূরের সব হয়ে গিয়েছে? বলিহারি, বলিহারি, দাও দেখি। নির্লজ্জ ছেলেটা স্লেট মুখে দিয়ে তবু হাসছে। সে হাত বাড়িয়ে টেনে নিলে স্লেটখানা।

অ্যাঁ! অ্যাঁ! আরে দেখি দেখি। শো মি ইওর টিথ। দাঁত দেখি, দেখি। স্লেট রেখে সীতারাম উঠে দুই হাতে তার ঠোঁট বিস্ফারিত করে দাঁতগুলিকে প্রকট করে ফেলেছে।

দেখ. তোমরা দেখ। দাঁত মাজে নাই। দেখ তোমরা।

ছেলেটা তবু হাসে। আশ্চর্য নির্লজ্জ ছেলে! ঠোঁট ছেড়ে সে তার কান ধরলে। তবুও সে হাসে। যাও, যাও, দাঁত মেজে এস, যাও।

ছেলেটা মুখে কাপড় দিয়ে বললে, এখনও আজ ভাত খাই নাই স্যার, একবারে দাঁত মেজে ভাত খেয়ে আসব।

বাবুদের ছেলেদের লেখাপড়ার ভাগ্যে যাই থাক্ চাল ঠিক আছে। ওরা 'শ্যায়' বলে না, 'স্যার' বলে। মারধোর করে লাভ নাই, মার খেয়ে ওদের পিঠে প্রায় কড়া পড়েছে। নিত্যানন্দের মত মার খেয়েও ওরা হাসে। সীতারাম ওকে অক্রূর বলে—আবার বলে, নির্যাতনে সিদ্ধ।

ঢং শব্দে একটা বাজল। টিফিনের ছুটি হল।

ঘড়িটার একটা দোষ হয়েছে এরই মধ্যে, বড় কাঁটাটা বারোটার ঘরে যাবার দু মিনিট পরে ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করে। ছেলেরা স্লেট এনে নামিয়ে দিলে। টিফিনের ছুটিতে বসে সীতারাম স্লেটগুলি দেখবে। ছেলেদের কতক যাবে খেতে, কতক করবে খেলা। ছোট ছেলেগুলো গুলি-মার্বেল খেলতে উঠানময় গর্ত করেছে। রোজই প্রতি দলে একটা ঝগড়া হয়, দল ভেঙে নতুন দল করে, নতুন গাব্ব্‌ করে। তা করুক, রাস্তায় ধুলো মাখার চেয়ে তাই করুক। ওদের জন্যই তো উঠান। উঠান কেন, সবই তো ওদের জন্য।

আবার ঘণ্টা পড়ল; টিফিন শেষ হল। ঘণ্টা একটা কিনেছে। আরও অনেক জি কিনেছে। দুখানা ম্যাপ, একটা গ্লোব, কলকাতায় কেনা একটা ভাল ব্ল্যাকবোর্ড; দুখানা চেয়া বাবুদের চেয়ার, সাহার চেয়ার ফেরত দিয়েছে। ঘণ্টা পড়তেই টিফিন শেষে ছেলেরা আবার বসে গেল। কিন্তু আকু? কই সে? দাঁত মেজে খেয়ে আসি—বলে গিয়ে এখনও পর্যন্ত অ ফিরল না। টিফিনের ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল। এই সব ছেলে নি কারবার করতে হলে, মারব না—এ সংকল্প করেও রাখা যায় না। মনে হল, এমন সংকল্প ক ঠিক নয়। মার বন্ধ করাতেই আকুটা আরও পাজী হয়ে উঠেছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের এক গল্প আছে। একটা বাঁদর তাঁর সভাতে রোজ সকালে এসে হাজির হত, রাজাকে একটি মো দিয়ে পায়ের কাছে বসত। রাজা তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে তার পিঠে সপসপ কয়েক ঘা বসি দিতেন। বাঁদরটা সুড়সুড় করে চলে যেত। একদিন মন্ত্রী সবিনয়ে প্রতিবাদ করলে, এ মহারাজার ন্যায় কাজ হয় না। বাঁদরটা মোহর উপহার দেয়. আর মহারাজ তাকে প্রহ করেন!

রাজা হেসে বললেন, ভাল। কাল থেকে মারব না।

পরের দিন বাঁদরটা এল, মোহর দিলে, কিন্তু রাজা তাকে নিত্যকার মত প্রহার করে না। বাঁদরটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দাঁত দেখিয়ে চলে গেল। পরের দিনও প্রহ করলেন না। সেদিন বাঁদরটা রাজার কাপড় ধরে টানল। তার পরের দিন প্রহারে অপেক্ষা করে হঠাৎ লাফ দিয়ে সিংহাসনের হাতলে উঠে বসল। তার পরদিন উঠে বস রাজার ঘাড়ে। রাজা সেদিন বাঁদরকে টেনে নামিয়ে, হিসেব করে সব দিনের পাও বেত্রাঘাত তার পিঠে ঝেড়ে দিলেন। বাঁদর আবার সেই পূর্বের মত সুড়সুড় করে চ গেল। আকুকে আজ তার পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিতে হবে। সীতারাম হরিসাধনে ডাকলে, সাধন!

সাধন, ছেলেদের মধ্যে বয়স্ক ছেলে, লেখাপড়ায় ভাল নয়, কিন্তু তবু ভাল ছেলে, নিষ্ঠা আছে কোন মন্দ বুদ্ধি নাই। সাধনকে দেখলেই তার নিজের কথা মনে পড়ে। নিজে সে ওই ধরনে ছেলে ছিল। সাধন এসে দাঁড়াল। সীতারাম বললে, তুই যা একবার আকুদের বাড়ি। গি ওকে ডাকবি, বলবি—মাস্টার মশাই ডাকছেন। যদি বাড়িতে না থাকে, তবে ওর মা কিং যার দেখা পাবি, বলবি—আকু টিফিনের আগে এসে আর পাঠশালায় যায় নাই। ও প্রায়ই এ রকম করে। মাইনে দেয় নাই আজ দু মাস। মাইনে দিয়ে কাল পাঠিয়ে দেবেন, না হলে আ পাঠশালায় পাঠাবেন না। বুঝলি তো?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, কি বলবি, কই বল্ দেখি!

সাধন পাখির মত বলে গেল। সীতারাম খুশী হয়ে বললে, ঠিক। যা তো তুই

সাধন যেতে গিয়ে পাঠশালার দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে গেল। বললে—সে আসছে স্যায়।

আসছে? আচ্ছা। নেপলা, ছড়ি কেটে আন্।

নেপাল ছড়ি কাটতে ওস্তাদ। নিজে মার খায় কাঁদে না; পরে মার খেলে খুব খুশী হয়, হাসে। ছড়ি কাটতে তার অদম্য উৎসাহ।

আজ অনেক দিন পরে মার হবে; শুধিয়ে নিলে, কঞ্চি না ডাল স্যায়?

তার আগেই আকু মলিন মুখে নিজেই এসে তার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বিষন্ন কণ্ঠে বললে, কলকাতায় ধীরানন্দবাবুকে পুলিসে বন্দী করেছে স্যার, চিঠি এসেছে ওদের বাড়িতে। স্যামু-দেবু দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছে।

ধীরাবাবুকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে?

না স্যার। গ্রেপ্তার করে নাই, বন্দী করেছে—রাজবন্দী।

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সীতারামের সর্বাঙ্গ। রাজ-ব-ন্দী!

হ্যাঁ স্যার, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন কিনা!

উনিশ শো একুশ সাল। অসহযোগ আন্দোলন চলেছে দেশে। সীতারামের সাপ্তাহিক পত্রিকা আসে, সারাটা বুক জুড়ে থাকে ওই খবর, ওই দেশবরেণ্য নেতাদের ছবি। ধীরাবাবুর ঘরে সে একখানা বই পেয়েছে, বইখানার নাম—'লাঞ্ছিতের সম্মান'। উনিশশো পাঁচ সালের আন্দোলনে যাঁরা নির্যাতিত হয়েছিলেন, তাঁদের কাহিনী এবং তাঁদের সকলের ছবি আছে তার মধ্যে। 'লাঞ্ছিতের সম্মান' বড় ভাল নাম। লাঞ্ছনা সম্মান হয় তাঁদেরই সাধনায়, কপালের গুণেই পঙ্কতিলক চন্দনতিলকের চেয়েও সহনীয় হয়। ধীরাবাবু উপযুক্ত মানুষ। এবার ধীরাবাবুর ছবি কাগজে উঠবে, এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে তাঁর জীবনী, তাঁর ছবি।

বয়স্কের মত, বিজ্ঞের মত আকু বললে, ধীরাবাবুর মা স্যার, বসে আছেন, মুখে একটি কথা নাই, চোখ থেকে শুধু টপটপ করে জল পড়ছে।

সীতারাম উঠে দাঁড়াল। বললে, ছুটি, তোমাদের ছুটি।

নিজেই ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে।

পাঠশালা বন্ধ করে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে দ্রুতপদে সে বাবুদের বাড়ির দিকে চলল। তার বুকের ভিতরটা উথলে উথলে উঠছে।

মায়ের মূর্তি দেখে কিন্তু সে স্তব্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে না, এ তাঁর সুখের কান্না অথবা এ তাঁর দুঃখের কান্না! নিজের মনেও তার যেন এমনই দ্বন্দ্ব চলছে।

অপরাহ্ণে ঝরনার ধারে গিয়ে সে উদাস মনে বসে রইল। এখানটায় ছোট ছোট বনফুলের ঝোপ আছে, সেখানে তিতির পাখির বাসা। তিতিরেরা সন্ধ্যার মুখে বেরিয়ে ছুটে বেড়ায়, কলরব করে, পোকা ধরে খায়, উইঢিপিতে হানা দেয়। অল্পদূরে রক্তহাটার এক

বাবুদের একটা বাগান আছে, বাগানের চারিধারে তালগাছের সারি। সন্ধ্যায় তালগাছের মাথায় সূর্যের রাঙা আলো পড়ে, ঘুঘু ডাকে ; এর মধ্যে সে বেশ থাকে, যেন ধ্যানস্থ হয়ে থাকে। আজ সে সব কিছুর দিকেই আর দৃষ্টি পড়ল না। বারেকের জন্যও যাকে বলে, তাও না। কিছু যে ভাবলে, তাও না। শুধু তার চোখের সামনে যেন অহরহ ভেসে বেড়াল ধীরাবাবুর কত ছবি।

সন্ধ্যায় শ্যামু-দেবুকে নিয়ে বসল সে।

শ্যামু বিষণ্নতার মধ্যেও গম্ভীর হয়ে রয়েছে। দেবু তার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। তার মুখে যে হাসি দিগন্তের মেঘের কোলের বিদ্যুৎচমকের মত ক্ষণে ক্ষণে নিঃশব্দ-কৌতুকে শুধু দীপ্তিতে খেলে যায়, সে হাসি তার মুখে আজ একবারও ক্ষীণ আভাসে কোন কৌতুকে দেখা দিল না। সে মুখ যেন আজ বর্ষণমুখর শ্রাবণ-রাত্রির মেঘে ঢেকে গিয়েছে। অবিরাম বর্ষণ চলেছে, আজ বিদ্যুৎ নাই। শুধু অন্ধকার।

সে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললে, জান, দাদা কত বড় কাজ করেছেন ?

শ্যামু ঘাড় নেড়ে বললে, জানি।

দেবু, তুমি জান ?

দেবু উত্তর দিলে না। সে কাঁদছে।

কেঁদো না। ছিঃ! মাথায় তার হাত বুলিয়ে দিলে সে। আবার বললে, বড় হয়ে তোমাদেরও দাদার সঙ্গে দেশের কাজ করতে হবে যে। জান তো ?—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।"

বাইরে থেকে নায়েববাবু বললে, মাস্টার, থাক্। ওদের আর এই সব শিক্ষা দিও না তুমি এখন থেকে।

কানাই রায় সায় দিল, হ্যাঁ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, এতেই তোমার ঠেলা সামলানো দায় হবে। পরে বুঝবে।

উপপদ-তৎপুরুষ নামটি মিথ্যা হয় নাই তার। মধ্যপদলোপীকে তবু সে সহ্য করতে পারে।

রাত্রে মনোরমা সমস্ত শুনলে, সেও উদাস হয়ে গেল। সীতারামের মনের স্পর্শকে সে অদ্ভুত ভাবে গ্রহণ করতে পারে পৃথিবীর রৌদ্রস্পর্শ গ্রহণের মত। তার উদাসীনতা দেখে সীতারাম বললে, কথাটা ঠিক দুঃখের নয় মনু। আমরা ছোট মানুষ, আমরা বুঝতে পারি না।

মনোরমা বললে, আহা, কত বড় ঘরের ছেলে, কত সুখের দেহ, জেলের কষ্ট আর

মান-সম্মান—

সীতারাম তাকে বোঝাতে বসল, এ দেশসেবার জন্য কারাবরণ, এ হল পরম গৌরবের কথা। হোক সুখের দেহ, কিন্তু মনের দৃঢ়তায় অসম্ভব সম্ভব হয়, বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেওয়া যায়।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মনোরমা স্বামীর দিকে চেয়ে রইল।

সীতারাম বললে, আমরা আর কি করব? কতটুকু ক্ষমতা? যতটুকু ততটুকু তো করতে হবে। চরকা কিনে আনব। পুরনো আমলের চরকাটা সব ভেঙেই গিয়েছে। চরকা কাটব। নিজের সুতোয় আমাদের কাপড় হবে। বুঝলে? আর রামকাপাসের বীজ আনব, চারিদিকে লাগিয়ে দোব।

অকস্মাৎ মনোরমা বললে, তোমার ধীরাবাবু কেমন বটে, তা একবার দেখলাম না।

সীতারাম বললে, অবিকল শ্যামুর মত। উঠে গিয়ে সে দাঁড়াল শেল্‌ফের ধারে। 'লাঞ্ছিতের সম্মান' বইখানি উপরেই ছিল। সেইখানি খুললে অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ একটা কথা তার মনে হল। সে বইখানা মনোরমাকে দিয়ে বললে, বইখানার ছবিগুলোকে রোজ দেখো, প্রণাম করো।

এইবার মনোরমা মা হবে। তারও ঘর এবার শিশুর হাসিতে আলো হবে। শিশুর হাসি স্বর্গীয় বস্তু। শিশুরা দেবদূত। অনেক বইয়ে সে পড়েছে। আর তা যে সত্য, সে বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু বড় হতে আরম্ভ করলেই যত গোলমাল। শয়তান এসে ঘাড়ে চাপে। ছেলেদের সে দু ভাগে ভাগ করে। এক হল—কুকুরের জাত, ছেলেবেলায় ভারি সুন্দর, যত বড় হবে তত খেঁকী হবে, অবশেষে হবে নেড়ী কুত্তা! আর এক—ময়ূরের জাত, যত বাড়বে তত বিচিত্র বর্ণের পালকে ভরে উঠবে, প্রতিটি পালকে ধরা পড়বে আকাশের চাঁদ। এ জাত বড় দুর্লভ। মনে পড়ে ধীরানন্দকে। শ্যামু-দেবু কেমন হবে কে জানে! তবে নেহাত খারাপ হবে না। কথায় আছে, "আগের লাঙল যেখানে যায় পিছনের লাঙলও সেথায় ধায়"—ওরা ধীরাবাবুর মত না হোক, ওর কাছাকাছি তো যাবে।

তার নিজের ছেলের সম্বন্ধেও অনেক গোপন আশা সে পোষণ করে। সেইজন্যই সে ঐ বইখানা মনোরমাকে দিয়ে ছবিগুলিকে প্রণাম করতে বললে। সে শুনেছে, এতে ভাল ফল। মহাত্মাদের প্রভাব গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। বড় অন্যায় হচ্ছে, ধীরাবাবুর বইখানি আজও ফেরত দেওয়া হল না।

সাত

দিন কয়েক পর সীতারামের জাঠতুতো ভাই সীতারামকে খুঁজে গেল। তিন-তিনবার।

সীতারামের জাঠতুতো ভাই পণ্ডিতদাদা মানুষটি বড় ভাল। শান্ত নিরীহ মানুষ, গ্রামেই পাঠশালা করে, গ্রামের দলিল-পত্র লেখে, এ ছাড়া জপতপ করে। পণ্ডিতদাদা পাঠশালাটি নিয়েই আছে। গ্রামের বাদবিসংবাদ সেখানেই হোক, মীমাংসা করবার জন্য নিজেই গিয়ে দু পক্ষকে অনুরোধ করে। জমিদারের খাজনা আদায়ের গোমস্তার আসরেও নিজে থেকেই যায়; লোকের বাকি-বকেয়ার হিসাব দেখে দেয়, লোকজনকে খাজনা বাকির জন্য তিরস্কার করে, সুদ মাপের জন্য গোমস্তাকেও অনুরোধ করে।

সেদিন সন্ধ্যার পর তিনবার সে এসে সীতারামের খোঁজ করলে। সীতারাম তখনও রত্নহাটা থেকে ফেরে নাই। রান্নাবান্না শেষ করে মনোরমা দাওয়ার উপর বসে চরকার জন্য তুলো পাঁজ করছিল। কৃষাণ-বউ একটু দূরে বসে কাজের অভাবে নিজের পায়েই হাত বুলাচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে বলছিল, কি যে বাপু তোমাদের বাতিক; বলে, উঠল বাই তো মক্কা যাই। দিনরাত চরকা, না ফরকা! তার চেয়ে পায়ে খানিক ত্যাল-ট্যাল দাও। মশা-টশা কামড়াবে না, সরদি-টরদি লাগবে না।

যতক্ষণ সীতারাম না ফেরে কৃষাণ-বউ বাড়িতে থাকে। বসে বসে সে আপন মনেই বকছিল, মনোরমার কিন্তু কানে গেল না, সে একটু চিন্তিত হয়েছে। পণ্ডিত-ভাসুর তিন-তিনবার এল কেন? সহজে তো পণ্ডিত-ভাসুর আসে না!

কৃষাণ-বউ বললে, হবেন আর কি গো। খাজনা-মাজনা বাকি-টাকি পড়েছে হয়তো, গুঁপো গোমস্তা হয়তো কিছু-মিচু বলেছে। অমুনি ছুটে-মুটে আইচেন আর কি পণ্ডিত-খণ্ডিত।

মনোরমা লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু এবারও তো সীতারাম খাজনা দিয়ে রসিদ এনে তাকে রাখতে দিয়েছে। তার তো বেশ মনে পড়ছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে বাক্সে রেখে দিয়েছে। খাজনা নিয়ে নিশ্চয় কিছু নয়। তবে কি?

কৃষাণ-বউ তারও মীমাংসা করে দিলে, তবে হয়তো গেরামের পেঁচালী-মেচালীরা (প্যাঁচালো লোকেরা) ঘোঁট-মোট কিছু পাকাচ্ছে-টাকাচ্ছে আর কি।

এটা সম্ভব হতে পারে। সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই তাই। তার স্বামীকে কেউ বড় ভাল চোখে দেখে না। সকলেই বলে, ফেল্ করে করে কাঁধে ঘাটা পড়ে গেল, সে-ই হল শেষে পণ্ডিত! অনেকে বলে, আমি খুব ভাল লোকের কাছে শুনেছি, বাবুদের বাড়িতে ওকে মাইনে-টাইনে কিছু দেয় না। শুধু পেটভাতা। অনেকে অকারণে শাপ-শাপান্তও করে, বলে, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে—পড়বে, শিগগিরি পড়বে, দেখ না কেনে।

কৃষাণ-বউ দাওয়ার এক পাশে বসে ছিল, টিপ করে শুয়ে পড়ে বললে, শোও খানিক। ওসবের তরে ভেবো-টেবো না। উসব কক্কা-মক্কা হয়ে যাবে। কি করবে? আট আনার জমিদার বাড়িতে মাস্টেরি-ফাস্টেরি করছে তো হাজার হলেও। শাও, শোও। মালিশ-টালিশ কর খানিক। হ্যাঁ।

না। তুই শুয়ে থাক্। আমি আসি। এলাম বলে।

শিগগিরি এস বাপু। ঘুমিয়ে-টুমিয়ে যাই তো বিড়েল-মিড়েল এসে হেঁসেল-টেসেল খেয়ে দেবে। দুধ-টুদ সামিলে রেখে ঢেকে যাও বাপু।

বাইরের দরজার মুখে এসে মনোরমা আবার থমকে দাঁড়াল। সে যাচ্ছিল ওই জ্যাঠাদের বাড়ি। কারু মারফত পণ্ডিত-ভাসুরকে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা কি জানবে। কিন্তু মনে পড়ল, সে গিয়ে দাঁড়াবামাত্রই তো ও-বাড়ির ননদ বাঁকা হেসে বলবে, মাস্টারনী এস।

সেই ইস্টিশানে সীতারাম শ্যামু-দেবুকে বলেছিল, 'মাস্টারের বউ—মাস্টারনী।' সেই কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছে গ্রামময়। প্রচার করে দিয়েছে হয় কৃষাণ-বউ, নয় ওদের সেই ছেলেটা। ওরাই শুনেছিল কথাটা। তা ছাড়া মনোরমাকেও তারা কেউ ভাল চোখে দেখে না। বলে, অহঙ্কারী। কি যে অহঙ্কার সে করে, সে কথা মনোরমা বুঝতে পারে না।

দরজায় দাঁড়িয়ে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। তারই ফলে বোধ করি ঘরের কথাটা মনে হল; কৃষাণ-বউটির আবার চুরি করা অভ্যাস আছে। কাঠকুটো, খড়, বাঁখারি তো নেয়ই নিয়মিত, তার উপর ছোটখাটো টুকিটাকি জিনিস পেলেও আঁচলে পুরে নিয়ে থাকে। ধরা পড়লেও লজ্জিত হয় না, লজ্জাবোধ করা দূরে থাক্, একেবারে ঝঙ্কার তুলে বলে, আ, —ই বাড়ির লোব না টোব না, তো রামা-শ্যামা-যদো-মধোর বাড়িতে লোবটোব নাকি? ইয়েছে চোখ-টোক দিয়ো না বাপু, হ্যা। বলে, তিনপুরুষ খাটছি-মাটছি।

এ ছাড়াও, সে সন্তানসম্ভবা, প্রায় আসন্নপ্রসবা। শরীরটাও ভাল নাই। রাত্রে বাড়ি থেকে বাইরে বার হওয়াও ঠিক হবে না। এখন তো তবু বাড়ির ভিতর উঠানে নামে মেয়েরা, আগে নাকি রাত্রে বাড়ির ভিতরেও অনাচ্ছাদিত স্থানে বার হত না কেউ। সে ফিরল। কিষাণ বউয়ের নাক ডাকছে এরই মধ্যে। চিন্তার মধ্যেও তার হাসি এল। নাক ডাকার শব্দ দেখ না! ফর্—ফর্। আবার ফর্‌র্‌ফোৎ করে উঠছে এক-একসময়। সে তুলো নিয়ে বসল। কিন্তু সেও তার ভাল লাগল না।

প্যাঁচাটা ডাকছে দেখ! কালপ্যাঁচা বোধ হয়। কটা বাজল? উপরে ঘড়িটা দেখবার জন্য সে উঠল। সীতারাম বাড়ির জন্য একটা টাইম-পিস কিনেছে। মনোরমাকে ঘড়ি দেখতে শিখিয়েছে অনেকবার। মনোরমার বুদ্ধিটা মোটা, সে মনোরমা নিজেই বুঝতে পারে।

সীতারাম বলে, লোকের মাথায় গরুর গোবর পোরা থাকে, তোমার মাথায় গাধার

গোবর পোরা আছে।

গাধার নাকি আবার গোবর হয়! মনে পড়লেই মনোরমার হাসি পায়। পণ্ডিত লোকে কত উদ্ভট কথাই যে বার করতে পারে!

উপরে আর যেতে হল না তাকে। সীতারামের গলা শোনা গেল। পণ্ডিত-ভাসুরের সঙ্গেই কথা বলছে, আমাকে তিনবার খুঁজেছ সন্ধ্যে থেকে? তা আমি তো এই আসছি। কিন্তু খুঁজেছিলে কেন বল দেখি?

স্বভাবসিদ্ধ শান্তকণ্ঠে পণ্ডিত-ভাসুর বললে, চল্, তোর বাড়িতেই চল্।

বাড়িতে এসে ভাসুর বললে, ওপরে চল্।

ওপরে? কেন গো? কি এমন ব্যাপার বল দেখি? সীতারামও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

চল্, বলছি। নীচে আবার কৃষাণ-বউটা আছে।

উপরে গিয়ে বসল দুজনে। মনোরমা সিঁড়িতে না দাঁড়িয়ে পারলে না। বুকের ভিতরটা তার ঢিপঢিপ করছে।

পণ্ডিতদাদা বললে, ধীরাবাবুর জেলের খবর যেদিন আসে, সেদিন কি তুই পাঠশালার ছুটি দিয়েছিলি?

সীতারাম চমকে উঠল, কথাটা ওভাবে সে কোনদিন তো ভেবে দেখে নাই। সে বললে হ্যাঁ। খবরটা শুনলাম। শুনলাম, চিঠি এসেছে বাবুদের বাড়িতে, মা কাঁদছেন, শ্যামু-দে কাঁদছে। ওঁদের বাড়িতে পড়াই, ওঁরা জমিদার, সে সম্বন্ধও একটা আছে। আমি থাকতে পারলাম না, ছুটে গেলাম। যাবার সময় ছুটি দিয়ে গেলাম।

পণ্ডিতদাদা বললে, ছুটিটা না দিলেই পারতিস। তুই না থাকলে ছেলেরা সব আপনিই পালাত।

সেই তো সেই একই কথা। সীতারাম হাসলে।

না। এক কথা নয়। ওখানকার লোকে সাব-ইন্সপেক্টারের কাছে দরখাস্ত করেছে।

দরখাস্ত করেছে? বুকটা ধড়াস করে উঠল তার।

হ্যাঁ। আমি আজ গিয়েছিলাম একটা কৈফিয়ত দাখিল করতে। তা উনি আমাকে গোপনে কথাটা বললেন। রত্নহাটার কেউ দরখাস্ত করেছে, পাঠশালায় অসহযোগ প্রচার করিস তুই। ধীরাবাবুর জেলের খবর এলে পাঠশালা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করেছিল তাকে সম্মান দেখাতে। বাড়িতেও চরকা কাটে। চরকা কাটিস নাকি?

কাটি। সীতারাম এতক্ষণে নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল।

তাই তো। পণ্ডিতদাদার মাথায় মাথাজোড়া টাক, টাকে হাত বুলানো তার একটা মুদ্রাদোষ—বিশেষ করে সমস্যাসঙ্কুল সময়ে। পণ্ডিতদাদা মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

সীতারাম বললে, করলে ওই শিবকিঙ্করেরা করেছে। তা করুক। আবার একটু পরে বললে, অন্যায় তো কিছু করি নাই। যা হয় হবে।

শিবকিঙ্কর বা তার দলটিই শুধু নয়। আশ্চর্য হয়ে গেল সীতারাম, প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকেই যেন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং এই দরখাস্তে অনেকেরই প্রেরণা আছে। তার প্রমাণ সে পরের দিন সকালেই পেয়ে গেল।

রত্নহাটায় ঢুকতেই মণিলালবাবুর সঙ্গে দেখা হল। মণিলালবাবু গোঁফে তা দিচ্ছিলেন অভ্যাসমত। একটু হেঁট হয়ে ছোট একটি নমস্কার করে সীতারাম চলে আসছিল। মণিবাবু বললেন, হ্যাঁ হে, তুমি নাকি তোমাদের জমিদারবাবুর জেল যাওয়ার অনারে পাঠশালা বন্ধ দিয়েছ শুনলাম?

সীতারাম একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে বেশ শক্ত করে নিলে, মাথার ভিতরে প্রথমেই যেন দপ করে আগুনের শিখার মত রাগ জ্বলে উঠেছিল, নিজেকে সামলে নিয়ে সবিনয়ে ঈষৎ হেসে বললে, আজ্ঞে, তা দিয়েছি। তবে আমাদের জমিদারবাবু বলে নয়, যিনিই এমন গৌরবের কাজ করবেন, তাঁর জন্যেই দোব। আপনার ছেলেও তো আমাদের ধীরাবাবুর বয়সী. তিনি গেলে তাঁর অনারেও দোব।

মণিবাবু এমন উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই। সীতারাম কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে চলে এল মণিবাবুকে অতিক্রম করে।

রত্নহাটার এই সব বাবুদের দেখে আর তার মনে পূর্বেকার মত সে বিস্ময় জাগে না। সে বিস্ময় আর ভয়ে কোন প্রভেদ নাই। সে ভেবে দেখেছে, ভক্তি আর ভয়ে মিশে এমনটা হয়। জমিদার, বাবুলোক, দালানবাড়ি, ধন-ঐশ্বর্য—এই ধারণাটা চাষী প্রজার ছেলে সে, তাকে ভক্তিমান করে তুলত। পাঠশালায় সে দেখেছে, অবস্থা-ভাল ঘরের ছেলেরা, যারা ভাল জামা-কাপড় পরে আসে, নতুন রকমের পেন্সিল, ঝকঝকে নতুন বই, রঙ-চঙে মার্বেল যাদের থাকে, লাল নীল লেবেঞ্চুস পকেটে নিয়ে যারা পাঠশালায় আসে, তাদের প্রীতিভাজন হবার জন্য এমন কি তাদের ঘেঁষে দাঁড়াবার জন্যও অন্য ছেলেরা লালায়িত হয়ে ওঠে। নেহাত গরীব যারা, তারা কাছে এসেও একটু তফাত বজায় রেখে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখে। ঐশ্বর্যবান ছেলেটির কোন জিনিস পড়ে গেলে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেটি তুলে তার হাতে দিয়ে কৃতার্থ হয়ে যায়। বাবুদের প্রতি ভক্তিও ঠিক এই জিনিস, এতটুকু প্রভেদ নাই।

আর ভয়? কিসের ভয়? ভয়ও আর তার হয় না। একটা জিনিস সে বুঝেছে। এরা হুঙ্কার করে উঠবেই, ওটা তাদের স্বভাব দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হুঙ্কারের পিছনে আছে দু-চারটে চাপরাসী। সাহস করে হুঙ্কারকে অগ্রাহ্য করে দাঁড়াতে পারলে ওরা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আর ভয়ই বা করবে কেন? ওরাও মানুষ, আর সবাইও মানুষ।

হঠাৎ পিছন থেকে ডাকলেন মণিবাবু, শোন, শোন, ওহে ছোকরা।

সঙ্গে সঙ্গে বাবুর চাপরাসী সাদৎ শেখ ছুটতে ছুটতে এসে, তার সামনে এসে দাঁড়াল, তুমাকে ডাকছেন বাবু।

সীতারাম স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আমার এখন সময় নাই। বাবুকে বলগে।

সময় নাই! বিস্মিত হয়ে গেল সাদৎ।

না। সেই স্থির দৃষ্টিতেই সে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

সাদৎ বললে, চল ভাই একবার! কেন আমাকে হাঙ্গামা-হুজ্জৎ করাবে?

হাতের লণ্ঠন ছাতা লাঠি কাঁধের জামা এ সবগুলি পথের উপরেই রাখলে সীতারাম। সাদৎ বললে, হাতে করে নিয়েই চল পণ্ডিত। উ গুলান আর কী ভারী হবে?

সীতারাম উত্তরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, হাতাহাতি হাঙ্গামা করবে? না লাঠি নেবে? বল, তা হলে লাঠিখানা তুলে নিই।

চাষীর ছেলে, বাল্যকাল থেকেই পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাদের মানুষ হতে হয়, তার উপর জন্ম থেকেই তার দেহের গঠন বলিষ্ঠ। কিন্তু এমনভাবে জীবনে সে কোনদিন দাঁড়ায় নাই। কালে-কস্মিনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু তাতে এতে অনেক প্রভেদ। আজ তার মনে হল, খুন হতেও সে রাজী আছে। এ উদ্ধত অপমান সে সহ্য করবে না।

বলিষ্ঠ দেহে তার এইভাবে দাঁড়ানো বেমানান হয় নাই, সাদৎও সকচিত হয়ে উঠল। ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে হয়তো হাঙ্গামা সঙ্গে সঙ্গেই বেধে যেত। সাদৎও বলশালী ব্যক্তি, কিন্তু সাদতের দিক থেকে এটা মনিবের কাজ; হুকুমমত করতে হবে, বিশেষ করে মনিব ওই তো দাঁড়িয়ে আছেন। সে হেঁকে বললে, পণ্ডিত বলছে, সময় নাই তার এখুন।

মণিবাবুর কাছারি অল্প দূরেই, তিনি নিজের চোখেই সব দেখছিলেন, তিনি বললেন, থাক্। তুমি চলে এস।

সাদৎ বললে, তুমার সঙ্গে মারামারি করতে আমি আসি নাই পণ্ডিতভাই। তুমি রাগ করিও না আমার উপর। কি করব বল? গরীবগুনা মুরুখ্য লোক, এই করেই খেটে খাই। সে চলে গেল।

সীতারাম একটু লজ্জিত হল। সত্যই, সাদতের উপরে এতটা রাগ করা তার উচিত হয় নাই। সাদতের দোষ কি? কিন্তু এই মণিলালবাবু? এরা কি? ছাতা লাঠি লণ্ঠন জামা তুলে নিয়ে সে বাবুদের বাড়িতে ঢুকল।

পাঠশালার দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল জ্যোতিষ সাহা। সাহা বললে, পণ্ডিত, সেদিনের কাজটা ভাল হয় নাই।

সাহার বক্তব্যের মর্ম মুহূর্তেই সীতারাম বুঝতে পারলে। তবু সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ধীরাবাবুর জেলের খবর শুনে পাঠশালায় ছুটি দেওয়াটা ভাল হয় নাই।

সীতারাম মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে ভাবতে লাগল।

ইস্কুল সাব-ইনেসপেক্টারবাবু একবার ডেকেছেন তোমাকে। তুমি যাও একবার।

সীতারাম বললে, যদি ইস্কুলের এড বন্ধ করে দেয় সাহা মশায়, তা হলে আপনারা—আপনারাও কি পাঠশালা—

বাধা দিয়ে সাহা বললে, আগে থেকে এতটা ভাবছ কেন পণ্ডিত? একটা কৈফিয়ত দিলেই চুকে যাবে। সে আমাকে সাব-ইনেসপেক্টারবাবু বলেছেন। তা ছাড়া রজনীবাবু ইনেসপেক্টার লোক ভাল, ধার্মিক মানুষ, মহাশয় লোক। যাও, তুমি একবার ঘুরেই এস।

ইস্কুল সাব-ইন্সপেক্টার রজনীবাবু সত্যই ভাল লোক। একটু বেশী মাত্রায় ভাল লোক। রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, কোনক্রমেই মিথ্যা কথা বলেন না, কোন পণ্ডিতের কাছে এক টুকরাও জিনিস গ্রহণ করেন না। শুধু দুটি বাতিক আছে। ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, অসুখ-বিসুখ হলে তাঁর ওষুধ খেলে তিনি খুশী হন এবং রামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিরোধান উৎসব করলে রজনীবাবু তাঁকে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ না করে পারেন না।

সীতারামের দুর্ভাগ্য, সীতারামের শরীর খুব ভাল, সে কখনও রজনীবাবুর ওষুধ খায় না। এবং রত্নহাটা গ্রামখানি রত্নহাটই বটে, এখানে মণিলাল ও শিবকিঙ্করের মত রত্নের দল এত প্রবল যে, রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব এখানে হওয়া আজ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। একবার হয়েছিল আয়োজন, ধীরানন্দের সমবয়সী এবং তারই কয়েকজন বন্ধু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শিবকিঙ্করের দল সে পণ্ড করে দিয়েছিল। তারা পরামর্শ করেছিল, উৎসব হলে একটা পাঁঠা নিয়ে গিয়ে তারা সেই উৎসবক্ষেত্রে বলিদান দিয়ে দেবে।

মণিলালবাবুর চাল কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের। জমিদারী কূটচাল। তিনি রজনীবাবুকে বলে পাঠিয়েছিলেন, সম্প্রতি তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে যে, রজনীবাবু আজকাল কয়েকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে অবলম্বন করে গ্রামের অভ্যন্তরে যাতায়াত করছেন। তিনি অর্থাৎ মণিলালবাবু বিশ্বাস করেন যে, রজনীবাবু সৎ এবং ভদ্র ব্যক্তি, কোন কুঅভিপ্রায় তাঁর নাই বা থাকতে পারে না; কিন্তু যেহেতু তাঁর আসা-যাওয়ার জন্য গ্রামের কন্যা এবং বধূদের অসুবিধা হয়, সেহেতু তিনি সবিনয় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। দলিলের মুসাবিদার মত পাকা এবং প্যাঁচালো এই উক্তি শুনে রজনীবাবুর হাত-পায়ের আঙুলের ডগাগুলি সত্যই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন সমস্ত আয়োজন। পর-বৎসর হতে তিনি বড় ইস্কুলের বোর্ডিঙে, সেখানকার ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিয়ে এইসব পুণ্য দিনগুলি প্রতিপালন করে থাকেন। সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেলা, বোর্ডিঙের ছাত্রদের নিয়ে আধ ঘণ্টা রিলিজিয়াস ক্লাস বসে; গান হয়।—

"মা আমারে দয়া করে
শিশুর মতন করে রেখো।
শরীর বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই,
মনটি শিশু করে রেখো।"

কিন্তু সীতারাম এর কোনটিতেই আজও যোগ দেয় নাই। তার কারণ সীতারামে ভক্তির অভাব বা অবিশ্বাস নয়। তার কারণ ওই বড় ইস্কুলের কোন আয়োজনে সে কোনমতেই যেতে চায় না, যেতে পারে না। বড় ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের প্রথম দিনে সেই স্নেহহীন এবং সহানুভূতিহীন কথাগুলি অহরহ মেনে পড়ে। হেডমাস্টার শ্লেষের সুরে বলেছিলেন, সাহা কৈবর্ত এদের নিয়েই পাঠশালা কর তুমি তা হলে। পুণ্যও হবে—অন্ধকা থেকে ওদের আলোকে আনা হবে। তাই সে করছে। তবু তার একটা নিগূঢ় অভিমান আছে। তা ছাড়া, ইস্কুলের কোন উৎসবেই তারা তাকে নিমন্ত্রণও করে না। অন্য মাস্টারেরাও তাকে ঘৃণা করে। এমন কি শিবকিঙ্করের আবিষ্কৃত 'আঁচলে করে মুড়ি খাচ্ছিস ক্যা—নো, আঁচল যে অঁটো হবে'—এই কথাটা নিয়েও তারা রহস্যালাপ করে থাকে। সীতারাম অবশ্য ইচ্ছা করলেই এই ব্যঙ্গের উত্তরে ব্যঙ্গ করতে পারে। ওই ইস্কুলের মাস্টারদে অনেক খারাপ উচ্চারণ আছে; কেউ 'এবং' আর 'কেবল'কে বলেন, 'অ্যাবং' ও 'ক্যাবল'। কেউ 'অ্যামোন'কে বলে 'এমোন'। কেউ কর্তব্যকে বলে—কোর্তব্য। এসব নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারে, কিন্তু সে তা করে না। তবে ওদের সংসর্গ্ সে এড়িয়ে চলে। তাই রজনীবাবুকে খুশী করার সুযোগকে উপেক্ষা করেও বড় ইস্কুলের ধর্মসভায় সে যোগ দিতে যায় না।

ওখানে যাবার কথা হলেই একটা গল্প মনে পড়ে তার। নদীতে ভেসে যাচ্ছিল একটা স্বর্ণকুম্ভ আর একটা মৃৎকুম্ভ। স্বর্ণকুম্ভ মৃৎকুম্ভকে ডেকে বলেছিল, আমরা দুজনেই যখন কুম্ভ তখন এস, একসঙ্গেই যাই। কাছে এস তুমি। মৃৎকুম্ভ নমস্কার করে বলেছিল, হে মূল্যবান স্বর্ণকুম্ভ, তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার বহুমূল্য উদারতার ঝঙ্কার আমার সহ্য করবার শক্তি নাই। আমার দূরে থাকাই ভাল। তাই সে দূরেই থাকে। রজনীবাবু এর জন্য কিছু মনে করেন কিনা, সে জানে না। তবে ভরসা এই যে, রজনীবাবু অন্যায় করবার লোক নন। অন্যায় তিনি করবেন না—সে কথা সীতারাম বিশ্বাস করে। তবু চিন্তিত হয়েই সে আজ সবিনয়ে নমস্কার করে সামনে দাঁড়াল। রজনীবাবু বললেন, একটু বসো। বসতে হবে। এঁদের কাজ সেরে নিই।

ইস্কুল-সাব-ইন্সপেক্টারের দরবার। এই সার্কেলের পাঠশালার পণ্ডিতদের দুজন চারজন প্রতিদিনই আসে। বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ, চোখে-মুখে শীর্ণতা, বিনীত দৃষ্টি; সাব-ইন্সপেক্টারের দাওয়ায় খাতাপত্র নিয়ে বসে থাকে। রত্নহারটার বাবুরা চলে যান সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ঝলমলে পোশাক পরে; তারা বাক্যহীন হয়ে চেয়ে দেখে। কচিৎ এক-আধ

জন সেকেলে বুড়ো পণ্ডিত এখানকার বাবুদের কোন ছেলেকে একলা পেলে ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করে; তারপর অকস্মাৎ কঠিন বানান, জটিল মানসাঙ্ক ধরতে শুরু করে, বাবুদের ছেলে নিরুত্তর হলে খুশী হয়; মুখে তৃপ্তির হাসি দেখা দেয়। কিন্তু দু-একজন ছেলে এখনও আছে, যারা এখানকার ভাবী শিবকিঙ্কর, তারা প্রথমেই ধমক মেরে দেয়, শাট-আপ। পড়া ধরবার তুমি কে? ইংরিজীতে বলে—হু আর ইউ?

একের পর একজনকে ডাকেন রজনীবাবু, মহেশপুর পাঠশালার পণ্ডিত মশাই। ভিতরে আসুন!

আজ্ঞে, যাই বাবু। বৃদ্ধ পণ্ডিত হাতজোড় করে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাসিক চার টাকা সাহায্য পায় পণ্ডিত। 'মহামহিম মহিমার্ণব রত্নহাটা সার্কেলের সাব-ইন্সপেক্টার মহোদয় সমীপে অধীনের একান্ত বিনীত প্রার্থনা এই, চারি টাকা পরিমাণ সাহায্য বৃদ্ধি করিয়া মাসিক পাঁচ টাকা করিতে আজ্ঞা হয়।' বৃদ্ধ পণ্ডিত বললে, বাবু মশায়, আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর পাঠশালা করছি, প্রথম ছিল দু টাকা সাহায্য। কিন্তু আজও পাঁচ টাকা হল না। হুজুর বিবেচক, অধীন কি বলবে? আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরের পরীক্ষার ফল দেখুন।

রজনীবাবু বললেন, আপনার তো আরও বাড়তি উপায় রয়েছে পণ্ডিত মশায়। গোমস্তার কাগজ সেরে দেন, দোকানের খাতা লেখেন। একটা টাকা এড বাড়লে আর কি এমন বেশী পাবেন?

পণ্ডিত হাত জোড় করে বললে, হুজুর গোমস্তাব খাতা লিখে আমি কিছু পাই না। যে কদিন খাতা লিখি, সেই কদিন দু মুঠো অন্ন মেলে শুধু। তবে দোকানের খাতা লিখে দি, দোকানী দু টাকা করে দেয় মাসে। একটু চুপ করে থেকে পণ্ডিত আবার বললে, হুজুর অবশ্য ঠিক কথাই বলেছেন, এক টাকা এমন কি বেশি? কথা সত্য। কিন্তু হুজুর, আমার বড় সাধ, একান্ত বাসনা, আমার এড পাঁচ টাকা হয়। আশপাশের পাঠশালা পাঁচ টাকা পায়, আমি চার টাকা পাই, আমার লজ্জা হয়। এইটি আমার শেষ সাধ, আমার—

পণ্ডিতের বাক্যস্রোতে রজনীবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আমি উপরে পাঠিয়ে দিলাম দরখাস্ত। এবার কোতলঘোষার পণ্ডিত মশাই!

কোতলঘোষা ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। তাঁরা আবার তান্ত্রিক। সেখানকার পণ্ডিত এসে দাঁড়াল। পণ্ডিতটি জাতিতে কায়স্থ, ধর্মমতে বৈষ্ণব; দুর্বুদ্ধিবশত পণ্ডিত একটি দুর্বিনীত ছাত্রকে শাসন করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত শাক্ত তান্ত্রিকদের পাঁঠাবলি এবং কারণ করা নিয়ে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করেছে, বলেছে, কেন বাবা আমাকে কষ্ট দাও আর নিজেই বা কষ্ট পাও কেন? এমন কুলকর্ম রয়েছে, অনুস্বার বিসর্গ লাগালেই মন্ত্রং হয়ে যাবেং, আর তারঃ সঙ্গেঃ দু ঢোকং কারণং! বাস্, তোমার অন্ন খায় কে? এ কষ্ট কেন তোমার? সেই হেতু তার বিরুদ্ধে দরখাস্ত হয়েছে!

রজনীবাবু বললেন—এ সব কথা বললেন কেন আপনি ? তারা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ।

পণ্ডিতটি হাত জোড় করে বললে—আজ্ঞে বাবু, কায়স্থ হলেও তো আমি মানুষ ; সহ্যের তে একটা সীমা আছে। ছেলেটা একেবারে ধর্মের ষণ্ড হয়ে উঠেছে।

মাথা চুলকে লজ্জা প্রকাশ করে বললে—তামাক খাই হুজুর—তা তামাক টিকে এ আর ছেলেটা রাখে না! তার উপর একে মারছে ওকে ধরছে। কারও বই ছিঁড়ে দিচ্ছে। সেদিন একজনের কান কামড়ে রক্তারক্তি ব্যাপার। কানে ধরলাম তো মহিষের মত রক্তচক্ষু করে বললে—খবরদার, কায়েত হয়ে কানে হাত দেবে না তুমি। আমার গুরুর কান ; মন্তর হয়েছে আমার।

রজনীবাবু চটে উঠলেন—কঞ্চি ? কঞ্চি কি হল আপনার ? কঞ্চি দিয়ে বেশ ঘাকতক দেন নি কেন ? অতি অযোগ্য লোক আপনি !

পণ্ডিত বললে—তা হলে কোন দিন অন্ধকারে আচমকা ঢেলায় আমার মাথা ফেটে যাবে হুজুর। ব্রাহ্মণ নই, নিরীহ শিক্ষক—সে যে, গো-বধ হবে বাবু।

রজনীবাবু এবার হেসে ফেললেন—কি বিপদ! তা হলে করবেন কি আপনি ? আমিই বা লিখব কি ? একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা। আর যেন এসব কথা বলবেন না।

আজ্ঞে না, আর কখনই বলব না হুজুর। তারপর সে বললে, আজ্ঞে বাবু, রামকৃষ্ণ-কথামৃতের কত দাম ? আমি একখানা আনাতে চাই ; দোকানের ঠিকানাটা যদি লিখে দেন। কায়স্থের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, চিন্তার মধ্যেও সীতারাম তারিফ করলে। রামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রসঙ্গ ঝাঁ করে কায়দা-মাফিক এনে ফেলেছে কায়স্থ পণ্ডিত !

এর পর পালা এল পলাশবুনির বৃদ্ধ পণ্ডিতের। এই পণ্ডিত মশায়টির সঙ্গেই এতক্ষণ সীতারাম কথা বলছিল। পণ্ডিত নিজের দুঃখের কথা বলছিলেন। অনেক দুঃখ করেছেন জীবনে। যে গ্রামে পাঠশালা করেছেন, সেখানে পাঠশালা করবার অনুমতি লাভের জন্য জমিদারের কাছারির পাচকবৃত্তি স্বীকার করতে হয়েছিল। সেকালে জমিদার মহলে এলে তাঁর রান্না করতে হত। জমিদারের গ্রামদেবতার পূজা করতে হত। এটায় অবশ্য লাভ ছিল। এর ফলে গ্রাম্য পৌরোহিত্য পেয়েছিলেন। আখমাড়াইয়ের সময় শালপুজো করে গুড় পেতেন, ইতুপুজো করে কলাই পেতেন। কিন্তু পণ্ডিত হেসে বললেন, বাবা, সকাল থেকে দেড় প্রহর বেলা পর্যন্ত পাঠশালা, তারপর স্নান, তারপর পুজো। তার মানে—বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত না খেয়ে কাটত। খাওয়াটা অবশ্য বাঁচত কিন্তু তার ফলে ব্যাধি জুটেছে এখন, তার উপর এই কন্যাদায়। জীবন শেষ হয়ে গেল। আর দু-এক বছর। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমাদের আমল তো সোনার আমল বাবা। গেরস্তের বাড়িতে ছেলের জন্যে ধরণা দিতে হয় না। ছেলের বাবা বলে না, আমাদের ছেলে নেকাপড়া করবে কি করবে ? ছেলের মা-পিসী বলে না, বংশে নাই, নেকাপড়া আবার সহ্য হবে তো ? খ্যানত

বে। না, না, ওতে কাজ নাই। তুমি তো বাবা সাহা-কৈবর্তদের ছেলে নিয়ে পাঠশালা করছ এখন। এখন সব লেখাপড়া শেখবার একটা চাড় হয়েছে। আরও হবে। আমরা দেখব না, তামরা দেখবে।

সীতারাম স্বীকার করলে সে কথা, বললে, তা বটে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবলে। জনীবাবু ডাকলেন, পলাশবুনির পণ্ডিত মশাই!

ব্রাহ্মণ পৈতেটি হাতে জড়িয়ে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন, হুজুর, গরীব ব্রাহ্মণ, এইটুকুই আমার ন্ন। এটুকু আমার মারা গেলে ছেলেপিলে নিয়ে মারা যাব। তার উপর কন্যাদায়।

বৃদ্ধ পণ্ডিত কন্যার পাত্র সন্ধান করতে গিয়ে প্রায় দশ-বারো দিন পাঠশালা কামাই রেছেন।

সহৃদয় মানুষ রজনীবাবু। বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন—বসুন, সুন আপনি।

পণ্ডিত বসতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন।

রজনীবাবু বললেন—আমাকেও তো জানিয়ে যেতে পারতেন। আমি ইন্‌স্‌পেক্‌শনে গিয়ে খি—পাঠশালা বন্ধ। লোকে বললে—উনি এই রকম কামাই প্রায়ই করেন।

পণ্ডিত বললেন—ভয়ে, আজ্ঞে বাবু ভয়ে আমি আপনার কাছে—। আবার কেঁদে কললেন তিনি। তারপর বললেন, বাবু ষোল বছরের কন্যা গলায় ফাঁসির মত লেগেছে, রাত্রে ম হয় না, মুখে ভাত ওঠে না, সেদিন প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলাম—পাত্র যোগাড় না করে রব না।

পাত্রের যোগাড় হয়েছে?

পেয়েছি। এক বৃদ্ধ—তৃতীয় পক্ষ! দোব, তাই দোব। কি করব! উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন ণ্ডিত।

রজনীবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আচ্ছা যান আপনি। তবে এ-রকম ভাবে না ানিয়ে একনাগাড়ে দশ-বারো দিন কামাই আর করবেন না।

পলাশবুনির পণ্ডিত চলে গেলেন। আর কেউ নাই।

সকলকে বিদায় করে রজনীবাবু ডাকলেন, সীতারাম!

সীতারাম নমস্কার করে দাঁড়াল। রজনীবাবু বললেন, বস। বড় খামের ভিতর থেকে কখানি দরখাস্ত বার করে তিনি নিজে পড়লেন। তারপর বললেন, তোমাদের গ্রামের পণ্ডিত, । তোমার দাদা; তাকে সব বলেছি, শুনেছ তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি তো ইংরেজীও কিছু জান। পড়ে দেখ, মোটামুটি বুঝতে পারবে। সীতারামের হাতে লেন দরখাস্তখানি।

টাইপ করা দরখাস্ত—To the District Magistrate। একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছে। সাহেব পাঠিয়েছেন ইস্কুল সাব-ইন্সপেক্টারের কাছে, তদন্তের জন্য।

দরখাস্তের কারণ, অসহযোগ আন্দোলনে ধীরানন্দ মুখুজ্জের জেল হওয়ার সংবাদ এলে সন্দীপন পাঠশালার শিক্ষক সীতারাম পাল তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঠশালা বন্ধ দিয়েছে। এ থেকেই প্রমাণ হবে, তার ধীরানন্দের প্রতি অনুরাগ। সীতারাম ধীরানন্দের প্রজা, তাদের বাড়িতেই সে থাকে, তারই আদর্শে সে অনুপ্রাণিত। এই মতিভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবা ধীরানন্দ বর্তমানে অহিংস আন্দোলনে যোগ দিলেও আসলে সে সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সীতারাম ধীরানন্দের পবামর্শে এবং আদর্শে পাঠশালার ছেলেদের রাজদ্রোহ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

সীতারাম অত্যন্ত দুর্বল মানুষের মত ধীরে ধীরে দরখাস্তখানি রজনীবাবুর সম্মুখে নামিয়ে দিলে। একটা দুরন্ত ভয়ে তার মন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ধীরানন্দ সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত? সীতারাম তার পরামর্শে এবং আদর্শে পাঠশালার ছেলেদের রাজদ্রোহ শিক্ষা দিয়ে থাকে? তার মনে হল, পাঠশালার এড বন্ধ হওয়া—এ তো সামান্য কথা, এতে তাকে পুলিসে ধরে নিয়েও যেতে পারে!

রজনীবাবু প্রশ্ন করলেন, পাঠশালা বন্ধ কেন দিলে তুমি? এ আমি কি লিখব?

নিজেকে সংযত করে সীতারাম ধীরে ধীরে বললে, আমি তো ঠিক ওভাবে পাঠশালা বন্ধ দিই নাই। আমি ওঁদের বাড়িতে থাকি, ওঁরা আমাকে বাড়ির ছেলের মতই দেখেন, যখন ওঁদের এই বিপদের কথা শুনলাম, মা কাঁদছেন, আমার ছাত্র দুটি কাঁদছে, তখন আমি—

রজনীবাবু বললেন, তুমি কি এমন কোন কথা বলেছিলে যে, আজ ধীরানন্দবাবু দেশের জন্য জেলে গিয়েছেন, সেই জন্যে পাঠশালা বন্ধ হল?

আজ্ঞে না বাবু। যে দিব্যি করতে বলেন, আমি সেই দিব্যি করতে পারি। আপনি ছেলেদিগে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। জ্যোতিষ সাহা মহাশয় আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

রজনীবাবু বললেন, সাহা মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি অবশ্য, তুমি যা বলছ, তাই বলেছেন। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, আচ্ছা, তাই আমি লিখে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি একটু সাবধান হবে এর পর থেকে বরং—

একটু চুপ করে থেকে তিনি একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বললেন, তুমি বরং ধীরানন্দবাবুদের বাড়িতে থাকা ছেড়ে দাও। তাতে ভাল হবে। বুঝলে?

সীতারাম চুপ করে রইল। দেবু-শ্যামুকে পড়ানো ছেড়ে দেবে? ওদের বাড়ির সঙ্গে সংস্রব ছেড়ে দেবে? এই বিপদের সময়?

রজনীবাবু বললেন, দেখ এসব আন্দোলন, এই রাজনীতি, এ আমাদের দেশের নয়। এ হল বিদেশী জিনিস। এতে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে না। আমাদের একমাত্র পথ হল ধর্মের পথ, ধর্মনীতির মধ্য দিয়েই আমাদের মুক্তি আসবে। পরমহংসদেব স্বামীজী এ কথা বার বার করে বলে গিয়েছেন।

সীতারাম তাকিয়ে দেখলে, রজনীবাবুর দেওয়াল-আলমারিতে সারি সারি বই সাজানো রয়েছে। রামকৃষ্ণ-কথামৃত থেকে স্বামীজীর বইগুলি—'বীররাণী', 'পরিব্রাজক', কত বই!

রজনীবাবু বলেই যাচ্ছিলেন, বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের কথা। তিনি বলে গিয়েছেন, আমি ভারতবাসী। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভারতবাসী আমার ভাই।

বাইরে থেকে কেউ ডাকলেন, রজনীবাবু রয়েছেন নাকি?

কে? মাস্টার মশাই?

হ্যাঁ। আজকের জোর খবর। সি. আর. দাস অ্যারেস্টেড হয়েছেন।

তাই নাকি? বেরিয়ে গেলেন রজনীবাবু। সীতারাম বীরবাণী বইখানা টেনে নিলে।

করলে কি মশাই? কাঁপিয়ে দিলে যে!

হ্যাঁ।

ছেলেরা তো কেউ আজ ক্লাসে আসবে না।

হেসে রজনীবাবু বললেন, আপনারা বেঞ্চি আগলে বসে থাকুন, নইলে এ গ্রামকে বিশ্বাস নাই। দেবে হয়তো দরখাস্ত করে। বেচারী সীতারামের বিরুদ্ধে দরখাস্তের কথা জানেন তো? অথচ বেচারী ঠিক ওভাবে পাঠশালা বন্ধ দেয় নাই। ধীরানন্দের বাড়িতে থাকে, এমন একটা বিপদের খবর পেয়ে বেচারা ছুটে গিয়েছিল। বিপদে যেমন মানুষ মানুষের বাড়ি যায়।

হঠাৎ কেউ শ্রমিক বা কৃষাণ শ্রেণীর লোক কথা বললে। আজ্ঞে বাবু মাশায়—।

সীতারাম ঘরের মধ্যেই বসে ছিল। 'বীরবাণী'খানা টেনে নিয়ে উল্টে দেখছিল। হঠাৎ তার কৃষাণের ছেলের গলার আওয়াজে সে চমকে উঠল।

আজ্ঞেন, এখানে সীতারাম পণ্ডিত মশায় আইচেন না?

কি রে, কি?—সীতারাম বেরিয়ে এল।

আজ্ঞেন, কন্যেসন্তান হইচেন গো। তাই বাবা বললে, খবর দিয়ে আয় গা।

মনোরমা একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছে। সে লজ্জিত হল।

রজনীবাবু একটু হেসে বললেন, যাও, তুমি বাড়ী যাও। ভেব না। আমি ঠিক করে দেব সব।

একটু পথ এগিয়ে সীতারাম বললে, ভাল আছে তো?

আজ্ঞেন হ্যাঁ। বাবা তো বলেন নাই। মুনিব্যানই বললে। তা ভদ্দর লোকদের ছামনে বাবার নামই করলাম।

সীতারাম একটু হাসলে। ছোঁড়াটার বুদ্ধি আছে।

ছোঁড়াটা পিছন থেকে হঠাৎ বললে, আজ্ঞেন, পকেট থেকে বই টা পড়ে যাবেন গো, বেরিয়ে পড়েছেন যে।

বই! পকেট থেকে টেনে বার করলে বইখানা। তার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠল রজনীবাবুর 'বীরবাণী'খানা উল্‌টে দেখছিল, তাড়াতাড়ি উঠে আসবার সময় সেখানা সে পকেটে পুরে নিয়ে এসেছে।

*　　*　　*　　*

পাণ্ডুর মুখে শুয়ে ছিল মনোরমা। কোলের কাছে সদ্যোজাতা শিশুকন্যা। অদ্ভুত! তাকাতে পারে না ভাল করে, আঙুলগুলো মুঠো বেঁধে রয়েছে, থরথর করে কাঁপছে। বড় ভাল লাগল সীতারামের।

মনোরমা হেসে বললে, তোমার মত হয়েছে।

সীতারাম বললে, তবে তো খুব ভাল হয়েছে! বিয়ে দিতেই চক্ষু চড়কগাছ! আমার মত কুচ্ছিৎ!

বাধা দিয়ে মনোরমা বললে, ও মাগো! কথার কি ছিরি তোমার! কুচ্ছিৎ আবার কোন্‌খানে তুমি? না, নিজেকে কুচ্ছিৎ বললে বেশী বাহাদুরি হয়?

সীতারাম হাসলে। তারপর বললে, কথাটা যদি তোমার ছলনা না হয়, তবে তোমাকে চশমা এনে দিতে হবে।

কথার প্যাঁচটা ঠিক বুঝতে না পেরে মনোরমা অবান্তর একটা রহস্য করলে। উত্তরে বললে, চশমা দিও জুতো দিও, একটা টুপি কিনে দিও, তোমার ইস্কুলে আমি একটিনি চালিয়ে দিয়ে আসব।

সীতারাম মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে, হোক কালো-কুচ্ছিৎ, ওকে আমি লেখাপড়া শেখাব। ভাল বিয়ে যদি না হয় তবে বিয়ে আমি দোবই না। লেখাপড়া শেখাব, ও আপনার কোন ইস্কুলে-টিস্কুলে মাস্টারি করবে। কাল কেটে যাবে।

কি অলুক্ষণে কথা তোমার!

কেন?

মাস্টারি করবে কি? মেয়েতে আবার মাস্টারি করে?

এই তো রত্নহাটা-বিদ্যালয়ে মেয়ে-মাস্টার আসছে!

মেয়ে-মাস্টার আসছে? ক্রীশ্চান নাকি?

উঁহু। ক্রীশ্চান কেন হবে, হিন্দু-কায়স্থের মেয়ে।

মনোরমা অবাক হয়ে গেল। কায়স্থ-ঘরের মেয়ে চাকরি করছে? বিয়ে করে নাই?

তা জানি না।

মনোরমা নিজেই অনুমান করে বললে, বিয়ে হলে কি স্বামীতে চাকরি করতে দেয়?

বিয়ে হয় নাই।

সীতারাম বললে, সেই তো বলছি, ভাল পাত্র—লেখাপড়া জানা পাত্র যদি না পাই, তবে মেয়ের বিয়ে আমি দোব না। বুঝলে ?

মনোরমা বললে, অনেক করে টাকা দেবে, বিয়ের আবার ভাবনা !

অনেক টাকা ! হেসে উঠল সীতারাম।

মনোরমা বললে, হ্যাঁ। তোমার যত সব ছাত্তর, তাদের কাছে নেবে—এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, যে যেমন—

সীতারামের মনে পড়ল, পলাশবুনির কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথা। সে অন্তমনস্কভাবে 'বীরবাণী' বইখানা নাড়তে লাগল।

হঠাৎ মনোরমারও মনে পড়ল, গত সন্ধ্যায় ভাসুরের কথা। সে বললে, সেই যে দরখাস্তের কথা বলছিল পণ্ডিত-ভাসুর, তার কি হল ?

ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব হালকা এবং সংক্ষিপ্ত করে সীতারাম বললে রজনীবাবুর ওখানকার বিবরণ।

আট

রজনীবাবুকে দোষ দিতে পারবে না সীতারাম; রজনীবাবু চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। রিপোর্টে তিনি কি লিখেছিলেন না দেখলেও সীতারাম জানে, তিনি তাকে বাঁচিয়েই রিপোর্ট দিয়েছেন। দোষ বোধ হয় সীতারামের ভাগ্যের। তা ছাড়া আর তো কিছু দেখতে পায় না সে।

হঠাৎ সেদিন মোটরকার এসে দাঁড়াল পাঠশালার দরজায়। মোটর থেকে নামলেন পুলিস সাহেব। আকু ছুটে বেরিয়ে গিয়ে আবার তখনই ফিরে এল। পুলিস সাহেব, মাস্শাই।

পুলিস সায়েব ?

হ্যাঁ। দফাদারকে শুধালাম, দফাদার বললে।

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল সীতারাম। পুলিস সাহেব দরজার মাথায় কাঠের উপরের লেখা নামটা পড়ছিলেন—সন্দীপন পাঠশালা। সন্দীপন, পিকিউলিয়ার নেম! দারোগার দিকে ফিরে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, হু ইস্ দিজ সন্দীপন ? হু ইজ হি ?

দারোগা বললেন, ঠিক জানি না সার্ !

সীতারাম নমস্কার করে দাঁড়াল। তার বুকের ভিতরটা দুরন্ত ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

গ্রাম্য পাঠশালায় সাহেব-সুবোরা বড় একটা আসেন না, এলেও আসেন এস. ডি. ও, নয়তে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। পুলিস সাহেবের পাঠশালায় আসা আর কাঠুরের কাছে যমের কাঠে বোঝা তুলে দিতে আসায় কোন প্রভেদ নাই। গল্পের কাঠুরে যমকে ডেকেছিল, ফিরে যেতে বললে, সে ফিরে গিয়েছিল। এ কিন্তু যখন না ডাকতে নিজে থেকে এসেছে, তখন সে কি শুধু শুধু ফিরে যাবে?

গভীর সম্ভ্রম দেখিয়ে সীতারাম নমস্কার করে দাঁড়াল। দারোগা বললেন, এই পাঠশালার পণ্ডিত সার্।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সাহেব বললেন, ইউ পণ্ডিট সীটারাম পাল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

সাহেব বাঙালা বললেন, সন্দীপন পাঠশালা! মানে কি?

কথাটা বুঝতে পারলে না সীতারাম, বিব্রত অপ্রতিভের মত বললে, আজ্ঞে?

সন্দীপন নাম কেন পাঠশালার? সন্দীপন কে?

একটু বিস্মিত হল সীতারাম। বাঙালী সাহেব, হিন্দুর ছেলে; শুনেছে সাহেব খুব বড় বৈদ্যবংশের ছেলে, সন্দীপন কে তা সাহেব জানেন না! সে হাত জোড় করে বললে, হুজুর শ্রীকৃষ্ণের গুরুর নাম সান্দীপনি মুনি। তাঁর সন্দীপন পাঠশালাতেই কৃষ্ণ-বলরাম লেখাপড়া শিখেছিলেন।

আই সী। স্থির দৃষ্টিতে সাহেব কিছুক্ষণ সীতারামের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার উপাধি তো পাল! চাষী সদ্‌গোপের ছেলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার গ্রামও তো ছোট চাষীর গ্রাম?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। এই পাশেই—ক্রোশখানেক।

ইয়েস, ইয়েস। আই নো, আই নো। একটু চুপ করে থেকে বললেন, সন্দীপন কে নাম দিলে পাঠশালার? অ্যাঁ? পরিত্রাণায় সাধুনাং? হাসলেন তিনি একটু। তারপর আবার বললেন, তোমার মাথা থেকে এসেছে? অ্যাঁ? কৃষ্ণ তৈরীর কারখানা?

সীতারাম বুঝতে পারলে না, এই নামকরণের মধ্যে কোথায় অপরাধ লুকিয়ে আছে! তবে সে ভীত না হয়ে পারলে না। সাহেবের কথাগুলি ধমক নয়, কিন্তু রূঢ় নিষ্ঠুর; হাতুড়ির মত আঘাত করে না, ধারালো ছুরি দিয়ে অবলীলাক্রমে সহজ ছন্দে কেটে চলে। সীতারামের মনে হল, সাহেব ঠিক পেন্সিল কাটার মত যেন কেটে চলেছেন।

সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, কে পাঠশালার নামকরণ করেছে? তুমি?

সীতারাম বললে, আজ্ঞে ধীরানন্দবাবু।

আই সী। চল, তোমার পাঠশালা দেখব।

এসব ক্ষেত্রে কি করতে হয়, সে সব পাঠশালার ছেলেরা জানে। তারা ইতিমধ্যেই আপন আপন জায়গায় মনোযোগের সঙ্গে পড়তে বসে গিয়েছে, এমন কি আকু পর্যন্ত। সাহেব ভিতরে ঢুকতেই তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, নমস্কার করলে। সীতারাম চেয়ারখানি ঝেড়ে দিলে। টেবিলের উপর খাতাপত্রগুলি নামিয়ে দিলে। সাহেব সেগুলি বাঁ হাতে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তিনি ঘরখানির আসবাব—সরঞ্জামগুলি দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ছেলেরা কয়েকজন এগিয়ে এসে নমস্কার করে আবৃত্তি শুরু করে দিলে—

"সকলে দাঁড়াই এস সারি সারি হয়ে।
দরশক এসেছেন অদ্য বিদ্যালয়ে।
প্রণাম তোমার পদে ওহে মতিমান,
আশীর্বাদ কর যেন হই জ্ঞানবান।"

সাহেব হেসে বললেন, আচ্ছা হয়েছে। গুড।

সীতারাম ছেলেদের ইঙ্গিত করলে, তারা থেমে গেল।

সাহেব হঠাৎ উঠলেন, চারিদিকের দেওয়ালের কাছে গিয়ে বেশ ভাল করে দেখে এলেন কিছু। তিনি দেখে এলেন দেওয়ালে পেন্সিল দিয়ে লেখা ছেলেদের লেখাগুলি—বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, ভোলা চোর, আকু ডাকাত, বন্দে মাতরম্, গান্ধী মহারাজের জয়, বন্দে মাতরম্।

সাহেব ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা ভারতবর্ষের সম্রাটের নাম জান?

সীতারাম জ্যোতিষ সাহার ভাইপোর দিকে চেয়ে বললে, বল, ভয় কি?

সে জোড়হাত করে বললে, ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ।

সাহেব বললেন, মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ। গুড। আচ্ছা, তোমরা ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় লোকের নাম জান? টাকার বড়লোক নয়—ভাল লোক, বড় লোক?

জ্যোতিষ সাহার ভাইপো বিহ্বল দৃষ্টিতে মাস্টারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কয়েকজন উপরের দিকে মুখ করে ভাবতে আরম্ভ করে দিলে। আকু মৃদু হাসছিল তার অভ্যাসমত। সাহেবের চোখে চোখ পড়তেই সে হেসে মুখ নামিয়ে বললে, মহারাজ গান্ধী।

জ্যোতিষ সাহার ভাইপো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, চিত্তরঞ্জন দাশ।

একজন বললে, মতিলাল নেহেরু।

আকু আবার বলে উঠল, সুভাষচন্দ্র বসু। জওহরলাল নেহরু।

সীতারামের হাত-পা সত্যই হিম হয়ে গেল। সে ঘামছিল।

সাহেব বললেন, হয়েছে। যাও, তোমাদের ছুটি। যাও।

ছেলেরা চলে গেলে সাহেব প্রশ্ন করলেন, তুমি শিখিয়েছ এসব ?

ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটতে কাটতে একসময় পেন্সিলও মারাত্মক রকমের সূক্ষ্ম ধারালো হয়ে উঠে। ভয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে মানুষ অনেক সময় অভয় না পেলেও নির্ভয় হয়ে উঠে। সে এবারে মুখ তুলে বললে, আজ্ঞে না। আমি শেখাই নাই। এসব আজকাল কাউকে শেখাতে হয় না হুজুর, দেশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওরা নিজেই শিখেছে। ভয়ে পশ্চাৎ অপসরণের শেষ সীমায় এসে আশ্চর্য রকমের ধৈর্য এবং সাহস উপলব্ধি করছিল সে, শান্তভাবে ধীরতার সঙ্গেই সে জবাব দিলে।

সাহেব আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলেন ধীরানন্দ সম্পর্কে। সীতারাম নির্ভয়েই উত্তর দিয়ে গেল। একটু মিথ্যা কথা বললে না। এর পর সাহেব চলে গেলেন।

সীতারাম যেন পাথর হয়ে গেল, সেইখানেই সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মাথার মধ্যে সব যেন তার গোলমাল হয়ে গিয়েছে। কোন স্পষ্ট ভাবনা নাই। মাথার মধ্যে শুধু একটা ক্ষোভ যেন ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে চারটে বেজে গেল।

সীতারাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল। হঠাৎ ঘর-দুয়ার বন্ধ করতে আরম্ভ করলে। হঠাৎ আবার বসল চেয়ারে। বসেই রইল।

জ্যোতিষ সাহা এল।—পণ্ডিত!

আসুন।

হ্যাঁ, এলাম। ব্যাপার যে বেজায় খারাপ হয়ে গেল পণ্ডিত।

সীতারাম বললে, কি করব বলুন ?

জ্যোতিষ একটু চুপ করে থেকে বললে, আমাকেও একদফা শাসিয়ে গেলেন, তুমি ঘর দিয়েছ কেন? তা আমি বললাম. হুজুর, আমি তো ঘর ভাড়া দিয়েছি। একটু চুপ করে জ্যোতি আবার বললে, আমার আবার মহা মুশকিল তো। আমি তো একরকম গবর্মেণ্টের চাকর। মদ-গাঁজার লাইসেন্স রাখি। আমাকে হুকুম হল, ভাড়া তুলে দাও।

সীতারাম বললে, আমাকে একটা মাস সময় দেন। একটা জায়গা কিনে, চালা তুলেও আমি পাঠশালা চালাব। পাঠশালা আমি বন্ধ করব না। এই কয় মুহূর্তের মধ্যে সে আবার জেগে উঠেছে।

* * *

কয়েক দিন পর। এবার চরম ধাক্কা এল।

সীতারামের পাঠশালায় পুলিসী খানাতল্লাশ হয়ে গেল।

কানাই রায়—সীতারামের উপপদ-তৎপুরুষ, সে বললে, পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয় সীতারাম, বুঝলে তো! সাহেবের হাতে পায়ে ধরলেই হত। তা—। ঠোঁটের কোণে একটা বিচিত্র শব্দ করলে কানাই। তারপর আবার বললে, তা মাথা তোমার শক্ত হোক আর না হোক, গোঁ খুব শক্ত বটে।

সীতারাম স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল বাবুদের বাড়িতে নিজের ঘরে। তক্তপোশের উপর তার সামনেই রাখা ছিল, তার সন্দীপন পাঠশালার ক্লকঘড়িটা। ঘড়িটার কাচ ভেঙে গিয়েছে। মেঝের উপর এক পাশে পড়ে আছে একখানা ভারতবর্ষের বড় ম্যাপ। ম্যাপখানা ছিঁড়ে গিয়েছে। কাচভাঙা ছবি ক'খানা পড়ে রয়েছে একপাশে। ব্ল্যাক-বোর্ডটার একদিকের ফ্রেমের জোড় ভেঙেছে।

আজই ভোরে পাঠশালায় খানাতল্লাশ হয়ে গিয়েছে। খানাতল্লাশীর পর জ্যোতিষ সাহা বলেছে, পণ্ডিত, তোমার জিনিসপত্র নিয়ে যাও ভাই। আমাকে মাপ কর তুমি। সীতারাম জ্যোতিষকে দোষ দিতে পারে নাই। কথা বলতে গিয়ে সাহার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। এর পর চুপিচুপি তাকে বলেছে, তুমি যদি পাঠশালার উপযুক্ত ঘর ভাড়া পাও পণ্ডিত, তবে দেখো, ভাড়াটা আমি মাসে মাসে দোব!

সীতারাম সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত পাঠশালার দাওয়ায় বসে শুধু কেঁদেছে। বসে ছিল সে ছেলেদের অপেক্ষায়। তার নিজের সমর্থ দেহেও যেন একবিন্দু শক্তি ছিল না। ছেলেরা এলে, ছেলেদের নিয়ে এসব ছড়ানো জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে যা হয় ব্যবস্থা করবে, এই সে ভেবেছিল। কিন্তু বারোটা পর্যন্ত ছেলেরা কেউ এল না। তাদের পরিবর্তে তাদের বাপেরা একে একে এল, সকলেই ছেলের সার্টিফিকেট নিয়ে গেল। বড় স্কুলের সংলগ্ন পাঠশালায় তাদের তারা ভর্তি করে দেবে। এখানে পড়ানো আর নিরাপদ নয়। অবশ্য প্রত্যেকেই বললে, দোষ তোমার নাই, সে আমরা জানি পণ্ডিত। ছেলেটাও কাঁদছে। তোমাকে ভালও বাসে, আর বড় স্কুলের মাস্টারেরা আমাদের ছেলেদিগে হেন্টাকেন্টাও করে। কিন্তু করি কি বল? যদি ধরে নিয়ে যায়!

বেলা চারটে পর্যন্ত খাতায় মাত্র পাঁচটি ছেলের নাম রইল। জ্যোতিষ সাহার ভাইপো, আর তিনটি ছেলে—বিনা বেতনের ছাত্র। আর রইল আকু—আকুর বিষয়ে তার বাপমায়ের কোন চিন্তা নাই।

ঠিক এই সময় এল দেবু আর শ্যামু। সঙ্গে কানাই রায়, মজুর এবং বাড়ির গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে মায়ের নির্দেশে। পাঠশালার জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। তারাই সব গুছিয়ে নিলে। সীতারাম পুতুলের মত সঙ্গে এল শুধু। মা তাকে অনেক অনুরোধ করে খাওয়ালেন; সে খাওয়াও নামমাত্র। তারপর ভাঙা ঘড়িটা সামনে রেখে সে নির্বোধ স্তম্ভিতের মত বসে আছে। ওই ঘড়িটার সঙ্গে জীবনের চলাটাও যেন হঠাৎ তার বন্ধ হয়ে

গিয়েছে আজ সকাল থেকে

বৈকালে অভ্যাসমত সে গিয়ে ঝরনার ধারে বসল। ধীরানন্দের জেল হওয়ার খবর যেদি এসেছিল, সেদিন যেমন সে উদাস দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চেয়ে ছিল, সেই দৃষ্টিতে, বোধ হ সেদিনের চেয়েও গভীরতর ঔদাসীন্যভরা দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল। সেদিন তবু ক্ষণে ক্ষণে তা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল ধীরাবাবুর মুখ। আজ দৃষ্টির সামনে কিছুই ভেসে উঠল না। স হারিয়ে গিয়েছে, সব খাঁ-খাঁ করছে।

সীতারাম!—কেউ পিছন থেকে ডাকলে। পরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু আজ ঠিক ধরতে পার না সীতারাম। পিছন ফিরে দেখলে, রজনীবাবু আসছেন ওদিক থেকে। সীতারাম এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল।

বসো তুমি, বসো। রজনীবাবু তার পাশেই বসলেন। তারপর বললেন, আমি শুনে সব।

সীতারাম চুপ করে রইল।

রজনীবাবু বললেন, ইচ্ছে ছিল সার্চের পরই একবার পাঠশালায় যাই। নিজের চো দেখে আসি। কিন্তু এখানকার মাস্টার মশাইরা বারণ করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থে আবার বললেন, শুনেছিলাম তুমি রোজ এই ঝরনার ধারে বেড়াতে আস, তাই এলাম।

সীতারাম নির্বোধের মত শুধু প্রশ্ন করলে, আজ্ঞে?

রজনীবাবু তার পিঠে সস্নেহে হাত দিয়ে এবার বললেন, তুমি বড় মুষড়ে গিয়েছ। এম মুষড়ে পড়লে তো হবে না।

সীতারাম চোখ মুছে নিয়ে বললে, আজ্ঞে না; একটু হাসতেও চেষ্টা করলে।

রজনীবাবু বললেন, মণিবাবুর সঙ্গে তোমার কি হয়েছিল—জমিদার মণিলালবাবুর সঙ্গে

সীতারাম মনে করতে পারলে না কথাটা, সবিস্ময়ে বললে, আজ্ঞে কই, কিছুই তো— সে স্তব্ধ হয়ে গেল, মনে পড়েছে।

কি বলেছিলে তুমি তাকে?

সীতারাম অকপটেই সমস্ত বললে।

তিনিই এ ব্যাপারের মূলে আছেন। তিনিই জানিয়েছেন এসব পুলিস সাহেবকে।

সীতারাম এবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

রজনীবাবু বললেন, আগে যে দরখাস্তটা হয়েছিল, সেটা আমার রিপোর্টেই ঠিক হ গিয়েছিল। কোনও গণ্ডগোল আর হত না।

সীতারাম শক্ত হয়ে উঠল। মণিলালবাবুর দ্বারা এ ব্যাপারটা ঘটেছে, এই সংবাদটাই তা শক্ত করে তুললে। সে একটু হেসে বললে, আমার অদৃষ্ট।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রজনীবাবু বললেন, কি করবে এখন ?

সীতারাম প্রশ্ন করলে, পাঠশালা আমাকে আর করতে দেবে না ?

ইচ্ছে করলে গভর্মেন্ট না পারে কি ? বন্ধ করতে পারে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে, কিন্তু—। হাসলেন রজনীবাবু, বললেন, সে করবে না, নিজেদেরও একটা লজ্জা আছে। একটা পাঠশালা—। নাঃ, ততদূর করবে না। তবে এডের টাকাটা বন্ধ হবে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, তবে এখন কিছুদিন চুপ করে থাকাই ভাল। বাবুদের ছেলে পড়ছে, ওই সঙ্গে আরও দু-চারটি ছেলে যদি নাও, তবে চলবে কোন রকমে তোমার। তা ছাড়া দুপুরবেলা যদি সব-রেজেষ্ট্রি আপিসে লোকজনের দরখাস্ত-দলিল লেখে দাও, তাতে ভালই হবে তোমার। পাঠশালার চেয়ে ভাল হবে। আমি সব-রেজিস্ট্রার বাবুকে বলেছি। তিনিও ব্যাপারটা শুনে দুঃখিত হয়েছেন। বললেন—বেশ, দেবেন পাঠিয়ে।

সীতারাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, দেখি।

বাবুদের বাড়ি ফিরতেই কানাই বললে, মা ডাকছেন তোমাকে।

ধীরানন্দের মা এ ব্যাপারটায় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। কোন মতেই ভুলতে পারছিলেন না যে, এর জন্য দায়ী ধীরানন্দ। ধীরানন্দ জেলে গিয়েছে, ধীরানন্দকে সীতারাম শ্রদ্ধা করে, ধীরানন্দের ভাইদের পড়ায়, তাদের বাড়িতে থাকে, তাই তার এই দুর্ভাগ্য। বহু কষ্টে বেচারা চাষীসদ্‌গোপের ছেলে, সামান্য লেখাপড়া শিখে ভদ্রভাবে জীবনযাপনের জন্য পাঠশালা খুলেছিল, সেটিই শুধু ভেঙে গেল নয়, বেচারার বোধ হয় ওই পথ ধরে চলাও এযাত্রার মত শেষ হয়ে গেল। একটুকু দায়িত্বই শুধু তাঁদের নয়, আরও দায়িত্ব আছে, সীতারাম তো শুধু ছেলেদের গৃহশিক্ষকই নয়, সে তাঁদের প্রজা। তিনি তাকে ডেকে ধীরানন্দের পড়ার ঘরে বসালেন ; বললেন, বসো বাবা। ও-বেলা থেকে তুমি ভাল করে খাও নি। আগে জল খাও দেখি।

সীতারাম আপত্তি করলে না। ক্ষুধাও ছিল, পেট ভরেই সে খেলে। মা বললেন, দেখ বাবা, আমি ভুলতে পারছি না যে, ধীরার জন্যে তোমাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হল।

সীতারামের চোখে হঠাৎ জল এসে গেল। সে চোখ মুছে বললে, আজ্ঞে না মা ! ব্যাপারটা করেছেন মণিলালবাবু।

মণি ঠাকুরপো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সে সমস্ত কথা বললে।

মা হাসলেন—তিক্ত ধারালো হাসি। এই হাসি সীতারামের কাছে আশ্চর্য মনে হয়। এ হাসি এঁরা ছাড়া কেউ হাসতে পারে না।

মা বললেন, জানো বাবা, বনের সিংহ মরে যায়, তখন অন্য বনের সিংহ এসে এ বনের

আশ্রিতদের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু তারও প্রতিকার একদিন হয়। সিংহের শিশুর যখন বড় হয়, তখন তারা এর শোধ নেয়। গম্ভীরমুখে মা বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আমার ছেলেরাও একদিন বড় হবে। আসুক ফিরে ধীরা।

সীতারাম নীরবে বসে রইল। মায়ের এই কথাগুলি তার কাছে অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হল। তাঁর ছেলেরা সিংহ এবং তারা আশ্রিত।

মা বললেন, শোন বাবা, যার জন্যে আমি ডেকেছি তোমাকে। তুমি কি করবে পাঠশালা তো উঠে গেল!

সীতারাম ব্যস্ত হয়ে বললে, আজ্ঞে না, উঠে যায় নাই, তবে হ্যাঁ, এড বন্ধ হবে।

ছেলেরাও তো সব সার্টিফিকেট নিয়ে চলে গেল!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে?

সীতারাম এ কথার জবাব খুঁজে পেলে না। মা বললেন, আমাদের জন্যেই তোমার উপার্জনের পথ বন্ধ হল। আমি সমস্ত দিনই ভাবছি। তুমি এক কাজ কর বাবা আমাদের সেরেস্তায় তুমি কাজ কর। তোমাদের গ্রাম, এ পাশে সুরভিপুর, রামচন্দ্রপুর এই তিনখানা গ্রাম কাছে কাছে রয়েছে। এর আদায় নাও, সদর সেরেস্তার কাগজপত্র দেখ। তাতে তোমার পাঠশালার চেয়ে ভাল হবে। মাইনে আছে, তহুরী আছে, খারিজ ফীয়ের অংশ আছে।

ভাল হবে। ভাল হবে।—উপপদ-তৎপুরুষ কানাই রায় কখন এসে দরজার মুখেই বসেছে উপু হয়ে।

মা বললেন, তা ছাড়া বাবা, আমারও একটা স্বার্থ আছে। তুমি আমাদের সন্তানতুল্য শুধু তাই নয়, সৎ প্রকৃতি তোমার, সাধু লোক তুমি। আমাদের নায়েববাবুর শরীর ভেঙেছে ওঁর পর তোমার হাতেই সব ভার দিতে চাই আমি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ধীরা যে পথ ধরল, তাতে ওর ওপর আমার ভরসা নাই।

সীতারাম এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্তে কল্পনায় নায়েবি জীবনের রূপ তার সামনে ফুটে উঠল। জমিদার-বাড়ির নায়েব! পিছনে কানাই রায় যাবে মাথায় পাগড়ি বেঁধে কাঁধে লাঠি নিয়ে। তক্তপোশের উপর ছোট গদি পাতা আসনে ক্যাশ বাক্স সামনে নিয়ে বসবে। তা ছাড়া—সিংহের আশ্রিত হয়ে থাকতে পারবে না সে।

কানাই রায় বললে, লেগে যাও, লেগে যাও। শিখতে কদিন লাগবে? আমি সব শিখিয়ে দোব।

সীতারাম চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ভেবে দেখি মা। সম্মতি দিতে গিয়েও

যেন তার গলায় আটকে গেল। বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল।

মনোরমা উৎকণ্ঠিত হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। খানাতল্লাশীর খবরটা সকালে পেয়েছিল সে। আশপাশের চার-ছয়খানা গ্রামেই ছড়িয়ে পড়েছিল। মনোরমা কৃষাণটাকেও পাঠিয়েছিল, সে রত্নহাটায় এসে দুবার খোঁজ নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সীতারামের সঙ্গে কথা বলে নাই। মনোরমার বারণ ছিল। উৎকণ্ঠিত হলে সীতারাম রাগ করে।

সীতারাম আসতেই কিন্তু সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। কাঁদতে লাগল। সীতারাম সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, কাঁদছ কেন?

মনোরমা বললে, যদি ধরে নিয়ে যায়?

ধরে নিয়ে যাবে না।

যাবে না?

না। একটু হেসে আবার সীতারাম বললে, আর যদি যায়ই, তাতেই বা কি? এ তো চোর ডাকাতের জেল নয়।

মনোরমা প্রতিবাদ করে বললে, না।

না?—হাসলে সীতারাম।

তোমাকে আর ওসব করতে হবে না বাপু।

কি?

পাঠশালা-মাঠশালা। হ্যাঁ। আর যদি করতে হয় তো আপন গেরামে কর। ও-বাড়ির পণ্ডিত-ভাসুর বলছিল, আমি তো এইবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই বাস করব, তা অমুক এই-খানেই পাঠশালা করুক না কেনে?

সীতারাম চুপ করে রইল।

আবদার করে মনোরমা বললে, কেমন গেরামের ছেলেরা আমাকে 'গুরুমা' বলবে ও-বাড়ির দিদির মতন, হ্যাঁ!

সীতারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। জমিদার-বাড়ির নায়েবি, গ্রামের পাঠশালা, কিছুতেই তার মন খুশী হতে পারছে না। তার বহু যত্নে গড়া—অনেক সাধের রত্নহাটায় সন্দীপন পাঠশালা। ওই পাঠশালাটি ছাড়া আর কিছুতেই তার মন উঠবে না। বোধ হয় রাজ্যপদ পেলেও না। পাঠাশালাটি জমে উঠেছিল বর্ষার ধানক্ষেতের মত। ঘোলাটে জলভরা ক্ষেতে ধানচারা রুয়ে দেয়, প্রথম প্রথম চারাগুলি দেখা যায় না—ঘোলাটে জলভরা ক্ষেতকে জলভরা পতিত জমির মত মনে হয়; দেখতে দেখতে ধানের চারাগুলি ঝাড় বেঁধে সবুজ হয়ে ক্ষেতকে ভরে দেয়। দূর থেকে তখন মানুষের চোখে ঠেকে তার সবুজ লালিত্য। চোখ জুড়িয়ে যায়। তার পাঠশালাটিও তেমনই ভাবে জমে উঠেছিল। সাহাপাড়া, স্বর্ণকারপাড়া,

কৈবর্তপাড়ায় সাড়া জেগেছিল। ঘরের মেঝে বারান্দা ভরে উঠেছিল ছেলেতে। কলর করে তারা পড়ত, সুর করে নামতা বলত—দুই-এক্কে—দুই, দুই-দুকুনে—চার, তিন-দুকুনে— ছয়। সে যেন একটা গান। পাড়ার লোকে বলত, পাঠশালায় পড়ছে। যাত্রীরা প' যেতে থমকে দাঁড়াত। যারা পড়তে জানে, তারা ওই সাইন-বোর্ডটা পড়ত—রত্নহাট সন্দীপন পাঠশালা ; শিক্ষক—সীতারাম পাল।

নয়

পরের দিনও লাঠি ছাতা এবং লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে ঠিক ভোরবেলায় উঠে রত্নহাটায় এল ভারাক্রান্ত হৃদয়েই এসে শ্যামু এবং দেবুকে পড়াতে বসল।

কিছুদিন হল শ্যামু বড় ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। দেবু এখনও বাড়িতে পড়ে। দশটার সম তাদের ছুটি দিয়ে সীতারাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। স্নানের তাড়া নাই পাঠশালা বন্ধ। চোখে তার জল এল, চোখের জল গোপন করার জন্যই সে তক্তপোশে উপর শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই সে আবার উঠে বসল। কিছুতেই সে শান্তি পাচ্ছে না হঠাৎ কি মনে হল—ভাঙা ঘড়িটা দেওয়ালে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়ে সেটাকে চালাবা চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলে সে। একবার ডাইনে ঠেলে, তারপর ঈষৎ বাঁয়ে ঠেলে, দেওয়া' এবং ঘড়িটার পিঠের মধ্যে খানিকটা কাগজ দিয়ে, পেণ্ডুলাম দুলিয়ে শব্দ শুনলে। হঁ্যা এইবার শব্দটা যেন অনেকটা এসেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে ঘড়িটার দিকে চলছে ঘড়িটা। তারপর বসল সে ছেঁড়া ম্যাপটা নিয়ে। খানিকটা ময়দার আঠা চাই, খানিকা পাতলা ন্যাকড়ার ফালি। তা হলে এটাও দাঁড়াবে

পণ্ডিত!

কে?

শিশুশ্রেণীর একটি ছাত্রকে কোলে করে এসেছে তার বিধবা মা। একবার হাতটি দে' দেখি পণ্ডিত। কাল রাত থেকে জ্বর। তা তুমি না দেখলে তো আমাদের হয় না বাবা দেখ একবার।

এই কয়েক বৎসরে সীতারাম এই একটি বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। সে নাড়ী দেখতে শিখেছে সর্দি-পিত্ত-বায়ু ইত্যাদির আধিক্যদোষও নির্ণয় করতে পারে!

কই, দেখি? দক্ষিণ হস্ত। ডান হাত কোন্‌টি হে? অ্যাঁ? যে হাতে ভাত খাও বাঃ। বাঁ হাত ছেলেটির কনুইয়ের ভাঁজের তলায় দিয়ে ডান হাতে সে নাড়ী টিপে ধরলে।

জ্বর যে অনেকটা—এক শো এক আন্দাজ হবে। মেবে দুদিন বাপু। পিত্তদোষ রয়েছে

ছেলেটি বললে, পাঠশালা বসবে না স্যার ?

ম্লান হাসি হেসে পণ্ডিত বললে, বসবে বৈকি। ভাল হয়ে ওঠ, উঠে চলে আসবে।

আমাকে টিপিনের ঘণ্টা বাজাতে দিয়েন স্যার।

দোব। তুমিই বাজাবে ঘণ্টা। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে মাস্টার বললে, ঠাণ্ডা যেন না লাগে।

সে আবার বসল ম্যাপটা নিয়ে। একটু ময়দার আঠা চাই, পাতলা ন্যাকড়া খানিকটা। বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য সে উঠল।

কে ? কে যেন উঁকি মারছে বাইরে থেকে !

আমি স্যার্। আকু এসে দাঁড়াল সামনে।

আকু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আকু দরজার বাজুটি ধরে তার উপরেই মুখটি রেখে বললে, পাঠশালা কোথা বসবে স্যার্ ?

পাঠশালা ?

হ্যাঁ !

সীতারাম চুপ করে রইল। কি উত্তর দেবে সে ? পাঠশালা বসবে না—এ কথা কিছুতেই তার মুখ থেকে বেরুতে চাচ্ছে না।

আকু বললে, আমি স্যার্, আপনার পাঠশালা ছাড়া আর কোথাও পড়ব না—কোথাও না।

বসো, এইখানেই বসো।

আকু বসল। একবার বইটা খুললে, তারপর উঠে এসে পণ্ডিতের পাশে বসল। ময়দার আঠা নিয়ে আসব স্যার্ ? আঠা দিয়ে জুড়ে দেন কেন। আনব আঠা ?

আনতে পারবে ?

হ্যাঁ। ঠিক নিয়ে আসব আমি।

বাবুদের বাড়িতে ধীরাবাবুদের মাকে বলবি, পণ্ডিত একটু ময়দার আঠা আর একটু ন্যাকড়া চাইলেন।

চলে গেল আকু। ছুটল সে। ব্ল্যাকবোর্ডের ভাঙা জোড়াটায় একটা পেরেক মারতে হবে। তা হলেই চলবে। দড়ি বাঁধলেও চলতে পারে। একটা পেরেক খুঁজে ফিরতে লাগল সীতারাম।

কে ? এ কি, আপনি ?

আকুর মা এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আকুর মা মানুষটি বড় ভাল এবং বিচিত্র। ছেলেকে আদর দিয়ে নষ্ট করার অশেষ

যোগ্যতার সঙ্গে আর একটি দুর্লভ যোগ্যতা তাঁর আছে। পৃথিবীর লোককে সুদুর্লভ আদর করতে জানেন; স্বভাবটা তাঁর ঠিক একটি মধুর হাঁড়ি এবং সে হাঁড়িটি গল্পের মধুদাদার দেওয়া অক্ষয় ভাণ্ডের মত অফুরন্ত। সেই অফুরন্ত মিষ্টরস যার জিহ্বায় ঢালতে শুরু করেন, তাকে শেষ পর্যন্ত তোতলা করে ছেড়ে দেন। আকুর মায়ের হাতে একটি বাটিতে খানিকটা ময়দার আঠা আর খানিকটা ন্যাকড়া। আকুর মা হেসে বললেন, সে কই?

আকু দেবুদের বাড়ির মধ্যে গিয়েছে, একটু আঠা আর—

আকুর মা আঠার বাটিটা নামিয়ে দিলেন, বললেন, আঠা এই নাও। সে তোমার বুঝি বাবুদের বাড়ি গিয়েছে? সে গিয়েছিল আমার কাছে। বলে, ময়দার আঠা চাই। আঠা করতে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি, আকু নিজের পোশাকী কাপড় দাঁত দিয়ে কাটছে। ও কি রে? না, মাস্টারের পাতলা ন্যাকড়া চাই। থাম্, থাম্। আমি দিই, আমি দিই। সে মানে না, বলে, এখুনি দাও। তখুনি বাক্স খুলে ছেঁড়া কাপড় বার করে কাপড় ছিঁড়ে দিই, তবে ক্ষান্ত। ওদিকে ময়দার আঠা পুড়ে গেল, আবার বসালাম আঠা। তা বললে, তবে তুমি দিয়ে এস। আমি যাই।

পণ্ডিত স্তব্ধ হয়ে রইল, এ কথার কোন জবাব দিতে পারলে না। আকু! চণ্ডালের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন নাকি শিব! এ কি তাই? চোখ ফেটে তার জল এল।

আকুর মা বললে, আকুর এই কাপড়খানি কিন্তু তোমাকে রিপু করে দিতে হবে পণ্ডিত। বেশি নয়। এই দাঁত দিয়ে একটু সবে কেটেছিল। তোমার হাতের রিপু বড় ভাল।

এই একটি বিদ্যা সীতারামের আছে। ছেলেবেলা থেকেই সে মাতৃহীন, বাপ চাষবাসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তখন থেকেই তার এ বিদ্যায় হাতেখড়ি হয়েছিল। জামার বোতাম সেলাই থেকে শুরু, ক্রমে ছোটখাটো ছেঁড়া সেলাই করত নিজে হাতে। এখন যেন এটাতে একটা শখ পড়ে গিয়েছে। মনোরমার হাতের সেলাই মোটা, তাদের সমাজে আপনার জনের মধ্যে জীবনের ধারা-ধরনটাই মোটা, সূক্ষ্ম জিনিসের প্রশংসা তারা করলেও ব্যবহার করবার মত ব্যগ্রতা নাই। কিন্তু সীতারামের সেটা পছন্দ হয় না। সেলাইয়ের কাজগুলি সে নিজেই করত। ক্রমে সেটা তার শখে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক-জীবনে এটা তাকে কিছু সাহায্যও করে; পাঠশালায় পড়ানোর অবসরে বসে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সে দামী কাপড় রিপু করে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে, তাতে সে আনন্দও পায়, আবার বিনিময়ে লোকের স্নেহও সে অর্জন করে।

পণ্ডিত বললে, দেবেন। করে দোব।

এই নাও, দিয়ে গেলাম। হলে আকুর হাতে তুমি দিও।

আচ্ছা।

এই যে! আকুর মা বললেন, এই যে, কোথা ছিলি? অ্যাঁ?

এদের ডাকতে গিয়েছিলাম। আকু এসে সামনে দাঁড়াল, দুপুর রৌদ্রে ঘুরে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আকুর পিছনে এসে দাঁড়াল তিনটি ছেলে—জ্যোতিষের ভাইপো, কৈবর্তদের গোপাল এবং হরিলাল। অভ্যাসমত একমুখ হেসে সে বললে, ডেকে নিয়ে এলাম সব।

তারপর ছেলেদের বললে, বসো, সব বসো। আজকে এইগুলো মেরামত করতে হবে।

সীতারামের মুখে কোনও কথা যোগাল না। ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে লেগে গেল মেরামতের কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিজেও তাদের সঙ্গে কাজে লাগল। ওদের প্রাণরসেই সে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

কানাই রায় এসে বললে, চান কর, খাও। বাড়িতে ঠাকুর ব্যস্ত হয়েছে। ভাত নিয়ে বসে থাকবে কত? তারপর সে ঘরের মধ্যে ঢুকে ম্যাপ মেরামত করা দেখে মুখ বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের পিচ কেটে বললে, আবার এই নিয়ে বসেছ? তোমার আর আক্কেল হবে না।

সীতারাম উত্তর দিলে না।

রায় এবার অত্যন্ত বিজ্ঞের মত ভঙ্গি করে কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে বললে, মা যা বললেন তাই কর সীতারাম। ভাল হবে। তাকে জমিদারির কাজে ঢুকিয়ে কানাই রায়ের কি সুবিধা হবে, সে সে-ই জানে। হয়তো তাকে ভালবাসে। কিংবা ভাবে সীতারাম নায়েব হলে তার অধিকার বাড়বে; সে-ই তো তাকে এনেছে এ বাড়িতে, কিংবা হয়তো আর কিছু। সীতারাম ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

উত্তর না পেয়ে কানাই রায় ক্ষুব্ধ হল, বললে, আবার একদিন এসে দেবে ছিঁড়ে।

উত্তর দিল আকু। বললে, আবার আঠা দিয়ে, ন্যাকড়া দিয়ে জুড়ব, নাকি স্যার? আবার ছিঁড়ে দেয়, আবার জুড়ব, নাকি ভাই? এবার সে বললে নিজের সঙ্গীদের।

তারা সকলেই বললে, হ্যাঁ।

কানাই রায় বলল, তাই কর। ছেঁড়া কাঁথার মত সেলাই-ই কর, সেলাই-ই কর, সেলাই-ই কর।

*　　*　　*　　*

কানাই রায় সত্যিই দুঃখিত হয়েছিল। সীতারামকে সে ভালবাসে এবং তার উপর একটা অধিকারের দাবি সে মনে মনে পোষণ করে। সে দাবি কিন্তু তার গোপন দাবিতে পরিণত হয়েছে। তাকে প্রকাশ করতে সে সাহস করে না। প্রথম দিন যখন সীতারাম বাড়িতে এল এবং মা-ঠাকরুন যখন তাকে বসবার জন্যে আসন দিতে বললেন, মুখে বললেন, তুমি হলে এ বাড়ির ছেলেদের শিক্ষাগুরু, সেই দিন সেই মুহূর্তেই বোধ করি তার দাবিকে সে সসঙ্কোচে গোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর থেকে এই কয়েক বৎসর সে দেখছে, সীতারাম আর তার মধ্যের পার্থক্য ক্রমে বেড়েই চলেছে। সীতারামের কথাবার্তা

রসিকতা সব আলাদা। অথচ সীতারামের সঙ্গে বিবাদ-কলহেরও অবকাশ নাই। সীতারাম তাকে অবহেলা করে না। সীতারামের কাজকর্মের প্রসঙ্গের মধ্যে কোন তর্ক তোলবার তার অবকাশ নাই। মনে মনে সে দুঃখ পেত। তাই আজ মা যখন তাকে জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করবার জন্য বললেন, তখন সে এই কারণেই খুশী হয়েছিল, সীতারাম তার নাগালের মধ্যে আসবে। হোক না কেন নায়েব, কানাই রায়ের পরামর্শ তাকে নিতে হবে। তাই সে এখানেই ক্ষান্ত হল না, বিকেলবেলায় সীতারামের বাড়িতে গিয়ে কৃষাণ-বউ মারফৎ মনোরমাকে সে তার সৎপরামর্শগুলি জানিয়েও এল। সীতারামের পণ্ডিতদাদাকে বললে। জনকয়েক প্রবীণকেও জানালে।

"সীতারামকে বল তোমরা। তোমাদের আপনার জন। ছোকরার ভাল হবে। তা ছাড়া, তোমাদের নিজের লোক যদি নায়েব হয়, তবে, ধর গিয়ে, তোমাদেরও সুবিধে।"

কথাটা সকলেরই মনে লাগে। কানাই রায়ের মত গোপন এবং অজানিত ক্ষোভ খানিকটা সকলেরই ছিল। হঠাৎ বাড়ির একটা ছেলে যদি গেরুয়া পরে ব্রহ্মচারী সেজে বসে, তবে যেমন অস্বস্তি অনুভব করে মানুষ, তেমনই অস্বস্তি অনুভব করত সকলে।

রাত্রে বাড়ি ফিরতেই কৃষাণ-বউ আরম্ভ করলে, বলি হ্যাগো মুনিব মাশায়!

ভাঙাচোরা জিনিসগুলি জোড়া দিয়ে সীতারামের মন খুব প্রসন্ন ছিল আজ। কানাই রায় বলেছিল, ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করার মত জোড়া দিচ্ছে সীতারাম। হ্যাঁ, জোড়া সে দিয়েছে, জোড়ের দাগ রয়েছে এবং থাকবেও, কিন্তু নির্জীব প্রাণহীন কাঁথা জোড়া সে দেয় নাই। মানুষের দেহে চোট লাগে, মাংস কাটে, হাড় ভাঙে, তাকে জোড়া দিলেও দাগ থাকে, কিন্তু দাগ থাকলেও সে আবার কার্যক্ষম অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিণত হয়, সে কাজ করে, সে পুষ্ট হয়, সে বাড়ে। এ জোড়া দেওয়া তার সেই জোড়া দেওয়া। আবার তার পাঠশালা বসবে, পাঠশালা বড় হবে, পাঁচটি থেকে দশটি, দশটি থেকে পনেরোটি কুড়িটি পঁচিশটি ছেলে হবে। সে পড়াবে—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।"

কৃষাণ-বউ আবার বললে, বলি ও মুনিব মাশায়। শুনতে-টুনতে পেচ্ছ-টেছ না, নাকি গো? কানে-মানে খাটো-মাটো হলছ নাকি?

সীতারাম হেসে বললে, ব্যক্ত কর, কি বক্তব্য?

ওই দেখ। কটমট কথা-টথা আমি বুঝতে-টুঝতে লারি বাপু।

বলছি, কি বলছেন বলুন?

বলছি, বাবুরা তোমাকে লায়েব-টায়েব করতে চাইছে, তা তুমি লেবে না টেবে না বলছ কেনে?

—সে তুমি বুঝবে না। মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে না।

মনোরমা হেসে সবিনয়ে বললে, তুমি পণ্ডিত মানুষ, বুঝিয়ে বললে বুঝতে পারবে না কেনে? বুঝিয়ে বল।

সীতারাম তার মুখের দিকে চাইলে সবিস্ময়ে। মনোরমা তো এমন নয়। সামান্য পাঠশালার পণ্ডিত সে, কিন্তু মনোরমা তো তাকে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পণ্ডিত বলে মনে করে। তার অহঙ্কারে মাটিতে মনোরমার পা পড়ে না। সীতারাম যা বলে, তাই তো তার ধ্রুব সত্য। তবে? মনোরমার কথার মধ্যে যেন আজ নতুন সুর বাজছে।

মনোরমা বললে, পাঠশালার পণ্ডিতের চেয়ে নায়েববাবু হবে, চাপরাসী লগ্‌দী পেজা সবাই পেনাম করবে, খাতির করবে; গাঁয়ে তোমার কত খাতির হবে। ধরে আন্ অমুককে, জোড়হাত করে সে এসে দাঁড়াবে। নবান-লক্ষ্মীতে লোকে ঘটি ঘটি দুধ দেবে; মেয়ের বিয়ের সময় চাঁদা চাও, লোকে চাঁদা দেবে।

কৃষাণ-বউ বললে, জমি-টমির জল-টল নিয়ে নিচ্ছিন্দি। কেউ আর আল-টালের ধার-টার দিয়েও যাবে না। ঘরে শুয়ে মজা করে নাকে ত্যাল দিয়ে ঘুমাও, হ্যাঁ।

মনোরমা বলেই যায়, ষষ্ঠীপুজোয় পুরুত আগে পুজো করে দেবে। লক্ষ্মীপুজোয় নবানে ঠাকুরদের ভোগ আমাদেরই আগে হবে। পুরুত বুড়ো বলবে, নায়েব-গিন্নীর পুজো আগে সেরে দি, দাঁড়াও বাপু!

সীতারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাসলে, বললে, না।

ভোরবেলাতেই দেখা হল পণ্ডিতদাদার সঙ্গে। শান্ত মানুষটি বললে, কাল রাত্রে আর গেলাম না। কানাই রায় এসেছিল। বলছিল—

সীতারাম বললে, না দাদা, সে আমি পারব না।

পণ্ডিতদাদা নিজে পাঠশালার পণ্ডিত, আদায়ের সময় জমিদার-সেরেস্তাতেও গিয়ে বসে। প্রথম প্রথম সে যখন বসত, তখন তারও মন বিরূপ হয়ে উঠত, কিন্তু তবু তাকে যেতে হত। বারোয়ারি কালীতলায় পাঠশালা বসে, জমিদারই তার সেবাইত হিসাবে মালিক, সেই বাধ্যবাধকতায় গোমস্তা তাকে ডাকত আদায়ের হিসাব-নিকাশে সাহায্যের জন্য। আর গ্রামের লোকেও এটা পছন্দ করত, তারা বিশ্বাস করত তাদেরই গ্রামের ছেলের কথা হিসাবে ভুলের প্যাঁচ থাকবে না। পণ্ডিতদাদা সীতারামের বিতৃষ্ণা বুঝতে পারলে, সে একটু নীরব হয়ে রইল, তারপর বললে, হুঁ। তা পণ্ডিতি করে আর ওসব ভাল লাগে না। তা ছাড়া বড় পাজী কাজ, দশজনের সঙ্গে হাঙ্গামা, সে হবেই। তা বেশ। তা—

আবার একবার থামল পণ্ডিতদাদা, তারপর বললে, কিন্তু পুলিস যখন হাঙ্গামা একবার করলে, তখন—আবার কি পাঠশালা করা ঠিক হবে?

সীতারাম বললে, দেখি।

তা আমি তো চলে যাব। শ্বশুর বলেছেন—বুড়ো হয়েছি, এইবার দেখেশুনে নাও, তা তুই গাঁয়েই আমার পাঠশালা নিয়ে বসে যা।

পণ্ডিতদাদা শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পাচ্ছেন। সেখানে যাবেন।

সীতারাম বললে, তোমার মেজভাইকে বসিয়ে দাও পাঠশালায়। আমি দেখব, ওখানেই—ওই রত্নহাটায়ই দেখব দাদা। বারণ করো না তুমি। তার জেদ চেপেছে; সে দেখবেই।

দাদা বললে, এটা তোর খ্যাপামি। সেও পাঠশালা, এও পাঠশালা। তাতে এখানে যদি নিরাপদে থাকিস, ঘর বার তুই চলে, তবে ওই পাঠশালার ওপর এত ঝোঁক কেনে?

এ কথার উত্তর দিলে না সীতারাম।

দশ

দাদার কথার উত্তর দিলে না সীতারাম। রত্নহাটার সন্দীপন পাঠশালার উপর তার আশ্চর্য মমতা। পৈতৃক ভিটের উপর মানুষের যেমন একটা আকর্ষণ থাকে, তেমনই প্রবল তার এ আকর্ষণ। অনেক সময় ভেবেছে, গ্রামেই যদি 'সন্দীপন পাঠশালা' নাম দিয়ে পাঠশালা করে, তবে গোল বোধ হয় মিটে যায়। কিন্তু না। মনের মধ্যে কেমন যেন খচখচ করছে। কিছুতেই মনঃপূত হয় নাই। সন্দীপন পাঠশালা যদি রত্নহাটায়ই না থাকে, তবে আর সন্দীপন পাঠশালা কিসের? এ গ্রামের সন্দীপন পাঠশালায় ধীরাবাবু—মণিবাবু এদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না।

জীবনে তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, নর্মাল পাস করে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে সে বিদেশে যাবে। সেখানে বাসা করবে, মনোরমাকে নিযে যাবে। শিক্ষিত সমাজে স্থান পাবে, কত মহৎ লোকের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হবে, তাদের সাহচর্যে কত নতুন শিক্ষালাভ করবে! ছুটিতে গ্রামে ফিরে আসবে সপরিবারে। গ্রামের লোকে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, হাসিমুখে কুশল প্রশ্ন করবে। গুরুজনদের সে প্রণাম করবে, বন্ধুজনকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরবে, কনিষ্ঠদের সস্নেহে আশীর্বাদ দেবে। গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুদের প্রীতিসম্ভাষণ, কনিষ্ঠদের প্রণাম—সমস্ত কিছুর মধ্যে আরও কিছু থাকবে; মানুষের জীবনে সেইটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ কাম্য। থাকবে শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়। গুরুজনে বলবে, হ্যাঁ, তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ। ছেলেদের বলবে, দেখ, সীতারামকে দেখে শেখো। বন্ধুজনের প্রীতিসম্ভাষণের মধ্যেও স্বীকৃতি থাকবে, ভাই তুমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠদের প্রণামের মধ্যে অকথিত কামনা থাকবে, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার মত হতে পারি।

সে আশা তার আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়েছে। ভাগ্যও বটে, আবার নিজের অক্ষমতাও

সে স্বীকার করে। তাই তো সে জীবনে তার সামর্থ্য ও যোগ্যতার উপযুক্ত পাঠশালার পণ্ডিতের পদ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে। গ্রাম ছেড়ে রত্নহাটায় পাঠশালা করেছে, তার কারণ এই গ্রামের চেয়ে রত্নহাটায় সমাজের মর্যাদা অনেক বেশি। শিক্ষিতের সমাজ, মর্যাদাবান বিত্তশালীর সমাজ রত্নহাটা। তা ছাড়া, এতে তার বিদেশে চাকরি করার সাধ আংশিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। ভোরে উঠে যায়, রাত্রি দশটায় ফেরে, সপ্তাহে সোমবার থেকে শনিবার—এই ছটা দিন গ্রামবাসীর কাছে সে বিদেশবাসীরই সমান। তাদের সঙ্গে দেখা হয় রবিবারে। রবিবার দুপুরবেলা, গ্রাম্য মজলিশে গিয়ে বসে, রত্নহাটার গল্প করে। তাদের জমিদারবাড়ির গল্প, রীতি-নীতির কথা, তাঁদের অভিজাতসুলভ মর্যাদাজ্ঞানের কথা বলে, মণিবাবুর গল্প করে, বড় ইস্কুলের সংবাদ বলে, সেখানকার সমাজে দেশদেশান্তরের যে সব সংবাদ আসে, সে সবও বলে। তারা খানিকটা বিস্মিত হয় বৈকি। মুগ্ধ হয়ে শোনে। আবার বাজারদরের কথাও বলে, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ধান-চালের নির্ভুল দর তাদের জানায়। তাদের কাজে লাগে। আবার জানায়, রত্নহাটায় এবার মোটরকার আসছে, বড় ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রত্নহাটার বড়-বাবুরা এবার কলকাতায় মোটর গাড়ি কিনে ফেলেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই আসছে। আরও বলে, শিবকিঙ্করদের মত বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে তার বিরোধের কথা! বলে, আমি ওসব বাবুদের কেয়ার করি না। এই সবের মধ্যে তার বিদেশে চাকুরির আকাঙ্ক্ষা খানিকটা মেটে।

এছাড়া এতদিন রত্নহাটায় পাঠশালা করে আরও একটা আকর্ষণ তার হয়েছে। আজ কয়েক বৎসরই পাঠশালা করছে সে। রত্নহাটার ছেলেদের সে ভালবেসেছে। যে সব গৃহস্থের ছেলে পড়ে, তাদের সঙ্গেও তার একটা ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ হয়েছে। প্রথম সে স্বর্ণকার এবং কৈবর্তদের ছেলে নিয়েই পাঠশালা করেছিল অনেকটা জেদের বশে। বড় ইস্কুলের হেডমাস্টার তাকে ঠাট্টা করেই বলেছিলেন, ওদের নিয়েই পাঠশালা করগে, পুণ্য হবে—অজ্ঞানদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার পুণ্য হবে। সেই কথাটায় সে অনেকটা জেদের বশে তাদের নিয়েই পাঠশালা করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আশাও করেছিল, এদের ছেলেদের, যাদের ওই বড় ইস্কুলের পণ্ডিতেরা অবহেলা করে, অবজ্ঞা করে, তাদেরই কৃতী করে তুলে সে নিজের শিক্ষকতার কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রাণপাত করে পড়াবে সে। বৎসর বৎসর এদের ছেলেদেরই বৃত্তি পাওয়াবে সে। আপনার মনেই সে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে নিত। নর্মাল ইস্কুলে পড়বার সময় সে শিক্ষকদের কাছে শুনেছিল পণ্ডিত বোপদেবের সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প। বোপদেবের শিক্ষক তাঁর স্থূলবুদ্ধির জন্য হতাশ হয়ে বলেছিলেন, তার কিছু হবে না। বোপদেব মনের দুঃখে দেশত্যাগ করে চলেছিলেন। পথে তিনি এক সরোবরের বাঁধানো ঘাটে বসেছিলেন বিশ্রামের জন্য। সেখানে দেখলেন পাথর কেটে ছোট ছোট বাটির আকারে গর্ত করা রয়েছে। বোপদেব আশীর্বাদ করলেন সরোবরের

মালিককে। দীর্ঘজীবী হোন তিনি। সুবিবেচক মালিক, নিঃস্ব পথিকদের খাবার জন্য চমৎকার জায়গা করে রেখেছেন। যাদের সঙ্গে থালা বাটি গেলাস নেই, তারা অনায়াসে পরমানন্দে এই পাথর-কাটা আধারে ভিজিয়ে থিতিয়ে খেতে পারবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তাঁর ভ্রম ভাঙল। দেখলেন, নগরের মেয়েরা এসে কলসীতে জল ভরে সেই গর্তগুলির উপর বসিয়ে রেখে স্নান করতে লাগল। তখন তিনি বুঝলেন, এই গর্তগুলি মালিক তৈরি করান নাই, দিনের পর দিন একই স্থানে কলসী রাখার ফলে ওই কলসীর ঘর্ষণে সৃষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত তাঁর মনে হল, পাথর যদি ক্ষয় হয় এইভাবে নিয়মিত ঘর্ষণে, তবে তাঁর বুদ্ধি, সে হোক না কেন যত স্থূল, তাই বা অধ্যবসায়ের ফলে নিয়মিত পাঠাভ্যাসে কেন তীক্ষ্ণ হবে না? সেইখান থেকে তিনি ফিরলেন দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে। তার ফলেই বোপদেব ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত মুগ্ধবোধপ্রণেতা বোপদেব হলেন।

এই গল্প মনে করে সে ওদের কৃতী ছাত্র তৈরী করবার জন্য পরিশ্রম করতে আরম্ভ করেছিল। ছাত্রেরা কেউ কৃতী হতে পারে নাই, তার আশা সফল হয় নাই। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে সে ওই ছেলেগুলির সঙ্গে, তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে বিচিত্রভাবে ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে। তারা তাকে ভালবাসে, কতখানি ভালবাসে, সে তার হিসেব করে না, কিন্তু তার ভালবাসার পরিমাণ সে জানে। তারা তাকে দলিল লিখতে, দরখাস্ত লিখতে ডাকে, বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হলে নাড়ী দেখতে ডাকে, রেশম-পশমের কাপড় রিপু করতে দেয়, তার স্বার্থও আছে, ভালাবাসাও আছে। তার প্রকাশ হয় তাদের সাদর সম্ভাষণের মধ্যে, নবান্নে লক্ষ্মীপূজায় তারা মিষ্টান্ন দেয় তার মধ্যে। কৈবর্তরা মিষ্টান্ন দেয় না, মধ্যে মধ্যে কাঁচা মাছ-তরকারি দিয়ে ভালবাসার প্রকাশ জানিয়ে যায়। সীতারামের এই ভালবাসা এক বিচিত্র পরিণতি লাভ করেছে। তার সাধ, তার আকাঙ্ক্ষা—ওদের ছেলেদের এক-জনকেও অন্তত সে লেখাপড়ার সত্যকার আস্বাদ দিয়ে শিক্ষিত মানুষ করে তুলবে।

সাহা-স্বর্ণকারদের ছেলেরা পড়ে, খানিকটা লেখাপড়া শিখতে হয়, না শেখাটা লজ্জার কথা বলে শেখে। পাঠশালার পড়া শেষ করে বড় ইস্কুলে কয়েক ক্লাস কোন রকমে পার হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে নিজের নিজের ব্যবসায়ে লেগে যায়। কৈবর্তের ছেলেদের পড়া পাঠ-শালাতেই শেষ। নেহাৎ শখের ব্যাপার। পাঠশালার পড়াটাও শেষ করে না। বারো তেরো বছর বয়স হলেই হাল গরু চাষ নিয়ে পড়ে, যারা জেলেকৈবর্ত তারা জাল ঘাড়ে মাছ-ধরা ব্যবসায়ে লেগে যায়।

এই তো সেদিন, ঢুকড়ি জেলের ছেলেটা পাঠশালা ছেড়ে দিলে। ছেলেটা মন্দ ছিল না। আর এক বৎসর হলেই পাঠশালার পড়াটা শেষ হত। হঠাৎ জাল ঘাড়ে করে এসে প্রণাম করে একটি মাছ দিয়ে দাঁড়াল নির্লজ্জ হাসিমুখে।

সীতারাম বললে, কি রে?

ছেলেটার বাপ দুকড়িও এসেছিল, সে বললে, পণ্ডিত মশায়, আজ থেকে ছেলেকে জাতব্যবসা ধরালাম গো।

আর পড়বে না ?

না। মাথা চুলকে দুকড়ি বললে, আমাদের ছেলে আর পড়ে কি করবে গো ? ক'য়ের পেছুতে খ দিতে শিখেছে এই ঢের। জলকরের দলিলে সই দিতে পারবে, দেখে লিতে পারবে দলিল, এই ঢের। বাস্।

কৈবর্তদের লেখাপড়া শেখার সামান্য চেষ্টার পেছনে শখের সঙ্গে ওই একটা তাগিদ আছে। ভদ্রলোকদের কাছে ওরা পুকুর জমা নিয়ে থাকে; জমিদারদের কাছে নেয় নদীর জলকর জমা। আগে কারবারটা চলত নিছক বিশ্বাসে। মৌখিক কথাবার্তা হত, ওরা দিয়ে আসত খাজনার টাকা, এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গুনতে পারত—এককুড়ি, দুকুড়ি থাক্ সাজিয়ে টাকা দিয়ে জলকর-মালিকের পায়ের ধুলা নিয়ে চলে আসত। কাল এখন পালটেছে। এখন আর মুখের কথায় বন্দোবস্ত হয় না, দলিল—'ডেমি' কাগজে দুখানা দলিল হয়, টাকা দিয়ে রসিদ নিতে হয়। তাও প্রথম ওরা টিপছাপ দিয়ে রসিদ নিয়ে চলে আসত সরল বিশ্বাসে, কিন্তু কাল যত এগুচ্ছে তত গোলমাল বাড়ছে, আজকাল দলিল রসিদে গোলমাল বেরিয়ে পড়ছে; কয়েক ক্ষেত্রে ওদের টাকা জলে পড়েছে। তাই নাম সই আর দলিল পড়তে পারবার মত লেখাপড়াটুকু মাত্র শিখতে চায়, তার বেশি নয়। তাতে সীতারামের পাঠশালার খুব বেশি ক্ষতি হয় না। আর এক বছর পড়লে, সে এক বছরের মাইনেটা পেত, সেইটা পায় না এইটুকু মাত্র ক্ষতি। কিন্তু সীতারাম সে লাভ-ক্ষতি খতায় না। সে ওদের ভালবেসেছে, তাই সে চায়, ওদের একজনও সত্যকারের লেখাপড়া শিখুক, ক'য়ের পিছুতে খ দিতে শেখাটাই ঢের লেখাপড়া নয়—এই কথাটা সে ওদের বুঝাতে চায় অন্তত একজনকে শিক্ষিত করে তুলে। সাঁওতালরা ক্রীশ্চান হয়ে লেখাপড়া শিখে ডেপুটি হয়েছে, সে শুনেছে। শুনেছে, এই সব ছোট জাত বলে যারা পরিচিত, তারা লেখাপড়া শিখলেই গবর্মেণ্টের ঘরে ভাল চাকরি পায়। কোনরকমে একজনকেও যদি সে সেই রকম ক'রে তুলতে পারে, তবে তার আশা পরিপূর্ণ হয়। শিবকিঙ্কর বলেছিল সেই প্রথম দিন, চাষা, চাষা পণ্ডিত, শুঁড়ি ছাত্র, জেলে ছাত্র! হা-হা করে হেসেছিল। তার সেই ব্যঙ্গের, তার সেই হাসির উপযুক্ত জবাব হয় তাহ'লে।

রত্নহাটার সন্দীপন পাঠশালা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। নায়েবি তো সে করবেই না। নায়েবি! মানুষের উপর অত্যাচারের কাজ নায়েবি। মানুষকে ঠকানোর কাজ নায়েবি। নীচ কাজ। সে তা করবে না। রত্নহাটা ছেড়ে গ্রামে পাঠশালাও করে তার তৃপ্তি হবে না।

সকালবেলা যথানিয়মে সে রত্নহাটা চলেছিল। হঠাৎ পিছন থেকে একটা কথা কানে এল,

রত্নহাটার পণ্ডিত-রত্ন চলেছেন।

পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে না সে, তবু গলার আওয়াজ থেকে বুঝতে পারলে, কথাটা বলেছে তারই বন্ধু চণ্ডী। চণ্ডী এখন গ্রামে ডাক্তার সেজে বসেছে। ওই রত্নহাটার ডাক্তারখানায় দিন-কতক কম্পাউণ্ডারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে কাজ করছিল; সেখানে সুবিধে করতে না পেরে, গ্রামে এসে ডাক্তার সেজে বসেছে। তার কথা শুনে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলে সীতারাম। চণ্ডী রত্নহাটায় ঠাঁই পায় নাই, তাই সীতারামের উপর ঈর্ষা; সীতারাম ঠাঁই পেয়েছে।

অন্য একজন বললে, তা বাপু চালাচ্ছে তো গোজামিল দিয়ে।

চণ্ডী বললে, এইবার গোঁজা টেনে বার করে ফেলেছে পুলিস সাহেব। আর পাঠশালা করতে হবে না।

সীতারাম একটু জোরে হেঁটে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল।

কিন্তু পাঠশালা বসাবে কোথায়?—এই চিন্তাটাই তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। বাবুদের কাছারির বারান্দাটা পেতে পারে সে। কিন্তু ওখানে পাঠশালা করতে কেমন তার মন চাইছে না। ওই উপপদ-তৎপুরুষ, ওই মধ্যপদলোপী—কানাই রায়, ট্যারা নায়েব দশ কথা বলবে, ঠাট্টা করবে, ছেলেদের ধমক দেবে, ছেলেরা গোলমাল করলে বিরক্ত হবে। ছেলেরাও ওখানে যেতে কেমন সঙ্কোচ অনুভব করে ভয় পায়। ওদের হাজার উদারতা, অসীম অনুগ্রহ, ধারাবাবুর বৈচিত্র্য, মায়ের মিষ্টি স্নেহ, সব সত্ত্বেও বাবুদের আপনার ভাবতে পারে না, তাদের উপর মনের বিরূপতাকে কিছুতেই দূর করতে পারে না সে। তা ছাড়া রজনীবাবু তাকে ধীরাবাবুদের বাড়ির সংস্রব ছাড়তেই বলেছেন, তা অবশ্য সে ছাড়বে না, অকৃতজ্ঞ সে হবে না। তবে এমন ক্ষেত্রে ধীরাবাবুর বৈঠকখানাতেই পাঠশালা বসানো কোন ক্রমেই উচিত হবে না। তা ছাড়া ওঁরা হলেন সিংহ। হাসে সীতারাম।

কিন্তু জায়গা যে সে কোথাও পাবে না। পুলিসের এই হাঙ্গামার পর ঘর ভাড়া তাকে কেউ দেবে না। তবে?

সে থমকে দাঁড়াল। মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। দুঃখের হাসি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে জলও এল। ভাবনার মধ্যে সে অন্যমনস্ক হয়ে বাবুদের বাড়ি না গিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে পাঠশালা বাড়ির দরজায়। দরজার মাথায় সাইনবোর্ডটা এখনও ঝুলছে।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরল। আবার দাঁড়াল। রাস্তার এপাশে পাঠশালা-বাড়ি বিপরীত দিকে একটা বাঁধানো অশ্বত্থগাছতলায় ছেলেরা খেলা করছে। ছায়াঘন গাছটার তলাটা ঘাস গজায় না ছায়ার জন্য। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল শান্তিনিকেতনের কথা। শান্তিনিকেতনে আমগাছের ছায়ায় ইস্কুল বসে। সে দেখেছে। সে শোভা অপরূপ!

মুহূর্তে তার মনের সকল অবসাদ কেটে গেল। এইখানে সে পাঠশালা বসাবে। ক

াসতে দেরি আছে। বর্ষার সময় এইখানেই সে চালা তুলবে। সে জানে, এ জায়গাটা ীরাবাবুর জাঠতুত দাদার। গাছটি তাঁর মায়ের প্রতিষ্ঠা করা গাছ। ধীরাবাবুর মাকে বলে ই গাছতলাটা সে খাজনায় বন্দোবস্ত করে নেবে। প্রয়োজন হয় শর্ত করে দেবে—প্রতিষ্ঠা রা গাছে তার কোনও অধিকার থাকবে না। গাছের তলাটি বাঁধানোই রয়েছে, সামনেটা ারও খানিকটা বাঁধিয়ে নেবে। পুরনো সন্দীপন পাঠশালার কাছেই, সাহাপাড়া স্বর্ণকার-াড়া কৈবর্তপাড়া, যাদের ছেলেদের নিয়ে তার কারবার, তাদের মধ্যেই এইখানে এই াছতলায় সে পাঠশালা আরম্ভ করবে। মন সে স্থির করে ফেলল।

* * * *

কিন্তু এতেও বাধা পড়ল। ধীরাবাবুর জাঠতুত দাদারা গাছতলাটা দিলেন, পাঁচ টাকা মস্কারা দিলে সীতারাম; ঘর তুলে খাজনা দিতেও রাজী হল; বাধা সেখানে পড়ল না, বাধা লে অষ্টাবক্র গোবিন্দ বৈরাগী, হঠাৎ সে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল।—ও আমি দোব না। িছুতেই না—ও জায়গা আমার।

গোবিন্দ জন্মাবধি বিকৃতাঙ্গ। হাত-পাগুলো কেমন বাঁকা, অসমান; বিচিত্র তার দেহের ড়ন; একটা পা ছোট—একটা পা বড়; মুখের চেহারাও তাই, নাকটা বসা—থুৎনীটা ঁপা। আর তেমনি তার ক্রোধ। লোকটি ভিক্ষে করে খায়। একসময় সে ওই গাছতলায় কটা কুঁড়ে বেঁধে কিছুদিন বাস করেছিল। কোন অনুমতি নেয় নি, এঁরাও অনুমতি দেবার য়োজন অনুভব করেন নি। কিছুদিন পর কুঁড়েটা একটা ঝড়ে উড়ে গেল—তখন সে ালপাতা কেটে ছাইয়েছিল—কিন্তু বর্ষার জল তালপাতার ছাউনিতে আটকায় নি—বর্ষাতে রখানা পড়ে গিয়েছিল। গোবিন্দও আর ঘর করবার চেষ্টা করে নি; জায়গাটা ছেড়ে সে খানে ওখানে এব ওর দাওয়ায় বাস করে। সে এসে দাঁড়াল—একেবারে লাঠি হাতে—ও ায়গা আমার, মাথা ফাটিয়ে দোব আমি। বেশি চালাকি করলে মণিবাবুকে বেচে দোব। া।

মণিবাবুর নাম শুনে সীতারাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে খপ করে গোবিন্দের হাতখানা চেপে লে। বললে—মুচড়ে তোর হাতখানা ভেঙে দোব আমি।

গোবিন্দের দেহ বিকৃত—মনও বোধ হয় তাই। পৈত্রিক পাপের শাস্তি বহন করতে তার ম। দুরন্ত তার ক্রোধ। সে ক্রোধে চিৎকার করে উঠে তার হাত কামড়ে ধরলে। কিছু-ণের মধ্যেই দাঁতে কামড়ে খানকটা মাংস কেটে নিয়ে মুখ তুললে; তখন তার দাঁতের পাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। সীতারামের হাতের ক্ষত থেকেও অনর্গল রক্ত ঝরছে। সীতারাম বাক হয়ে গিয়েছিল।

গোবিন্দ নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেল—নিজের এই কাণ্ডে। সেও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ল। কানাই রায় এসে ধরলে তার ঘাড়ে।—হারামজাদা! রাক্ষস!

গোবিন্দ, বর্বর গোবিন্দ হতবাক্ হয়ে গিয়েছে। সে তাকিয়ে দেখছিল—সীতারামের হাতের রক্ত। কানাই রায় ঘাড়ে ধরতেই সে বললে—তা বটে, তা বটে, রাক্ষসের মত কাজই আমি করেছি। মার, তোমরা আমাকে মার।

সীতারাম বললে—না। ছেড়ে দাও কানাই কাকা। ছেড়ে দাও। বেচারা হঠাৎ করে ফেলেছে। আমি বুঝতে পেরেছি। ছেড়ে দাও।

গোবিন্দ হতবাক্ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বললে—আমি ভিখিরী, বোষ্টম জায়গাও আমার নয়। কিন্তু পরের মন্ত্রণায়—।

বার বার আক্ষেপভরে মাথা নাড়লে সে। তারপর হাত জোড় করে বললে—তুমি ওখানে পাঠশালা কর গিয়ে ভাই। হিয়ে খোসলে বললাম আমি। ছি-ছি-ছি! কি করলাম আমি! বল দিকিনি। রাধাকৃষ্ণ! এবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

সীতারাম তাকেও পাঁচটি টাকা দিলে। বললে—আমি দিচ্ছি তোমাকে। খুশী হয়ে দিচ্ছি

গোবিন্দ টাকা ক'টি নিয়ে বললে—তা হলে ভাই আমার টিপ ছাপ নিয়ে একটা নিবে নাও। নইলে বুঝছ তো—মন না মতিভ্রম! এ গেরামকেও তো জান। আর—। ভাই।

থেমে থেমে সঙ্কোচ করেই সে বললে—চালা তো একটা তুলবেই সীতারাম, সেখানে যদি রাত্রিটা তাকে শুয়ে থাকতে দেয়—তা হলে সে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। এর জন্যে সে তার পাঠশালা ঝাঁট-পাট দিয়ে দেবে। কলসী করে জলও আনবে ছেলেদের জন্য।

বেশ তো। হাসলে সীতারাম।

এগারো

অশ্বত্থতলায় পাঠশালা বসল সীতারামের। ঘড়ি, ম্যাপ, বোর্ড এসব আসবাব ঘরে বন্ধ রইল। গাছটার কাণ্ডতে খড়ি দিয়ে লিখে দিলে—'রত্নহাটা সন্দীপন পাঠশালা'। মাত্র পাঁচটি ছেলে।

লোকে অবাক হল। অনেকে বললে, লোকটা পাগল! হয়তো পাগল; সীতা হেসে বললে—পাগল তোমরা সবাই। একটা না একটা পাগলামি না হলে কাল কাটবে করে! ধীরাবাবুর জেলখাটা পাগলামি, এ গাঁয়ের অন্য বাবুদের—কারও আছে জমিদা দাপট ফলানো পাগলামি; শিবকিঙ্করের মদ খাওয়া পাগলামি, আমার পাঠশালা পাগলামি।

গোবিন্দ বৈরাগী বললে—ভাল বলেছ সীতেরাম, ভাল বলেছ।

সে সকালেই এসেছে। বসে আছে গাছতলাতে। নিজেই একটা ঝাঁটা যোগাড় ক ঝাঁট-পাট দিয়েছে, একটা কলসী করে জল এনে ছিটিয়ে দিয়েছে, খানিকটা গোবরও কুড়ি

া করেছে। এ বেলায় পাঠশালা ভাঙলে—সে নিকিয়ে দেবে জায়গাটা।

সীতারাম খুব খুশী হয়ে তার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিল—তুমি কেন এত খাটতে গেলে বাঁকা ?। অষ্টাবক্র গোবিন্দকে অনেকে বলে বাঁকা চাঁদ। গোবিন্দ ও-নামটাতে খুশী হয়। গোবিন্দ লে—করলাম আমার খুশি!

তুমি কি সেই কথা মনে করে রেখেছ গোবিন্দ?

করে যখন ফেলেছি পণ্ডিত তখন ভুলব কি করে বল? তবে সে কারণে আমি কাঁর ই। বুয়েচ কিনা। তোমাকে কামড়ে রক্তপাত করেছি, তুমি না হয় মাথা ফাটিয়ে দেবে। র লেগে লয়। বুয়েচ এ ক'দিন যত ভাবলাম তোমার কথা তত ভাল লাগল তোমাকে। কে চুরি করে, নষ্ট কাজ করে, লোককে ঠকায়, মারে ধরে, কত কি করে, তুমি এই ছেলে-ানকে নিয়ে পড়াবে! তাতেও কত বেঘটন, কত লোকের কত রোষ! তাই, তাই, ভালবেসে লাম।

হাসতে লাগল গোবিন্দ।

তারপর বললে,—চালাখানা তোল তুমি। আমিও তোমার এখানেই ডেরা নোব। বুয়েচ আমিও হব তোমার পাঠশালার একজনা।

সীতারাম এবার প্রাণ খুলে হাসলে, বললে, পড়বে তুমি?

তা পড়লে হয়। আকু আমি একসঙ্গেই পড়ব। আমি ফাষ্টো, আকু সেকেন। নাকি রে কু? তবে পড়ব না আমি। আমি হব তোমার ইস্কুলের সেকেন মাস্টার। ঘণ্টা বাজাব, ঝাঁট-ট দোব। তুমি না থাকলে বাছুরগুলানকে আগলাবো, বুয়েচ!

ঠিক এই সময় শিবকিঙ্কর এসে রাস্তার উপর দাঁড়াল। ঠিক খবর পেয়েছে, গাছতলায় ঠশালা আরম্ভ করেছে সীতারাম। সে এসে পথের উপর দাঁড়াল। তারপর হেসে আকুকে কে বললে, এই আকু!

কি? আকু ভুরু কুঁচকে উঠে গিয়ে দাঁড়াল।

হারাধনের দশটা ছেলে জানিস?

জানি।

বল্ দেখি, হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ-ভেউ—তারপর কি?

মনের দুঃখে বনে গেল রইল নাকো কেউ।

শিবকিঙ্কর হাসতে হাসতে চলে গেল। কোনও প্রতিবাদ করলে না সীতারাম, চুপ করে প রইল। আচ্ছা, দিন তার আসুক, শিবকিঙ্করকে একদিন ডেকে সে ছেলেদের দিয়ে হারাধনের টি ছেলে ফিরে আসার ছড়াটা আবৃত্তি করিয়ে শুনিয়ে দেবে।

তবে মণিলালবাবু আর কথা বলেন না। সেও আর মণিবাবুকে নমস্কার করে না। সটান জা মাথায় সে চলে আসে।

হঠাৎ ধীরাবাবুদের নায়েব এসে দাঁড়ালেন—সঙ্গে দেবু।

সীতারাম একটু চকিত হল—আবার কি হল? সে প্রশ্ন করলে—কি নায়েববাবু?

নায়েব বললেন—মা দেবুকে পাঠালেন, তোমার পাঠশালায় ভর্তি হবে।

আমার পাঠশালায়? অবাক হয়ে গেল সীতারাম। এ কি সৌভাগ্য তার?

গোবিন্দ বললে—জয় রাধা গোবিন্দ। লাও মাস্টার—ভর্তি করে লাও।

সেদিন দেবু পড়ছিল—নেই কো মোদের কোঠা-বাড়ি
নেই কো মোদের বিত্ত;
গরব করি মোদের কভু
যায় নি ম'রে চিত্ত।
দিন-মজুরি করছি নিয়ে
ক্লান্ত দেহখানি;
কুটির পানে যাই গো ধেয়ে
জেরটি দুখের টানি।

সীতারাম বললে, হ্যাঁ। কি হল তাহলে? কথাটা কে বলছে? বলছে, একজন দরিদ্র ব্যা মানে—গরীব লোক, যার দালান কোঠা-বাড়ি নাই, যার বিত্ত অর্থাৎ প্রচুর ধনসম্পদ, মানে—মে টাকাকড়ি সোনাদানা নাই, যে দিন-মজুর খেটে খায়, পায়ে জুতো নাই, গায়ে জামা নাই, দু-বে পেট পুরে যারা খেতে পায় না, এমনই একজন লোক বলছে, একজন গরীব লোক বলছে বলছে—। কি বলছে, বল।

দেবু বললে, আমাদের কোঠা-বাড়ি নাই। আমাদের টাকাকড়িও নাই। তবুও আমাদে অহঙ্কার যে, আমাদের মন মরে যায় নাই।

সীতারাম বলল, মন মরে যায় নাই, কি রকম বল দেখি?

বিপদ কিন্তু আকুটাকে নিয়ে। একটা কিছু নিয়ে ফিসফাস আরম্ভ করেছে। সব ছেলেকে চঞ্চল করে তুলেছে। সীতারাম আজকাল আকুকে আর কঠোরভাবে শাসন করতে পারে না সে কিছুতেই ভুলতে পারে না আকুর সেদিনের সেই কথাগুলি, তার সেই কাজগুলি।

ও না থাকলে হয়তো ঠিক এইভাবে এত শীঘ্র ভাঙা পাঠশালাটি আবার গড়ে উঠত না। প্রাণপণ চেষ্টা করছে, যাতে আকুর মন ভালর দিকে ফেরে, পড়াশুনায় মন বসে। কিন্তু কিছুতেই সম্ভবপর হচ্ছে না। সেদিন সে পড়াচ্ছিল 'চাষা' বলে একটি কবিতা—'সব সাধকের ব সাধক আমার দেশের চাষা'। জিজ্ঞাসা করেছিল, চাষা কাকে বলে?

আকু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল, আপনারা স্বাবু।

মাথাটা ঝনঝন করে উঠেছিল রাগে। ইচ্ছা হয়েছিল, কঞ্চির ছড়ি দিয়ে ছেলেটা

রক্তাক্ত করে দেয়। কিন্তু পূর্বের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করে অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করেছিল সে। তারপর তাকে বুঝিয়েছিল, যে লোক চাষ করে খায়, নিজে হাতে চাষ করে, তারাই চাষা—চাষী। কৌশলে প্রসঙ্গক্রমে তাকে বলেছিল, তারা জাতিতে সদ্‌গোপ, সদ্‌গোপেরা চাষ করে খায় বলে তাদের লোকে চাষা বলে।

আকু বলেছিল, গাঁয়ের লোক বলে কি, তোদের মাস্টার চাষা।

আকুর দোষ নাই। মণিলালবাবুর গ্রাম, শিবকিঙ্করের গ্রাম, ভদ্র সভ্য বাবুদের গ্রাম রত্নহাটার ভাষাই এই, ধারাই এই।

এক-একদিন বাইরে আত্মসম্বরণ করেও অন্তরের আক্রোশ দমন করতে পারে না। সেদিন সে তার পূর্বপ্রতিজ্ঞা আর রক্ষা করতে পারে না। এ ব্যাপারটা ঘটে পাঠশালার শেষের দিকে; শরীরের ক্লান্ত অবস্থাতে সে এক-একদিন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হয়। সব ভুলে সে তখন নিষ্ঠুর কৌশলে নির্যাতন করে ছাত্রদের। কানের জুলপির চুল ধরে নির্মমভাবে টানে, দুটো আঙুলের মধ্যে একটা পেন্সিল পুরে দিয়ে সজোরে চাপ দিতে থাকে, পেটের মাংস ধরে টানে, অবশেষে সামনের চুলের মুঠো চেপে টেনে ঘাড় নুইয়ে দিয়ে বারকতক ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দেয়। ছেলেদের মারব না প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি সীতারাম। পারবে না। পারা যায় না।

দিন যায়।

মাস কয়েকের মধ্যেই সে চালা একটা তুলে ফেললে। যথাসম্ভব কম খরচেই হয়ে গেল। বাঁশ কাঠ কিছু সে নিজের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করলে—কিছু দিলেন রাণী-মা। সতীশ সূত্রধর অল্প টাকায় তার কাজ করে দিলে। মজুরের কাজ করলে সে নিজে এবং তার সঙ্গে খোঁড়া গোবিন্দ। শ্রীমান বাঁকাচাঁদ: এইবার নীচেটা বাঁধিয়ে নেবে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ছেলে বেড়েছে পাঠশালায়। পাঁচটি নিয়ে শুরু, তার পর দেবু—তারপর আর পাঁচটি। লোকের ভয় যেন খানিকটা কমেছে। কিছুদিন আগে গোবিন্দই তাকে বলেছিল—পণ্ডিত, তুমি একবার যাও ক্যানে ছেলেদের মুরুব্বিদের কাছে।

বিষণ্ণ হেসে সীতারাম বলেছিল—কি হবে?

হবে গো হবে। বোশেখ-জষ্টিতে কালবোশেখী হয়। ঝড় আসে। আষাঢ়ে বাতাস পাল্‌টায়—তখন বর্ষা নামে। বাতাস পাল্‌টাচ্ছে হে। আমি শুনে এসেছি। লোকে বলাবলি করছে। বড় ইস্কুলে ব্যাতন বেশি, মাস্টেররা গরুর মতন ঠ্যাঙায়, যা তা বলে। বুয়েচ না, ইন্দির সা-এর ছেলেটা ভয়ে ইস্কুল যায় না, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তা বলছিল—সীতারামের হোথাই আবার দি—যা হয় হবে। তা-পরেতে ব্যাতনের জন্যে ননী ধীবরের বেটার নাম কেটে দিয়েছে। তুমি একবার যাও।

সীতারাম গিয়েছিল। বলেছিল, যা হবে—সে তো আমারই হবে। ওরা তো ছেলেমানুষ ওদের তো জেলে দেবে না—এই কথাটা ভেবে দেখুন।

তাতে ফল হয়েছে। আরও পাঁচটি ছেলে এসেছে। এখন ছেলে এগারটি।

সেদিন পাঠশালায় পড়াতে বসে অন্যমনস্ক হয়ে সে বসে ছিল। হাতে একখানা চিঠি একদিকে তার বুকের ভিতরটা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে আনন্দে গৌরবে তার চো জল আসছে। জেল থেকে ধীরাবাবু তাকে পত্র লিখেছেন—জেলখানার কর্তাদের সই কর পত্র। তাঁরা পাস করে দিয়েছেন। সীতারাম ভাবছে—জেলখানা থেকে নিশ্চয় তার না আবার পুলিসের খাতায় গিয়েছে। হায় ধীরাবাবু, কেন আপনি আমাকে এমন ক জড়াচ্ছেন! আমি গরীব, আমি সামান্য মানুষ, আমি কি আপনাদের সঙ্গে প চলতে পারি!

কিন্তু লিখেছেন বড় ভাল। বড় সুন্দর, মনপ্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। "পণ্ডিত—আপনাকে আমি রামায়ণের ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করি। কেন জানেন? আমার কা শিক্ষাই হল সত্যকারের পতিত-পাবনী ধারা। অশিক্ষার অভিশাপে অভিশপ্ত ভস্মস্তূপে ঢা মানুষের আত্মাকে মুক্তি দেয়। তারা সশরীরে মুক্তি পেয়ে উঠে আসে উচ্চতার স্বর্গলোকে শুধু তাই নয় পণ্ডিত—মানুষের অন্তরের মর্ত্যলোকে নেমে আসে স্বর্গমন্দাকিনীর ধারা, বে যায় প্রবল কল্লোলে, মানুষের ঊষর অন্তরকে করে উদারতার উর্বরতায় উর্বর, বিনয়ে ক তোলে স্নিগ্ধ, শ্যামলতায় সুশ্যাম সুন্দর। তার তটে তটে গড়ে ওঠে প্রসন্ন মহত্বের পবি তীর্থস্থল; গড়ে ওঠে দেশ-দেশান্তরের মানুষের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সমৃদ্ধ বন্দর।"

আরও অনেক লিখেছেন' মধ্যে মধ্যে দু-চারটে শব্দ কয়েকটা লাইন—কেটে দিয়েছে এমন করে কেটেছে যে পড়বার উপায় নাই। এগুলি জেলের কর্তারা কেটেছে।

হঠাৎ গোবিন্দের দিকে চোখ পড়ল তার। গোবিন্দ কার সঙ্গে ইশারায় কথা বলছে তার চোখ-ভুরুর সে ভঙ্গি দেখে সীতারামের হাসি এল। সে চিঠির আড়াল দিয়েই রইল আকুর সঙ্গে ইশারা চলছে। আকু কিছু চাচ্ছে, গোবিন্দ ঘাড় নাড়ছে, হাসছে এবং ভুরু চোখের ইশারায় সীতারামকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিছু নয়, গোবিন্দ আকুর' বিড়ি দেশলা কিংবা নস্যির কৌটা কেড়ে নিয়েছে, আকু ফেরত চাচ্ছে। গোবিন্দ সীতারামকে দেখি ইশারায় বলছে—বলে দোব মাস্টারকে।

গোবিন্দ আশ্চর্যভাবে তার জীবনে এসে গেল। তবু ভয় হয় সীতারামের। কোন দি যদি তার সেই পাশব ক্রোধ ওঠে! কোন ছেলের উপর যদি ওঠে! তবে সে সতর্ক দৃ রেখেছে। কোন কিছু তার চোখ এড়ায় না। সে পাঠশালায় আসে, পথে গাছের আড়া দাঁড়ায়; দূর থেকে দেখে গোবিন্দ কি বলছে কি করছে। গোবিন্দ তার আসনের পা হাতে ছড়ি নিয়ে বসে থাকে, কানে কলমটি গুঁজে রাখে। চিৎকার করে—এ্যাও, এ্যাও

চোপ-চোপ। পড়, সব পড়। এই আকু! এই লাতু! বেকুব—বেহুদ্দা কোথাকার।

আকু এসে দাঁড়ায়—এইখানটা বুঝতে পারছি না স্যার্!

বুঝতে পারছ না? ডংকি-মংকি কোথাকার! এ হল, বলছে, "ভাল করে পড়গা পাঠশালে—নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে!" কিংবা বলে—আমি হেড মাস্টার—ওসব ছোট পড়া আমি পড়াই না। সে সেই সেকেন মাস্টার আসুক। তার কাছে পড়বি, বুঝবি।

কোন দিন ইংরাজী পড়ায়—পড় সব—এ-বি-সি।

সাহেব হয়েছি।
এ—কে—জে
লেজ গজাল্ছে।
এ্যাল—এ্যাম—এ্যান—
রামজী হুকুম দ্যান—
আর, এ্যাস, টি—
লাফ মেরে দি—

বলেই সে খোঁড়া পায়ে একটা লাফ মেরে দেয়। কোন কোন দিন লাফাতে গিয়ে বেচারা পড়েও যায়। বড় ভাল লাগে সীতারামের। মধ্যে মধ্যে ভাবে, বিকৃতাঙ্গ ভিক্ষুক ছেলেগুলির মায়ায় জড়িয়ে পড়ে এক অনাস্বাদিত অমৃত রস পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে। ওর দ্বারা আর কোন অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব।

সীতারাম এলেই গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে বলে—লাও বাবু, তোমার পাঠশালা লাও। আমি চলি। পাঁচ দোর মেগে আসি।

অপরাহ্ণে ছুটির আগেই কিন্তু আসে; ঘণ্টাটি বাজায়।

সীতারাম চিঠিখানা সরিয়ে সাড়া দিয়ে ভাল করে বসল। তারপর বললে—ইশারাটা কিসের গোবিন্দ?

গোবিন্দ বললে—তেঁতুল। পণ্ডিত—একো তেঁতুল খাচ্ছিল। এই এতটা—এই দেখ! বলি অম্বল হবে—তা শুনবে না। হাত জোড় করে বলছে—দাও! দাও!

আকু! তুমি তেঁতুল খাচ্ছিলে?

আকু বিচিত্র! সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—স্যার্—একটা চরকা। একটা চরকা নিয়ে যাচ্ছে স্যার্।

চরকা?

হ্যাঁ। কুলীতে নিয়ে যাচ্ছে বাক্সর উপর চাপিয়ে। পাশেই স্টেশনের রাস্তা। আক

রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলে।

তা হোক। বসো।

আকু টুপ করে বসে পড়ল, বললে, ইস্কুল-সাব-ইন্‌স্পেক্টার আসছে স্যার্। সঙ্গে একজন কে রয়েছে! মেয়েছেলে। আকু সঙ্গে সঙ্গেই দুলতে দুলতে পড়তে আরম্ভ করে দিলে "বহু নদ-নদীতে কুমীর দেখিতে পাওয়া যায়। কুমীর জলে থাকে এবং জলের মধ্যে থাকিয় শিকার করিতে বেশ পটু।" সে পাঠশালার বহুদর্শী ছাত্র, সে জানে, ইস্কুল-সাব-ইন্‌স্পেক্টা পাঠশালার হর্তাকর্তা বিধাতা। খারাপ কিছু দেখলেই ইন্‌স্পেক্টার খাতায় খসখস করে লি দেবে সমস্ত কথা।

সীতারাম এবার নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠল। পাশেই স্টেশনের পথ। সত্যই সতী হাড়ি মাথায় একটা বাক্স নিয়ে চলেছে, তার উপর একটা চরকা। চরকা নিয়ে কে এল কথাটা সেও জিজ্ঞাসা না করে পারলে না।

চরকা কার হে সতীশ?

আজ্ঞেন, পণ্ডিত মশায়, চরকা হল-গা যেয়ে, মেয়ে-ইস্কুলের দিদিমণির।

মেয়ে-ইস্কুলের দিদিমণির?

আজ্ঞে, হ্যাঁ গো। নতুন এলেন এখানে। ওই যে আসছেন। কালে কালে কত দেখব পণ্ডিত মশাই! মেয়েনোকে চেয়ারেতে বসে বসে পড়াবে, পায়ে জুতো—। ও দেখেন কেনে!

সীতারাম উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে অবশ্য হুগলীতে থাকতে শিক্ষিতা মে দেখেছে, তবু এখানে যিনি এলেন, তিনি কেমন—দেখবার জন্য তার কৌতূহলের সীমা ছি না। বিশেষ করে মেয়েটি চরকা নিয়ে এসেছে। ঠিক এই কারণেই তার প্রতি সে এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করলে। অনেক দিন থেকে শুনেও আসছে দিদিমণির আসার কথা।

ওই রজনীবাবুর সঙ্গে আসছে একটি মেয়ে—চব্বিশ-পঁচিশ বছরের কালো লম্বা মেয়ে পরনে খদ্দরের জামা, খদ্দরের শাড়ি, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে দু-গাছি করে চুড়ি। মাথ ঘোমটা নেই, রুক্ষু চুলে বেশ সাদাসিধে খোঁপা। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কালো মেয়ে, তবু পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় মেয়েটিকে চমৎকার সুশ্রী দেখাচ্ছে। শ্রী শুধু মেয়েটির চো আর চুলে।

সীতারাম নমস্কার করলে রজনীবাবুকে। রজনীবাবু দাঁড়ালেন।

নতুন শিক্ষয়িত্রীটিকে নমস্কার করতে সীতারামের ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে পারলে না। লজ্জ কুণ্ঠাকে সে জয় করতে পারলে না।

রজনীবাবু বললেন, আমি চলে যাচ্ছি সীতারাম।

চলে যাচ্ছেন? ট্রান্‌স্ফার হচ্ছেন?

হ্যাঁ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রজনীবাবু বললেন, আমার দুঃখ থেকে গেল, তোমার জন্যে কছু করতে পারলাম না। যাই হোক, নোট আমি উপরে দিয়েছি। এখানেও রেখে গেলাম। ানি আসছেন, তিনিও লোক ভাল। তাঁর সঙ্গে দেখা করো, আমার বিশ্বাস, তিনি করে দেবেন তামার কাজ। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, আর একটা কথা তোমাকে বলে যাই। ামাদের দেশের নতুন স্বায়ত্তশাসন আইনের কথা জান তো? এই যে কিছুদিন আগে আইন-ভার ভোট হয়ে গেল!

সীতারাম ম্লান হেসে বললে, জানি। ম্লান হাসি হাসলে, তার কারণ কংগ্রেস-আন্দোলন, ারাবাবুর জেল—সবই তো এই ভোট-ব্যাপার নিয়ে। ভুয়ো স্বায়ত্তশাসন। কাগজে লেখে, ােন্টেগু মাকাল'।

রজনীবাবু বললেন, সেই আইন! ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আর ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে থাকবে না। নতুন লেকশন হয়ে নন-অফিসিয়েল চেয়ারম্যান হবে। আমাদের এখানে রায় সাহেব মুখুজ্জে ড়াচ্ছেন, আরও দাঁড়াচ্ছেন সব। তুমি এক কাজ করো। রায় সাহেবের ভোটে খেটে দিও। া হলে উনি চেয়ারম্যান হলে তখন তোমার এড্ সহজেই হবে। এড্ তো ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের য়ারম্যানের হাতে।

তিনি চলে গেলেন মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে।

রজনীবাবুর ট্রান্সফারের সংবাদে সীতারাম আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হল। সত্যই, এমন াল লোক বুঝি আর হবে না। কোমল চিত্ত, ধার্মিক মানুষ, কখনও কাউকে রূঢ় কথা লেন না। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা গভীর অপরাধবোধও জেগে উঠল। তাঁর বাসা কে অন্যমনস্ক ভাবে সে খুকির জন্মদিনে 'বীরবাণী' বইখানা নিয়ে এসেছিল। সেখানা সে রত দিতে পারে নাই লজ্জায়। সেখানা—সেখানা সে কি করে ফেরত দেবে? একবার চ্ছা হল, সে ছুটে গিয়ে প্রকাশ করে বলে আসে, রজনীবাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। গেলও ছুটে। কিন্তু নিদারুণ লজ্জা তার গলা চেপে ধরলে। রজনীবাবু প্রশ্ন করলেন, আবার লে পণ্ডিত! কিছু বলছ? সীতারাম কোন কথা না বলে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম রে উঠে দাঁড়াল, শুধু চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দু-ফোঁটা। রজনীবাবু আবার কটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, তোমার ভাল হবে সীতারাম। শিক্ষকতা তুমি ড়ো না।

তাঁরা আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন। সীতারাম দাঁড়িয়েই রইল। পিছন থেকে য়েটিকে বড় ভাল দেখাচ্ছে। সব চেয়ে ভাল লেগেছে মেয়েটির আশ্চর্য রকম শান্ত ধীর কুণ্ঠিত স্বভাব। শিক্ষা না হলে মানুষ সত্যকার মানুষ হয় না। সে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক য়ের পক্ষেই।

।পর সে বাজারের রাস্তা দিয়ে চলেছিল। একজন দোকানী বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে, অ পণ্ডিত, তুমি এদিকে ?

সীতারাম এ প্রশ্নে একটু ক্ষুব্ধ হল অকারণে, বললে, কেন, আমাদের কি আসতে এদিকে ?

হেসে সে বললে, চটে গেলে যে হে! বলি, এদিকে তো আস না। তোমার তো ঝরনার ধারে বসে তপস্যা আছে। তাই জিজ্ঞাসা করছি।

সীতারাম বললে, এই দিকেই যাব আজ, দরকার আছে।

তা এস, একটু বসে যাও। তোমার প্রশংসা করি আমরা। বলি হ্যাঁ, সাহস আ সীতারামের। তা ছাড়া এত কষ্টের মধ্যেও যে লোক পণ্ডিতি ছাড়ে নাই, তার কাছেই পড় দিতে হয় ছেলেকে। শিবকিঙ্কর ও মণিলালবাবুর আমরা নিন্দে করি। বুঝলে?

সীতারামের ভাল লাগল একটু। সে বসল। কয়েক মিনিট পরই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে বল আজ উঠি ভাই।

কোথায় যাবে ? কি দরকার ?

সীতারাম বললে, একবার রজনীবাবুর কাছে যাব। উনি চলে যাচ্ছেন এখান থেকে।

কথাটা সে মিথ্যা বললে। সে চলেছিল বালিকা-বিদ্যালয়ের দিকে। শিক্ষয়িত্রীটিকে ত বড় ভাল লেগেছে। তাকে যদি একবার দেখতে পায়—সেই উদ্দেশ্যে সে চলেছিল। সে জা যে, এটা তার অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়, বার বার সে মনকে বুঝাতে চেষ্টাও করেছে, তবুও নিজেকে সংযত করতে পারে নাই।

গ্রামের বাজারের রাস্তার ধারেই বালিকা-বিদ্যালয়। ইটের গাঁথনি ঘরের উপর টি চাল। সামনে থাম-দেওয়া বারান্দা। বারান্দার কোলে একটুকরা বাগান। এতা ইস্কুলে বৃদ্ধেরাই মাস্টারি করে এসেছেন। সম্প্রতি উপরের নির্দেশে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হও এই মেয়েটিই প্রথম শিক্ষয়িত্রী। স্কুলের পাশেই একখানি মাটির কোঠা-ঘরে তার বাসা নির্মি হয়েছে।

সীতারাম দাঁড়াল রাস্তার উপর।

ঘরের দরজা বন্ধ। জানলাটি খোলা, জানলায় পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। ওইটুকুতেই এব মার্জিত রুচির ছাপ ফুটে উঠেছে।

শিক্ষিতা মেয়ে, সে কি বেড়াতে বার হয় না।

দূরে কে আসছে। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে তার আর সাহস হল না। হনহন করে একটু বেশি জোরেই অগ্রসর হল। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সেখ থেকে ফিরে এসে আবার সে একবার দাঁড়াল বাড়িটার সামনে। ঘরে আলো জ্বলছে; পর্দ

লা পড়েছে, সেই আলোকিত পর্দায় সে দেখতে পেলে মেয়েটির মুখের ছায়া, বায়স্কোপের য় যেমন কায়ার ছাড়া পড়ে অবিকল সেই রকম; মুখখানি কালো ছায়ায় ফুটে উঠেছে। াব এলো খোঁপাটি পর্যন্ত ছায়াতে ফুটে উঠেছে; ঠোঁট দুটি নড়ছে। বোধ হয় বই ছন। না। একলা তো কেউ এমনভাবে বই পড়ে না! নীরবেই তো পড়ে যায়। ? তবে কি আপন মনে মৃদুস্বরে গুনগুনিয়ে গান গাইছেন?

হঠাৎ সে নিজেই চমকে উঠল। এ কি করছে সে? ছি! ছি! ছি! দ্রুতপদে সে ত শুরু করলে। যেন পালাচ্ছে। একেবারে এসে দাঁড়াল রজনীবাবুর বাসার দরজায়। টে হাত দিলে। বীরবাণীখানা পকেটেই আছে।

রজনীবাবু ডাকলেন—সীতারাম! এস। এস। রজনীবাবু তাঁর খাতাখানি খুলে দিলেন। লন—পড়।

ইংরাজীতে লেখা মন্তব্য। রজনীবাবুর হাতের লেখাও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, পড়ে গেল সে। জী ভাল জানে না সীতারাম, সকল শব্দের অর্থ সে বুঝতে পারলে না; তবু এটুকু বুঝলে রজনীবাবু লিখেছেন, 'নিরীহ পণ্ডিতটির উপর অবিচার হয়েছে। গ্রাম্য ষড়যন্ত্রের ফলেই ার পক্ষের মনে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে। পণ্ডিতটি সৎ নিষ্ঠাবান মানুষ। তার উপর রিধান হওয়ায় আরও একটা ক্ষতি হয়েছে; গ্রামের অতি দরিদ্র এবং সমাজের অব- ত সম্প্রদায়ের ছেলেদের পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।'

আরও অনেক লিখেছেন তিনি। পড়ে সীতারামের চোখে জল এল। কি করে কৃতজ্ঞতা াশ করবে ভেবে পেলে না। পকেটের বীরবাণীখানিতে সে হাত দিয়েই ছিল। সেখানিও ের করতে পারলে না। এরপর কি করে বের করবে সে? রজনীবাবুর সব ধারণা ট যাবে! বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। না—না থাক। এ পাপের শাস্তি সে লাকেই নেবে। এখানে সে পারবে না।

রজনীবাবু হেসে বললেন—তোমাকে আর একটি হদিস দিয়ে যাই সীতারাম। নতুন ইনস্পেক্টার যিনি আসছেন—তিনি ওল খেতে ভালবাসেন। ওল, বেল—আরও যেন কি ব। মানে ডিস্‌পেপটিক্ লোক, বুঝলে না? দেখা করবার সময় একটি ভাল ওল দেখা করো। আর একটি কথা, ধীরাবাবু তোমাদের গল্প লেখেন। নতুন ইন্‌স্পেক্টার —আধুনিক সাহিত্যের উপর ভারী চটা। বুঝেছ, তুমি ধীরাবাবুর গল্পের নিন্দা করো। ছ? নিন্দা যদি না করো, তবে কখনও যেন প্রশংসা করো না। বুড়ো তা হ'লে ক্ষেপে । আমার সঙ্গে একবার তর্ক হয়েছিল। শেষে রেগে একটা কাগজ-চাপা ছুঁড়ে দিলে ার মাথায়। ভাগ্যে মাথাটা সরিয়েছিলাম—তাই রক্ষা! হাসতে লাগলেন রজনীবাবু। লন—এই তোমাদের এক বিপদ। আমাদের মন রেখে চলা। আমাদের বাতিকে ক নাচা।

সীতারাম ফিরবার পথে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পথ হাঁটছিল। সে যেন হারিয়ে গিয়েছে রজনীবাবুর স্নেহে—আর কালো ছায়াতে আঁকা ছবির সৌন্দর্যে—সে যেন কেমন গিয়েছে।

বারো

মাস দুয়েক পর সেদিন মনোরমা কাঁদছিল।

সীতারাম তাকে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করেছে, অপমান করেছে। তার কি অপরাধ, তা বুঝতে পারে নাই। সেই জন্যেই সে বেশী করে কাঁদছে। ইদানীং সীতারামের পরি পরিচ্ছন্নতার বাতিক ক্রমশই যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কাপড় ময়লা, বিছানা ময়লা, এখা দুর্গন্ধ উঠেছে, এই নিয়ে সে অহরহই খুঁতখুঁত করে। শুধু তাই নয়, তার স্বভাবও নিরতিশয় রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

আজ সীতারাম বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসেছিল, মনোরমা এসে সামনে ভা নামিয়ে দিতেই সে বলেছে, ভাত নিয়ে যাও। আমি খাব না।

খাবে না? কি হল? খেতে বসলে—

নিয়ে যাও বাপু, নিয়ে যাও। ভাত আমার রুচবে না।

বলেই সীতারাম উঠে পড়েছে। বলেছে, তুমি কি নিজে গন্ধ পাও না? তো কাপড়ের কি দুর্গন্ধ উঠছে বুঝতে পারছ না?

মনোরমা লজ্জিত হয়েছিল। কাপড়খানায় দুর্গন্ধ হয়েছে বটে। ছোট ছেলের মা তার উপর ভিজে কাপড়খানা বাতাসে শুটিয়ে গিয়েছিল, রোদ পায় নাই। কাপড় ময়লাও হয়েছে। এর আর সে কি করবে? কোলে শিশু-সন্তান, ঘর দোরে রান্না বা কাজের অন্ত নাই; একা মানুষ সে, তার কি সেজেগুজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বসে থ বললেই থাকা হয়? তা ছাড়া যে কাপড়খানা তখন তার পরনে ছিল, সেখানা রেশ ঝাড়া, কাঁটের কাপড়—শুদ্ধ কাপড়। এ কাপড় আবার কে বারো মাস ক্ষারে কাচে? সেই উত্তরই দিয়েছিল, কি করব? শুদ্ধ কাপড় যে! এ কাপড় কি নিত্য কাচা হয়? একটু গন্ধ হয়। নাও, বসো। খেয়ে নাও।

সীতারাম ব্যঙ্গভরে বলেছিল, শুদ্ধ কাপড়!

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ না? কাঁটের কাপড়!

অশুদ্ধ কাপড়। যাতে দুর্গন্ধ হয়, যা অপরিষ্কার, তাই অশুদ্ধ।

দেখ, যা জান না, তা নিয়ে বকো না। পণ্ডিত আছ পাঠশালায়, ঘরের

আচরণের কি জান তুমি ?

তা বটে। আচার-আচরণে মুখ্যুরাই পণ্ডিত হয়। সেটা জানলাম।

মনোরমা ওই মূর্খ কথাতেই বেশী আঘাত পেয়েছে। উত্তরে বলেছিল, বেশ, আমি না হয় মুখ্যুই বটে। কিছু জানি না। কিন্তু এই কাপড় আরও পাঁচখানা কিনে দাও কেনে, রোজ কাচব একখানা করে। কাচবই বা কেন, ধোবার ব্যবস্থা করে দিও, ধোবার বাড়ি দোব। তখন যে সবাই সাধলে, বাবুরা নায়েবি দিতে চাইছে, নাও। তা—

বাধা দিয়ে সীতারাম বলেছে, ইতর—তুমি অতি ইতর।

আমি ইতর ? এত বড় কথাটা তুমি বললে আমাকে ?

হ্যাঁ। তুমি মূর্খ, তুমি ইতর, তুমি লোভী। সীতারাম আসনের উপরেই এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এবার উঠে গিয়ে হাতে মুখে জল দিতে আরম্ভ করলে।

মনোরমার বুকের মধ্যে অভিমানের অবরুদ্ধ কান্না তোলপাড় করছে তখন। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কৃষাণ-বউটা শুয়েছিল, অবাক হয়ে সব শুনছিল, এবার সে উঠে বসল। বললে, বলি মুনিব মাশায়! বলি তোমার রীতিকরণ-টরণ কেমন গো ?

সীতারাম তাকে ধমক দিয়ে উঠল, তুই থাম্। যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলতে নাই।

বলি, বুঝব না কেনে ? মুখ্য-সুখ্য মানুষ, ছোট-মোট জাত, তা বলে বোকা-টোকা তো আর লই। বুঝব না কেনে ? তিরিক্ষি-মিরিক্ষি মেজাজ নিয়েই তুমি এলে, এসে ওই একটা ছুতো-টুতো নিয়ে বউটাকে বকছ।

সীতারাম আর কোন কথা না বলে উপরে গিয়ে উঠল। কৃষাণ-বউয়ের কথাটা তার মনে গিয়ে তীরের মত বিঁধল।

উপরে এসে একা বসে অনেকক্ষণ ভেবে সে দেখলে; সত্যই তাই। অত্যন্ত সামান্য কারণে সে মনোরমাকে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করেছে। কেন তার মন এমন রুক্ষ হল ? কি হয়েছে তার ? ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সে। সত্যই কি তাই ? হ্যাঁ, তাই। তাতে আর কোন ভুল নাই। কিন্তু এ যে অপরাধ! হ্যাঁ, অপরাধ বইকি। শুধু মনোরমার কাছেই অপরাধ নয়, এ তার চিত্তের কলুষ, এ তার ভগবানের কাছে অপরাধ। এ ছাড়া এ যে তার ধৃষ্টতা। সে একজন পাঠশালার সামান্য পণ্ডিত, আর ওই মেয়েটি, শিক্ষিতা মেয়ে! এ কথা যদি কোন রকমে তার কানে ওঠে, তবে সে কি কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবে, কি বাঁকানো হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠবে, সে কল্পনা করেও সে শিউরে উঠল।

আজ প্রায় মাসখানেক সে এসেছে। মাসখানেক ধরেই ও ভূতগ্রস্তের মত দু-বেলা ওই পথে তাকে দেখবার গোপন উদ্দেশ্যেই যাওয়া-আসা করছে। আজকাল ও তার এতকালের যাওয়া-আসার নিয়মিত পথ পরিবর্তন করে, নতুন পথে, অর্থাৎ বালিকা-বিদ্যালয়ের সামনের বাজারের পথ দিয়ে যাতায়াত করছে। সকালে গ্রাম থেকে বেরিয়ে অনেকটা ঘুরে ওই পথ

দিয়ে বাবুদের বাড়ি যায়। বৈকালে আজকাল আর ঝরনার দিকে যায় না। বাজারের পথে, ওই বাড়ির সম্মুখ দিয়ে যায়, খানিকটা পরেই ফিরে আসে ওই পথে। তখন সন্ধ্যা হয়ে যায়। তার ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে, পর্দায় তাঁর ছায়া পড়ে মুখের; তাই দেখে সে ফিরে আসে। এক মাসের মধ্যে, বার-তিনেক তাঁকে বাইরে দেখেছে।

কালো লম্বা মেয়েটি, পরিপাটি করে এলো খোঁপা বাঁধা, পরনে ধোয়া পরিচ্ছন্ন খদ্দরের শাড়ি, গায়ে ব্লাউজ, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি। সীতারাম মুগ্ধ হয়ে যায় দেখে। একদিন দেখেছিল পোস্ট অফিসে, একদিন দেখেছিল বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের বাসার দরজায়, একদিন দেখেছিল নিজের বাসায় বারান্দায়; অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

কতদিন সে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য কত উপায়ের কথা ভেবেছে। মেয়েটি চরকা কাটে। একদিন কতকটা রামকাপাসের তুলো পাঁজ করে তাঁকে উপহার দিলে হয় না? বালিকা বিদ্যালয়ের ঝি রোজই প্রায় এখানকার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায় তাঁর জন্য। ধীরাবাবুর অনেক বই আছে, ঝিকে বললে হয় না—তাঁকে বলো, তাঁর অমত না থাকলে, আমি বই দিয়ে যাব, আবার নিয়ে যাব। কিন্তু কোনটাই সে পারে নাই, শুধু ভূতগ্রস্তের মত তাঁর বাড়ির সম্মুখ দিয়ে চলাফেরা করেছে।

নাঃ, এ তার অন্যায়। সে একজন পাঠশালার শিক্ষক। তার জীবনে কোন কলুষ থাকা উচিত নয়। এ মোহ তাকে ত্যাগ করতে হবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তাই করবে সে। মনে মনে বার বার সে ভগবানকে ডাকলে, ভগবান আমাকে বল দাও।

ভগবানকে প্রণাম করে প্রাণমন ঢেলে সে আবার পাঠশালা নিয়ে পড়ল। এই একমাসে আরও তুটি ছেলে বাড়ল তার পাঠশালায়। তেরোটি ছেলে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তেরোটি ছেলের একটিও তেমন ভাল ছেলে নয় কেউ। একশো ছেলের বদলে যদি একটিও ভাল ছেলে—সত্যকার ভাল ছেলে সে পায়, তবে সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। দেবুর উপরে ভরসা তার ছিল। কিন্তু সে ভরসা তার দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। দেবু ক্রমশই বেশী চঞ্চল এবং পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে উঠছে। জ্যোতিষের ভাইপোটি কেমন যেন বোকা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এক-একসময় নিজের উপর সন্দেহ হয়। এ কি তার নিজের অকৃতিত্ব? নিজের ক্ষমতার অভাব? তার জন্যই কি ওদের ওই রকম পরিণতি হচ্ছে?

সে এবার প্রাণপণে লাগল।

আকুর কিছু হবে না। ওকে পাঠশালা থেকে বিদায় করা উচিত। কিন্তু বিদায়ও নেবে না। ছেলেটা বিড়ি খেতে শিখেছে। আরও পাঁচরকম খারাপ বুদ্ধি জেগেছে ওর মনে। এবার ওকে প্রাইমারী পাসের সার্টিফিকেট দিয়ে বিদায় করবে সে। আবার ধুয়ো

তুলেছে আকু, পাঠশালার ফুটবল টীম করতে হবে। এসবে গোবিন্দ হল তার উকিল। গোবিন্দ ওকালতি করে ভাল। বলে—তা—ধর ছেলের দল ওরা তো, গরীব বড়লোক মানে না। ওদের সাধ হবেই। বড় ইস্কুলের ছেলেরা বল খেলে। ওরাই বা খেলবে না কেন? তবে একটা গল্প বলি শোন। ভারী বাদশা ছিল এক। মস্ত দাড়ি। তেমনি রাগ। তেমনি দাপট। বুয়েচ। একদিন বাদশা এসে—দরবারে চোখ-মুখ রাঙা করে বললেন, আমার দাড়ি ধরে যদি কেউ টানে—তবে তার দণ্ড কি? সবাই তো শিউরে উঠল। হুজুরের দাড়ি ধরে টানা? তা কি কেউ পারে? বাদশা বললেন—পারে কি—পেরেছে, টেনেছে—টেনেছে। তবে দাও তাকে শূলে। না—না। তাকে টুকরো টুকরো করে কাট। ডাল-কুত্তা দিয়ে খাওয়াও। উজীর কিন্তু চুপ করে আছেন। বাদশা বললেন—উজীর তুমি যে কিছু বলছ না? উজীর বললেন—হুজুর—কি বলব? বাদশার দাড়ি ধরে যদি কেউ টেনে থাকে তবে সে হল তাঁর শিশু ছেলে। আমি বলি তার হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হোক। গল্পটি তার সত্যই ভাল লেগেছে। পল্লীগ্রামের পাঠশালায় এসব অবশ্য নাই; সেখানে পণ্ডিতেরা ছুটি দিয়েই খালাস। কিন্তু রত্নহাটার মত জায়গার পাঠশালায় তার তো খালাস নিলে চলবে না। এখানে বড় ইস্কুলের সংলগ্ন পাঠশালায় ছেলেদের ফুটবল খেলার ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের কাছে সেটা একটা বড় আকর্ষণ। তা ছাড়া তার পাঠশালার ছেলেরা মুখ চুন করে ওদের ফুটবল খেলার গ্রাউণ্ডের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে সেও দুঃখ পায়। সুতরাং, তার পাঠশালাতেও এটা রাখতে হবে। আরও এক কারণে এটা তার ভাল লাগল। বৈকালে যদি সে ছেলেদের খেলার মাঠে গিয়ে বসে, তবে ওই মেয়েটির মোহ থেকে সে মুক্তি পাবে।

আর সে দ্বিধা না করে ফুটবলের অর্ডার দিয়ে চিঠি দিয়ে আকুর হাতে দিয়ে বললে, যা, ফেলে দিয়ে আয়।

আকু লাফাতে লাফাতে চলে গেল, 'সন্দীপন-পাঠশালা ফুটবল টীম'। চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ—হাই-ইস্কুলের প্রাইমারি সেক্‌শন ফুটবল টীমের সঙ্গে।

ছেলেরা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছে আনন্দে।

পড়। পড়। সব পড়। দেবু, সাহা, অঙ্ক নাও। এক মণ সন্দেশের দাম যদি চল্লিশ টাকা দশ আনা ছয় পাই হয়, তবে ওই দরে পাঁচ মণ সন্দেশ কিনিয়া কত টাকা সের দরে বিক্রয় করিলে একশত পঁচিশ টাকা লাভ হইবে? গণেশ, গোকুল, তোমাদের পড়া নিয়ে এস। বই বন্ধ করে মহাত্মা হাজী মহম্মদ মহসীনের গল্প বল।

স্তব্ধ দুপুর। ছেলেরা মৃদুস্বরে পড়ছে, মধুচক্রের মধুপানরত মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জনধ্বনির মত গুঞ্জন উঠছে। পড়, পড়। বিদ্যাই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মধু। আকণ্ঠ পুরে পান কর। জীবন ধন্য কর। দেবু এবং সাহার স্লেটের উপর পেন্সিল পড়ছে, টুক-টুক শব্দ উঠছে।

গণেশ বলছে, মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থস্থল মক্কা। এই মক্কা তীর্থে যে সকল মুসলমা হজ্জ করিয়া আসেন তাঁহাদিগকে হাজী বলে। মহম্মদ মহসীন মক্কা তীর্থে গিয়েছিলেন বলিয় তাঁহাকে হাজী বলা হয়।

বাঃ, বাঃ! বলে যাও। পড়, পড়, তোমরা পড়। প্রাণ দিয়ে পড়। মন দিয়ে পড় প্রাইমারি পাস কর। আমার কাছে যতটুকু আছে, নাও, তার সবটুকু তোমরা নাও। আদা করে নাও। নিতে কষ্ট হলে বল। তারপর যাও বড় ইস্কুলে। সেখান থেকে যাও কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে। মঙ্গল হোক তোমাদের, উন্নতি হোক তোমাদের, দেশের মধ্যে গণ্যমান্য হং দেশের মঙ্গল কর, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। সন্দীপন পাঠশালা ধন্য হবে। সীতারাম পণ্ডি সামান্য ব্যক্তি, চাষী সদ্গোপের ছেলে, তার নাম তোমাদের কীর্তির মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে, ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাড়ে তিনটার ট্রেনের বাঁশি বাজে।

স্যার, সাড়ে তিনটে বাজল।

হ্যাঁ, নামতা পড়ে নাও। পড়াও, আজ দেবু পড়াও।

দেবু দাঁড়াল একা। ছেলেরা দপ্তর বেঁধে বসল। দেবু বলতে আরম্ভ করলে, এে —চন্দ্র।

সমস্বরে ছেলেরা বললে, একে—চন্দ্র।

দুয়ে—পক্ষ।

দুয়ে—পক্ষ। ক্রমে ক্রমে আশী নব্বুই পার হয়ে যায়, আসে নয়দশ—নব্বুই। দশ-দ শূন্য, এক শো।

এইবার কড়া। এক কড়া পোয়া গণ্ডা।

সুর উঠতে থাকে। ক্লান্ত শরীরে সীতারামের এ সুর বেশ লাগে। ঘুমের মত ঝিমু আসে।

নামতা-পড়া শেষ হল। এ অঞ্চলে বলে নামতা ঘোষা—অর্থাৎ ঘোষণা করে পড়া এইবার ছুটি।

ছোট দুটি ছেলে এসে দাঁড়াল, কাল ষষ্ঠী স্যার। কাল ছুটি।

মায়ের ছোট ছেলে বুঝি? আচ্ছা, একবেলা ছুটি। টিফিনের পর আসবে। পাঠশালা ছোট ছেলেদের ছুটির ফর্দ বেশি। ষষ্ঠীপুজোয় এক বেলা ছুটি। নবান্নে ছুটি, লক্ষ্মীপুজো ছুটি। আহা, শিশুর দল! আনন্দ তো ওদেরই।

ছুটির পর ছেলেরা ছুটল স্টেশনের ধারে মাঠে। সীতারাম বসে রইল। তারা সক মিলে কোদাল হাতে নিয়ে মাঠ তৈরী করতে লাগল। উঃ, কি উৎসাহ তাদের! ভারী ভা লাগল।

আজকাল সন্ধ্যার পর শ্যামু অন্য একজন মাস্টারের কাছে ইংরেজী পড়তে যায়। কানাই রায় লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে যায়। দেবু একা পড়ে এখন। খেলতে গিয়ে দেবুর পা মচকে গিয়েছে আজ। সে এল না পড়তে।

সীতারাম বেরিয়ে পড়ল। একটু মাঠের ধারে গিয়ে বসবে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে। জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে বসে বসে ভাববে, নিজের অদৃষ্টের কথা, দুঃখের কথা। ভাবতে তার ভাল লাগে। দুঃখ পেলে যেন সে ভাল থাকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে যেন তৃপ্তি পায়। সে মণিলালবাবুর আক্রোশের কথা ভাবে, শিবকিঙ্করের কূট-কৌশলে তাকে নির্যাতন করার কথা ভাবে। পাঠশালা-খানাতল্লাশির কথা ভাবে। আলোকিত পর্দার গায়ে ছায়ায় ফুটে-উঠা একখানি মুখের কথা ভাবে।

পথে চলতে চলতে হঠাৎ সে চমকে উঠল। এ কি! মাঠের ধারে যাবার সঙ্কল্প করে বেরিয়ে এ সে কোথায় এসেছে! সামনেই রাস্তার ধারে ঘরখানির জানালায় আলোয় উজ্জ্বল পর্দার উপর ছায়ায় আঁকা একখানি মুখ ফুটে রয়েছে। অন্ধকার গাছতলায় সে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক তেমনি ভাবে বসে রয়েছেন তিনি। ঘাড়ের উপর এলো খোঁপাটি দুলছে। মধ্যে মধ্যে আজ হাত দুটি উঠে আসছে চোখের কাছে। কি যেন রয়েছে হাতে। আজ বোধ হয় কিছু সেলাই করছেন। হঠাৎ মাথার উপর গাছে পেঁচা ডেকে উঠল কর্কশ স্বরে। সে চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই তার চেতনা ফিরে এল। এতক্ষণ সে যেন আত্মস্থ ছিল না। মনে হল—এ কি? ছি-ছি ছি! এখানে কেন এসেছে সে! অন্যমনস্কভাবে মাঠে না গিয়ে এখানে এসেছে সে! আশ্চর্য মনের ছলনা!

সে পালিয়ে গেল না। না, এইটুকু অধিকার তার থাক্। পাঠশালার পণ্ডিত সে, পাঠশালার পণ্ডিতের কি কোনও মুখ এমন ভাল লাগে না? ভাল লাগলে কি অপরাধ হয়? অপরাধ হয়তে হয়, কিন্তু তবু ভাল লাগে বইকি। পাঠশালার পণ্ডিত বলেই সে ভাল-লাগার কথা চিরদিন অজানাই থেকে যায়। হয়তো বুকের মধ্যে লেখা থাকে সে কথা। পণ্ডিত মরে, মরলে পণ্ডিতের দেহের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে কথা।

তারও তাই হবে। এ গোপন অধিকারটুকু তার থাক্, সে ছাড়তে পারবে না। মনে মনে মনোরমার কাছে বার বার সে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে। 'তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তোমার অসম্মান আমি কখনও করব না। তুমি লক্ষ্মী, তুমি দেবী। শুধু আমার এইটুকু গোপন অপরাধ ক্ষমা করো।'

রাত্রে ফিরে গিয়ে মনোরমাকে সমাদর করলে সে।

সে আদরে প্রায় বিগলিত হয়ে মনোরমা হেসে বললে, তুমি পণ্ডিত মানুষ, এত সব ভাল ক' আমি তো জানি না!

সীতারাম উৎসাহিত হয়ে বললে, আমাদের খুকিকে লেখাপড়া শেখাব। নিয়ে যাব স

করে। বালিকা বিদ্যালয়ে দিয়ে পাঠশালায় যাব। দিদিমণিকে বলব, একটু দেখবেন। আবার পাঠশালা হয়ে গেলে সঙ্গে নিয়ে চলে আসব।

তেরো

দিন যায়। মাস যায়। এক বৎসর কেটে গেল। পাঠশালা চলে।

পাঠশালার পড়া শেষ করে একদল ছেলে বড় ইস্কুলে চলে গেল। নতুন একদল এল প্রথম ভাগ হাতে—স্লেট বগলে। নতুন কাপড় পরনে, নতুন জামা; ক'জনের চোখে আবার কাজল। বা। বা। বা।

সেদিন মাস্টার বসে রিপু করছিল।

ছেলেরা বসে পড়ছে। নতুন ছেলের দল। দেবু, জ্যোতিষ সাহার ভাইপো এবং তার সহপাঠীরা চলে গিয়েছে এখানকার পড়া শেষ করে। আকুর দল এবার বিদায় নিয়েছে। তারা কিন্তু কয়েকজন শিষ্য রেখে গিয়েছে—বিড়ি খায়, এক ক্লাসে দু বছর তিন বছর থাকে, মিথ্যা কথা বলে। আকুদের শিষ্য ঠিক বলা যায় না। সীতারাম অনেক ভেবে দেখে ঠিক করেছে, ওরা হল প্রথম ভাগের রাখাল নামক দুষ্ট ছেলেটির শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম তাকে পাঠশালায় ভর্তি করে ওদের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন। ওরা থাকবেই। আকু পাঠশালা ছেড়েছে নামেই। বদমাশটা ছেড়েও ছাড়ছে না। আকু পাঠশালায় পড়ে না কিন্তু আসা চাই একবার। ঘণ্টা দুয়েক থেকে আবার কোথায় চলে যায়। আসে, সীতারামকে রাজ্যের খবর দেয়। কিছু কাজ-কর্মও করে দেয়, ঘড়িতে দম দেওয়া তার মধ্যে প্রধান। আর ছেলেদের হাজিরা নেয়—নাম ডাকে। গোবিন্দের সঙ্গে গল্প করে। নস্য নেয়। ছেলেদের মধ্যে মধ্যে ধমকায়। এই ওর কাজ। আর কাজ বিকেলে সন্দীপন পাঠশালা ফুটবল টীমে বাঁশী বাজানো। বারণ করতে পারে না সীতারাম। হোক চণ্ডাল আকু, কোথায় যেন ওর মধ্যে শিবকে খুঁজে পায় সীতারাম।

নতুন কচি কচি মুখ সব।

সীতারামের সব চেয়ে বড় আনন্দ, এবার সে সত্যকার একটি ভাল ছেলে পেয়েছে। বাবুদের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে সে। হঠাৎ তাকে সীতারাম আবিষ্কার করেছে। ফুটফুটে ছেলেটি, চকমকে চোখ, তার মুখের দিকে চাইলেই সীতারামের বুকটা ফুলে ওঠে। বাবুদের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে—নাম তার জয়ধর।

ফুটফুটে ছেলেটাকে নিয়ে বিধবা মা এল বাবুদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ নিয়ে। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাবুদের বাড়িতে সীতারাম বসে ছিল বাগানের বেদীতে।

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে বৈঠকখানার বারান্দা অতিক্রম করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সীতারাম তাকে ডাকলে—কে হে তুমি? ওহে, ও খোকা! শোন—শোন!

ছেলে দেখলেই সীতারামের মনে একটি ব্যবসাদার শিক্ষক জেগে ওঠে। পাঠশালায় ভর্তি করলে মাসিক চার আনা আয় বৃদ্ধি।

ছেলেটি ডাক শুনে দাঁড়াল, কাঁদতে কাঁদতেই বললে—কি?

তুমি কাঁদছ কেন? কি নাম তোমার?

সে উত্তর দিলে—আমি জয়ধর।

কাঁদছ কেন?

সন্দেশের মধ্যে আঁটি ছিল আমি খেয়ে ফেলেছি।

সন্দেশের মধ্যে আঁটি ছিল, খেয়ে ফেলেছ? হেসে ফেললে সীতারাম। ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হল না তার। আজ বিকেলে সেও আঁটিওয়ালা সন্দেশ খেয়েছে! অর্থাৎ হরিতকির মোরব্বা। হরিতকির আঁটিটা তার মধ্যেই থাকে। বেচারী গাঁয়ের ছেলে! বোধ হয় বাবুদের বাড়ি কোন অজ পাড়াগাঁয়ের কেউ এসে থাকবে। হরিতকির আঁটিটা গিলে ফেলেছে। হেসে সে বললে, তাতে ভয় কি? পেটে তোমার গাছ হবে না!

ছেলেটি থমকে দাঁড়াল, তার কান্নাও থামল।

সীতারাম প্রশ্ন করলে, তোমার নাম জয়ধর, জয়ধর কি?

জয়ধর ঘোষ।

এখানে কোথায় এসেছ?

মা যে কাজ করতে এয়েছে।

সীতারাম বুঝলে কি কাজ। ব্রাহ্মণ-বাড়িতে ঘোষের মেয়ে পরিচারিকার কাজ ছাড়া কি কাজ করবে! ঝিয়ের ছেলে। সে আবার প্রশ্ন করলে—তুমি? তুমি কি করবে?

আমি? মা বলেছে, বড়বাবু এলে তার চাকর হব।

লেখাপড়া জান?

হুঁ। বলেই সে আরম্ভ করলে—'ক' গরু চরাতে চ। গরু লাগল ধানে।

সীতারাম এবার উঠে তাকে তাড়া করলে। এবার ও বলবে—'ধর্ তো পণ্ডিতের কানে'। একেবারে তুখোড় ছেলে! সীতারাম তাড়া করের বললে—'ধর্ তো ছোঁড়ার কানে!'

ছেলেটা ছুটে পালিয়ে গেল সেদিন। তারপর মাস দুয়েক আর সে ছেলেটার দিকে নজর দেয় নি। ওই ছেলের উপর নজর দিয়ে করবে কি? অথচ ছেলেটা আসত, ফড়িং ধরে ঘুরে বেড়াত, ওটা ওর নেশা। বাবুদের গরুর রাখালের কাছে বসে থাকত। কানাই রায় ছেলেটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না—সে বলত বিছিতি ছেলে! জান সীতারাম—এই বিধবার বেটা আর রাজার বেটা এদের মধ্যে তফাৎ নাই। ছোঁড়াটার মাথা খেলে ওর

মা। আমি একদিন পা টিপে দিতে বলেছিলাম—তা হারামজাদা সে তো দিলেই না, উল্‌টে মায়ের কাছে গিয়ে লাগিয়েছে। মা আবার কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছে রাণীমায়ের কাছে। অতি বজ্জাত!

সীতারামও তাই ভাবত। হঠাৎ একদিন তার ভুল ভেঙে গেল। সে চমকে গেল। সে আবিষ্কার করলে—দরিদ্র কুশিক্ষার মালিন্যের মধ্য থেকে তার বুদ্ধির হীরকদীপ্তি।

শীতকাল। ছেলেটা দেবু-শ্যামুর পড়ার ঘরের বাইরে দরজার পাশে দোলাই গায়ে মুড়ি খাচ্ছিল। শ্যাম-দেবু অঙ্ক কষছিল—সে নিজে বই পড়ছিল। অঙ্ক সেরে শ্যামু বললে—স্যার, এইবার প্রাইজের কবিতাটি মুখস্থ করি!

ইস্কুলে প্রাইজ হবে, শ্যামু রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা আবৃত্তি করবে। তাই নিয়ে সে মেতে উঠেছে। সীতারাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—পড়। তাই পড়। তার ইস্কুলে প্রাইজ হয় না। হবেও না।

শ্যামু আরম্ভ করলে পড়তে। পড়া শেষ করে তারা বাড়ি চলে গেল। সীতারাম তেল মাখতে বসলে। হঠাৎ তার কানে এল বাইরে দরজার পাশে বসে ঐ ছেলেটি আপন মনে আবৃত্তি করে যাচ্ছে—

ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। জয়ধর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছে! সে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। বললে—এ তুই কি করে শিখলি?

ছেলেটা ঝকমকে চোখ তুলে বললে—শুনে শিখলাম। মেজবাবু যে পড়ছিল। ঘরে যে বক্তৃতা করে পড়ে।

শুনে শুনে শিখেছিস?

হাঁ।

কই বল্—বল্। কতটা শিখেছিস।

জয়ধর অনেকটা আবৃত্তি করে গেল। শেষে—

পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার—

এই পর্যন্ত আবৃত্তি করে হেসে বললে—

আর পারি নাই শিখতে।

সীতারাম উৎসাহিত হয়ে বলে গেল—

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

জয়ধরও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করে গেল। সীতারাম তাকে প্রশ্ন করলে—আর কিছু শিখেছিস ?

কয়েকটা কবিতাই সে আবৃত্তি করলে। এগুলি দেবুর পাঠ্যপুস্তকের কবিতা।

সীতারাম জয়ধরের হাত ধরে বললে—সোনা ছেলে রে তুই, মানিক ছেলে! সে তাকে তেলমাখা গায়েই কোলে তুলে নিলে। অদ্ভুত ছেলে। শ্রুতিধর। বললে—আমার সঙ্গে পাঠশালায় যাবি চল। আমি তোকে পড়াব। বই শ্লেট সব কিনে দোব। জামা কাপড় দোব। তুই জজ ম্যাজিস্ট্রেট্ হবি।

সেই দিনই সে তাকে এনে পাঠশালায় ভর্তি করে নিয়েছে। বই দিয়েছে। শ্লেট দিয়েছে। জামা কাপড় দিয়েছে। তা ছাড়াও রোজ সকালে বাড়ি থেকে আসবার সময় সে আধ সের বাড়ির দুধ এনে জয়ধরের মায়ের হাতে দেয়।—খাওয়াবে জয়ধরকে।

ছোট ছেলে—সে দেহে বাড়বে—মনে বাড়বে—তার এখন বাড়বার সময়। কিন্তু পুষ্টি না পেলে বাড়বে কি করে? দুধ হল অমৃত। সে দেহ পুষ্ট করবে, লাবণ্য দেবে, মেধা বৃদ্ধি করবে। শুধু ভাত মুড়ি খেয়ে বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে পারবে কেন ?

আশ্চর্যের কথা, বদমাশ জয়ধর—ওই প্রথম দিনের বুকে তুলে আদর করার পর থেকেই যেন পাল্টে গেল। বললে না—পড়ব না!—হি-হি করে হাসলে না। প্রথম দিনেই সীতারাম দেখলে—অ-আ ক-খও জানে। খানিকটা চেনেও। মাস কয়েকের মধ্যেই ছেলেটা দ্রুতগতিতে এগুতে শুরু করলে। এখন জয়ধর ছুটছে। ছুটছে। অদ্ভুত ছেলে। সীতারাম মধ্যে মধ্যে বলে—জয়ধর আমার সন্দীপন পাঠশালার জয়ধ্বজা।

সময় সময় মনে হয়, তার ভাগ্যটা এখন ভাল চলছে। দীর্ঘদিনের পর একখানা চালাঘর সে তৈরি করিয়েছে। আটচালার মত শুধু একটা ছাউনি। ব্ল্যাক-বোর্ডখানা এনে লাগানো হয়েছে। ঘড়ি ম্যাপ—এগুলি এখনও টাঙাতে সাহস হয় না। চারিদিক খোলা, যদি কেউ নিয়ে যায় বা ভেঙে দিয়ে যায়! শিবকিঙ্করের দল এখনও আছে। তাদের অবশ্য আক্রোশ আর পূর্বের মত নাই, দীর্ঘদিনে তা হীনবল না হলেও, ক্রমশ যেন তাদের এই উৎসাহ শিথিল হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীর গতিতে মণিবাবুর দীপ্তিও যেন ম্লান হয়ে এসেছে।

সীতারাম স্পষ্ট দেখতে পায়, শুধু মণিবাবু নয়, এই রত্নহাটার বাবুদেরই যেন সমস্ত বহিরঙ্গটার চেহারা ক্রমশ ময়লা কাপড়-জামার মত হয়ে আসছে। প্রণাম গান্ধী মহারাজ, প্রণাম দেশবন্ধু, প্রণাম যতীন্দ্রমোহন, প্রণাম সুভাষচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে ধীরানন্দকেও সে প্রণাম করে। তোমাকেও প্রণাম। তুমিই তো এখানকার মান রেখেছ। এই স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে বাবুদের চেহারায় যেন কালের ছাপ পড়েছে। জমিদারদের,

মহাজনদের, সায়েব-সুবো-ঘেঁষা যারা, তারা যেন আগেকার আমলের শুভঙ্করী অঙ্করীতির মত পাঠ্যপুস্তক হতে বাদ যেতে বসেছে। তিন পাইয়ে এক পয়সার চলন হওয়ায় কড়া-গণ্ডার হিসেবের মত মান হারিয়েছে। হাল আমলে চলতি কথায় বই লেখার চলন হওয়ায় সে আমলের বিদ্যাসাগরী বড় বড় কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে লেখা বইয়ের মত অপ্রচলিত হয়ে যেতে বসছে বাবুরা। সীতারাম বেশ জানে যে, এ গ্রামের প্রধান জন এর পর হবে এই ধীরানন্দ সে সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ নাই। দীর্ঘজীবী হোক ধীরাবাবু। তাতে তার পরম আনন্দ। ধীরাবাবুরা তাদের জমিদার বলে আনন্দ নয়, ধীরাবাবু তাকে প্রীতির চোখে দেখেছিল, সে তাকে ভালবাসে, তাই তার আনন্দ। আঃ, ধীরাবাবু যদি তার বন্ধু না হয়ে তার ছাত্র হত তবে তার আনন্দ হত সব চেয়ে বেশী।

ধীরাবাবু আসবে—সেই পথ চেয়ে আছে সে। তার উন্নতি হচ্ছে কিন্তু তারও মধ্যে এড্ না-পাওয়ার দুঃখ অহরহ তাকে কষ্ট দেয়। রজনীবাবু বলেছিলেন, ভোটে রায়বাহাদুরকে সাহায্য করতে; সে তা করেছিল। কিন্তু তবু তার এড্ হয় নাই। হাজার হলেও রায়বাহাদুর! ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব, পুলিস সাহেবকে চটিয়ে তিনি কিছুই করতে সাহস করেন না। ধীরাবাবু এলে, তাঁকে নিয়ে সে একবার এর জন্য লড়বে। ধীরাবাবু ছাড়া পেয়েছে কিন্তু—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

জেল থেকে খালাস পাওয়ার পর আবার কিছুদিন তাকে পুলিস নজরবন্দী করে রেখেছিল। তা থেকেও ধীরাবাবু খালাস পেয়েছে। এখানে কিন্তু আসে নাই। মা গিয়েছিলেন ছেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। দেবু শ্যামুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মা ফিরে এসেছেন গম্ভীর মুখ নিয়ে। দেবু এবং শ্যামু কেঁদেছিল, এখনও মধ্যে মধ্যে কাঁদে। দাদা বাড়ি আসবে না।

ধীরাবাবু এখানকার সম্পত্তির সঙ্গেও সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছে। তার অংশের সম্পত্তি ভাইদের দিয়েছে।

দেবুই হঠাৎ একদিন বলে ফেলেছে, দাদা সেখানে একজন কায়স্থের মেয়েকে বিয়ে করেছে। বউদিদি বি. এ. পাস। তাই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া।

চমকে উঠেছিল সীতারাম।

দেবু বলেছিল, বলবেন না, মা তাহলে আমাকে বকবেন।

আশ্চর্য শিক্ষা! আশ্চর্য ধৈর্য মায়ের। একদিন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই মা। এই ছোট ছেলে, এরাও না।

এক-একবার সীতারামের মনে হয়, মাকে সে বলে, জোড়হাত করে অনুরোধ করে, ধীরাবাবুকে, তার বউকে নিয়ে আসুন। না হোক বউ আপনার স্বজাতির মেয়ে; সে লেখাপড়া-জানা মেয়ে, তাকে আনুন, ঘর আপনার উজ্জ্বল হবে, হেসে উঠবে, পবিত্র হবে। সকল জাত ছাড়া আরও দুটো জাত সংসারে আছে—শিক্ষিত আর অশিক্ষিত। আপনার

ছেলের সঙ্গে আপনার ছেলের বউয়ের জাতের কোন তফাৎ নাই। ধীরাবাবু শিক্ষিত, বউও শিক্ষিত। তারা সত্যিই এক জাতের। এ কথা আমি বুঝেছি প্রাণ দিয়ে।

সে কথা বলতে কিন্তু সাহস হয় নাই। মধ্যে মধ্যে এখনও ইচ্ছা হয়। সে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে। সে জানে, যতই স্নেহ করুন, তবু এঁদের সঙ্গে তার অনেক তফাত। ভাবতে ভাবতে সে উদাস স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। হঠাৎ একসময়ে কানে আসে, ছেলেরা গোলমাল করছে। তার অন্যমনস্কতার সুযোগে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে নিজেকে সংযত করে সজাগ হয়ে বসে, বলে, এই! এই! চুপ। পড়, পড় সব।

সাধারণ ছেলেরা পড়ায় মন দেয়। দুটি বাবুদের ছেলে সামনে এনে হাজির করে তাদের অভিযোগ।

—ও স্যার্ আমাকে মারলে। ঘুষি মেরেছে।

—ও আমাকে উল্লুক বলেছে স্যার্। দুটিই বাবুদের ছেলে।

সীতারামের ইচ্ছা হয় ওদের দুর্দান্তভাবে প্রহার করতে। তার দুর্ভাগ্য, বাবুদের যত দুষ্ট ছেলেগুলি হাই-স্কুলের পাঠশালার উচ্ছিষ্টের মত তার পাঠশালায় এসে জমে; তার ইচ্ছা হয়, চিৎকার করে বলে, ওরে, তোরা বাবুদের ছেলে, তোদের ঘরে ভাত আছে সিন্দুকে টাকা আছে। মান-ইজ্জৎ দালান-কোঠার ইটে চুনে চাপা হয়ে মজুত আছে, তোদের এতে দরকার কি? কেন গরীবদের ছেলের পড়ায় ব্যাঘাত করিস? আকু এসে তাকে পরিত্রাণ করে। সে ছাড়িয়ে দেয় ওদের। তার পিছনে খোঁড়া গোবিন্দ। গোবিন্দ চিৎকার করে।—এ চিৎকার গোবিন্দের অভিনয়। সীতারামের রাগ জল করে দিয়ে তাকে হাসাবার জন্যই সে এ অভিনয় করে। একেবারে প্রহ্লাদের গুরু ষণ্ডামার্কের মত—মেরেই ফেলব! খেয়ে ফেলব! ভাতে সেদ্ধ করে খাব! গরু-পেটা করব। উল্লুক-পেটা করব। সীতারামকে শেষ পর্যন্ত হাসতে হয়।

এখন পাঠশালায় ছেলে হয়েছে বাইশটি। আরও বাড়বে সে জানে। কৈবর্তদের মধ্যে, দাহা-স্বর্ণকারদের মধ্যে লেখাপড়ার ঝোঁক চেপেছে।

কখনও কখনও তার এই উদাসীনতা ভেঙে দেয় জয়ধর।

—মাস্টার মশাই!

—অ্যাঁ!

—এইখানটা দেখুন।

সাদরে তার পিঠে হাত বুলিয়ে সীতারাম হেসে বলে, কোন্‌খানটা বৎস?

—এই যে!

সীতারাম তাকে বলে, বসো, এইখানে বসো। তারপর সে তাকে বুঝাতে আরম্ভ করে। কোনদিন সে আসে, মাস্টার মশাই, এই অঙ্কটা বইয়ের উত্তরের সঙ্গে মিলছে না!

সীতারাম ভাল করে দেখে জয়ধরের কষা অঙ্ক। কোনখানে ভুল নাই। নিজে কষে

দেখে একবার। জয়ধরের উত্তরের সঙ্গেই মিলে যায়। সে বলে, উত্তর ভুল আছে। কেটে তোমার উত্তর বসিয়ে দাও। তারপর সে অদ্ভুত ভাষায় জয়ধরকে আদর করে।—ওরে কুরকুরির মা! ভুরভুরির ছা! এর মানে যে কি সে তা জানে না। শিখেছে তার পণ্ডিতের কাছে হুগলীতে। তিনিও খুশী হলে এই বলে আদর করতেন। সেও করে। প্রাণ খুলে অকারণে হাসে। সব চেয়ে তার বড় আনন্দ, জয়ধর নিতান্ত গরীব ছেলে, বাবুদের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে।

জয়ধর ছোট থেকে বড় হবে। সামান্য জয়ধর অসামান্য অসাধারণ হয়ে উঠবে—এই তার বড় আনন্দ। সে এই বাবুদের ছেলে হলে এত আনন্দ তার হত না। মধ্যে মধ্যে তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়, ওরে, ওরে তোরা বাবুদের ছেলেরা, তোরা দেখ্! তোরা দেখ্!

জয়ধর যে বৃত্তি পাবে, তাতে তার সন্দেহ নাই। জয়ধর পড়ে, নির্ভুল উত্তর দেয়, অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় ফুটে ওঠে তার পড়াশুনার মধ্যে। মধ্যে দেবুর পড়াশুনায় অমনোযোগ লক্ষ্য করে তার দুঃখের বদলে আনন্দ হয়। একদিন এই বাড়ির ঝিয়ের ছেলে জয়ধর, এ বাড়ির অন্যতম উত্তরাধিকারীকে ম্লান করে দিয়ে ফুটে উঠবে। পরক্ষণেই সে নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হয়। না, এমন কামনা করা তার উচিত নয়। কামনা না করলেও, অবশ্য তাই যে হবে সে তা জানে; তবু কল্পনায় আনন্দ অনুভব করা তার পক্ষে অন্যায় হবে। এ বাড়ির কাছে তার ঋণ অনেক। হঠাৎ একটা ছেলের কান্নায় তার চিন্তার আনন্দ-স্বপ্ন ভেঙে গেল।

মরেছে রে, মরেছে! একটা ছেলের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কি হল? ওরে, এই রাধাশ্যাম, কি হল? কে মারলে?

রাধাশ্যাম ধীবরদের ছেলে। নাক দিয়ে দরদরধারে রক্ত পড়ছে। একদণ্ড শান্তি যদি আছে অদৃষ্টে! কে মারলে? গোবরা বুঝি?

—না স্যার্।—আকু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে। সে শুশ্রূষা করছিল রাধাশ্যামের, বললে, নাকে পেন্সিল ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—পেন্সিল?

—হ্যাঁ। এত বড় একটা শ্লেট-পেন্সিল নাকে ঢুকিয়ে ঠেলে দিয়েছে।

—কি বিপদ! সীতারাম ব্যস্ত হয়ে ছেলেটিকে নিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে মনে হল। কিন্তু উপায় করলে আকু। বললে, নস্যি দেন স্যার, হাঁচলেই বেরিয়ে যাবে। কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হল সীতারামের। আকু তার নস্যির কৌটাটা সীতারামের হাতে দিলে।

গোবিন্দ ঠিক এই সময় এল; খোঁড়া পায়ে নাচতে নাচতে এসে বললে, সাব-ইনস্পেক্টার

আসছে পণ্ডিত।

—স্যার্!

সাব-ইন্স্পেক্টার! তার জন্য সীতারাম ব্যস্ত হল না। এড্‌ই পায় না। তার পাঠশালাকে মঞ্জুরই দেয় নাই আজও পর্যন্ত; সাব-ইন্স্পেক্টারের জন্য ব্যস্ত হওয়ার তার তাগিদ কিসের? তার চেয়েও তাগিদ, রাধাশ্যামের নাকে রক্ত পড়ছে। নাকে নস্য দিয়ে দিলে সীতারাম।

বাইরে বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল। ছেলেটা ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল পেন্সিলটা। বাইসিক্লের ঘণ্টাটা আবার বাজল। সাব-ইন্স্পেক্টারবাবু বাইরে থেকেই ডাকছেন, পণ্ডিত! সীতারাম! নতুন সাব-ইন্স্পেক্টার অম্বলের রোগী, ওলপ্রিয়, আধুনিক-লেখকবিরাগী সাব-ইন্স্পেক্টার।

সাব-ইন্স্পেক্টার কিন্তু ভাল খবর নিয়ে এসেছেন। নতুন ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড ইলেক্‌শন হয়েছে আবার কিছুদিন আগে। ইলেক্‌শনের ফল বেরিয়েছে। এবার রায়বাহাদুরের দল হেরে গিয়েছেন। কংগ্রেস জিতেছে প্রায় সব থানাতেই। সাব-ইন্স্পেক্টার হেসে বললেন, এইবার তোমার উপায় হবে সীতারাম।

—উপায় হবে? সীতারাম যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

—হবে হে হবে। এই নতুন বোর্ড হবার অপেক্ষা।

সীতারাম প্রণাম করলে সাব-ইন্স্পেক্টারবাবুকে।

সাব-ইন্স্পেক্টার বললেন, পণ্ডিত, আমরা সরকারী চাকরি করি, চাকরির দায়ে আমরা নিজেকে বেচেছি। দেশের হয়ে কথা বলবার উপায় নাই। তোমার উপর যেসব কাণ্ড হয়েছে সামান্য অপরাধে, তাতে দুঃখই পেয়েছি মনে মনে; কিন্তু করতে তো কিছু পারি নাই। রজনীবাবু বার বার করে তোমার কথা বলে গিয়েছিলেন আমাকে—তা এইবার হবে। বোর্ড কর্ম হলে পর চেয়ারম্যানের কানে একবার তুলতে পারলে হল। তোমার ইস্কুলের ছাত্রেরা বলেছে, মহাত্মা ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। চেয়ারম্যান ডবল গ্র্যাণ্ট দেবেন তোমার পাঠশালায়। আমি চেষ্টা করছি ব্যাপারটা তাঁর কানে তুলতে।

প্রবীণ ইস্কুল সাব-ইন্স্পেক্টারবাবুটি লোক ভাল। রজনীবাবুর মতই ভাল লোক। ভদ্রলোক রুগ্ন বলে মধ্যে মধ্যে অকারণে চটে ওঠেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যান। এক হিসেবে রজনীবাবুর চেয়েও ভাল, অন্তত পণ্ডিতদের পক্ষে ভাল। পণ্ডিতদের হয়ে তিনি উপরের সঙ্গে বাদানুবাদ করেন।

সীতারাম আজ শুধু খুশীই হল না, সে নিজেকে কৃতজ্ঞ বোধ করল সাব-ইন্স্পেক্টারের

কাছে। পরের দিনই সকালে সে সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবুর বাসায় উপস্থিত হল বড় একটি ওল হাতে নিয়ে। সকৃতজ্ঞভাবে নামিয়ে দিয়ে বললে, আমার বাড়িতে হয়েছিল স্যার।

সাব-ইন্‌স্পেক্টারবাবু অভিভূত হয়ে গেলেন, চমৎকার, চমৎকার ওল! চমৎকার! তিনি নিত্য ওলসিদ্ধ খান। যেখানেই যান খোঁজ করেন, পণ্ডিত, তোমাদের এখানে এখন ভাল ওল পাওয়া যায়? আজ সীতারামের হাতের ওল দেখে তিনি নিজেই গলে গেলেন। বাঃ বাঃ বাঃ।

তারপর ওলটি রেখে এসে বললেন, বসো সীতারাম, ফাইলটাই তোমাকে দেখাই। দেখ, আমি কত লিখেছি তোমার জন্য। হয়ে যাবে, আমি বলছি, হয়ে যাবে তোমার। তারপর আর একটি খবর দিই চুপি-চুপি। কংগ্রেসী বোর্ডের যিনি চেয়ারম্যান হবেন—তিনি তোমার ধীরাবাবুকে বড় ভালবাসেন যে। তাঁর মত হল, ধীরানন্দ একটা দিগ্‌গজ লেখক। কবে নাকি রবি ঠাকুরের কাছে গেছিলেন, রবি ঠাকুর তাঁকে বলেছেন—ওঁর মধ্যে জিনিস আছে। বুঝেছ? ধীরাবাবুর জন্যে তোমার গ্র্যাণ্ট গিয়েছে, সে গ্র্যাণ্ট এবার ডবল হয়ে ফিরবে। হাসতে লাগলেন তিনি।

সীতারাম আশান্বিত হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে সেই দিনের। সেইটাই হবে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। আশান্বিত দৃষ্টিতে সে ভবিষ্যতের দিকে চায়।

কচি কচি মুখ নিয়ে বসে পড়বে তারা। আসুক সে দিন, ঘর তুলবে সে পাঠশালার জন্য। পাকা মেঝে। বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে ওদের জন্য। চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, ক্লক-ঘড়ি, ম্যাপ, গ্লোব, চক-পেন্সিল, ডাস্টার—কত আসবাব করতে হবে। সে বললে—তবে আমি আজ যাই।—দাঁড়াও। একটি দু'আনি দিয়ে সাব-ইন্‌স্পেক্টার বললেন—এটি নিয়ে যাও। ওলের দাম। উহুঁ, নিতেই হবে। না হলে ঘুষ নেওয়া হবে আমার।

বিচিত্র মানুষ!

বৈকালে সে ঝরনার ধারে গিয়ে অভ্যাসমত বসল। আজ সে কল্পনাকে খাঁচার দোর খুলে পাখির মত উড়িয়ে দিলে। এড্ পাবে সে এইবার। তার সাধ পূর্ণ হবে। সে যেন পণ্ডিত-দের সামনে এতদিন একঘরে হয়ে ছিল। এইবার সে জাতে উঠবে। ঘাট মেনে, অপরাধ স্বীকার করে জাতে ওঠা নয়। নিজের জেদ বজায় রেখে সে জাতে উঠবে। ভবিষ্যতের পাঠশালার জমজমাট চেহারা সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

"সন্দীপন পাঠশালা। রত্নহাটা। শিক্ষক—শ্রীসীতারাম পাল।" বর্ষায় রৌদ্রে লেখা ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে আসবে। বৎসর বৎসর তার উপর সে কালি দিয়ে নূতন করে লিখবে। তার চুল সাদা হয়ে আসবে, দৃষ্টি কমে আসবে, চশমা নিয়ে সে পড়াবে। ছেলেরা বসে পড়বে। কচি কচি মুখ। একদল যাবে আর একদল আসবে। তাদের পড়ানো শেষ করিয়ে আশীর্বাদ করবে, আমার তো দুঃখেরই জীবন, দুঃখকষ্টের ভাগ্য নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

তোমরা কিন্তু উন্নতি কর, সুখী হও। সেই দেখেই সব চেয়ে বড় সুখ পাব আমি।

সংসারের কষ্ট তার সত্যিই কিছু বেড়েছে। কিছু বেড়েই ক্ষান্ত নাই, দিন দিন বাড়ছে। বাপের শ্রাদ্ধের সময় কিছু ঋণ করেছিল, ভেবেছিল, পাঠশালার আয়টাই সে মাসে মাসে দিয়ে যাবে। তাতে অন্তত সুদটা মিটে থাকবে। কিন্তু তাও হয় নাই। পাঠশালার আয়ই বা কি ছিল তার এতদিন! অন্যদিকে ধানের দর নেমে যাচ্ছে দিন দিন। অল্পস্বল্প জমির আয় আরও কমছে। এড্‌টা পেলে এবার কিছু সুবিধা হবে। মাসে পাঁচ টাকা আয়বৃদ্ধি তো তার মত লোকের পক্ষে কম নয়!

পরক্ষণেই তার হাসি গেল। পাঁচ টাকা! হায় রে! দুনিয়া পাল্‌টাচ্ছে দিন দিন। বাজারের পথে যেতে গেলে নিত্য নতুন জিনিস চোখে পড়ে। মন যেন কাঙাল হয়ে ওঠে। পাঁচ টাকা আয় বাড়লে, তার একটা কণাও কি সে পেতে পারবে? মধ্যে মধ্যে কত জিনিস কিনতে সাধ হয়। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে নিজের মনকে শাসন করে, তুমি পাঠশালার পণ্ডিত, তুমি ওদিকে তাকিও না। "ছোট ঘরে বড় মন নিয়ে" জীবন কাটাতে হবে তোমাকে। মধ্যে মধ্যে এই ভাবনাটা তার সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। সে ভাবে ভবিষ্যতের কথা। কন্যার বিবাহ আছে। তার এবং মনোরমার জীবনে অসুখ-বিসুখ আছে। সে-ই যদি অসুখে কয়েক মাস শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকে, তবে!

মনে পড়ে যায়, রজনীবাবুর আপিসে কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথাগুলো। বৃদ্ধ পণ্ডিত টাকার অভাবে বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁরই সমবয়সী এক বৃদ্ধের সঙ্গে। কন্যাটি বিধবা হয়েছে। তার সৎ-ছেলেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েটি এখন কোথাও বাবুদের বাড়িতে ভাত রান্না করে। বুড়ো পণ্ডিতের নিজের অবস্থাও এখন শোচনীয়। তার পণ্ডিতি করার সামর্থ্য গিয়েছে; সে এখন ভিক্ষা করে। গ্রামে গ্রামে ফেরে, অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে দুদিন একদিন থাকে, স্তব-স্তুতি করে দু আনা চার আনা নিয়ে পনেরো বিশ দিন অন্তর বাড়ি যায়।

সে শিউরে ওঠে। তারও কি শেষ পর্যন্ত এমনই দশা হবে? একমাত্র সান্ত্বনা, তার কিছু জমি আছে। আর সান্ত্বনা, সন্তান ওই একটি কন্যা ছাড়া আর হল না। তার বড় সাধ ছিল একটি পুত্র-সন্তানের। তাকে সে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলত। কিন্তু সে থাক্‌। ভগবান আর যেন কোন শিশুকে তার ঘরে না পাঠান। দরিদ্র শিক্ষক সে, কোন্ সম্বল থেকে তাকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবে!

কল্পনা-চিন্তার মধ্যে অকস্মাৎ তার মন সচেতন হয়ে ওঠে। কোনদিন মাথার উপর দিয়ে পেঁচা ডেকে যায়, কোনদিন মাথার উপর বাদুড়ের পাখার শব্দ বেজে ওঠে, কোনদিন কাছেই ডেকে ওঠে শেয়াল। সে সচেতন হয়ে উঠে আকাশের দিকে তাকায়। অন্ধকার আকাশ, কষ্টিপাথরের মত কালো আকাশে তারা ফুটে উঠেছে। চাঁদনী রাত্রে জ্যোৎস্নায়

ঝলমল করে চারিদিক; মাটির উপর তার ছায়া পড়েছে দেখা যায়। তার মনের মধে ভেসে ওঠে, আলোক-প্রতিবিম্বিত একটি পর্দাটাঙানো জানলা, পর্দার উপর কালো ছায়া জেগে রয়েছে—একখানি মুখ, টিকলো নাক, পিছনের দিকে আল্‌গা বাঁধা এলোখোঁপা সে হাঁটতে আরম্ভ করে। এসে দাঁড়ায় বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে ফিরে আসে।

আজকাল সন্ধ্যায় তার অবসর হয়েছে। শ্যামু অনেক আগেই রাত্রে অন্য মাস্টারের কাছে ইংরেজী পড়া শুরু করেছে, কিছুদিন হল দেবুও সেখানে পড়তে যাচ্ছে। আজকাল সে বেশ অবসর করে এই ছবিখানি দেখতে পায়।

মনোরমা অনুযোগ করে, রাত্রে যখন পড়াতে হয় না, তখন ছুটির পর বাড়ি এলেই পার।

সীতারাম বলে, দিনে পাঠশালায় চাকরি, তার উপর বাড়ির চাকরি! এইটুকু ছুটি দেবে না আমাকে?

কিষাণ-বউটা আপনার পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, বলি পণ্ডিত মুনিব!

—কি?

—বলি এইবার তাহলে মেনে-টেনে নিলে তুমি?

—কি মেনে নিলাম? হাসে সীতারাম।

—এই, মুনিব্যানের মালিকি-টালিকি? মুনিব্যান যা বলবে-টলবে তাই মানবে? এইবার তবে পরিবারকে হুজুর বললে!

মনোরমা হাসে, মর্ তুই।

সীতারাম বলে, তোকে যে বললাম, তোর ছেলেটার ভারি বুদ্ধি, ওকে দে পাঠশালায়! ত কি হল?

—ওই দেখ! বাউড়ীর ছেলে পড়ে-টড়ে তো আর হাকিম-টাকিম হবে না। মিছে সময়-টময় নষ্ট-মষ্ট করে কি হবে?

সীতারাম এবার রসিকতা করে তাকে বলে—তবে তুই ভর্তি হ' আমার পাঠশালায়! তোর যে রকম বুদ্ধি-টুদ্ধি তুই বৃত্তি-মৃত্তি পাবি-টাবি। ওঃ, যা ধরেছিস-টরেছিস তুই আমাকে আজ! সে হাসতে লাগল।

চোদ্দ

আরও বৎসর দুয়েক পর।

সীতারামের মনে হল, পৃথিবীতে তার চেয়ে সুখী আর বোধ হয় কেউ নাই। মনে হল, এই দিনটির জন্য বোধ হয় সে আজন্ম তপস্যা করেছিল।

মণিলালবাবু এলেন তার পাঠশালায়। তার আগে বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। দুঃখের পর এল সুখের পালা। প্রথমেই জয়ধর পেলে বৃত্তি। জেলার মধ্যে হল প্রথম। সে রেকর্ড মার্ক পেয়েছে। তারপরই হল পাঠশালার জয়জয়কার। মণিবাবু এলেন সেই জয়জয়কারের পর।

পাঠশালা তখন মঞ্জুরী পেয়েছে, গ্র্যান্ট পেয়েছে। পাঠশালার বাড়িও হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নিজে এলেন তার পাঠশালায়। ধীরাবাবু দীর্ঘজীবী হোন। ধীরাবাবুই নিয়ে এলেন।

এসবের আগে হঠাৎ একদিন এসেছিলেন ধীরাবাবু। একাই এসেছিলেন। মা চিঠি লিখেছিলেন, একবার দেখতে ইচ্ছা হয় তোকে ; তবে একাই আসবি।

ধীরাবাবু, সেই ধীরাবাবু!

সীতারামকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, পণ্ডিত, তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি।

ধীরাবাবু তাকে ভালবাসে শুনে সে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। কত কথা বলেছিল, তার নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা। তারপর সে ধীরাবাবুকে তাঁর বউয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।—বউদি! কেন আনলেন না তাঁকে ?

—তিনি তো চাকরি করেন। তিনি ঢাকায় গার্লস ইস্কুলের মাস্টার। আমি কলকাতায় থাকি। ছোট একটা মেসে থাকি এখন। আগে একটা টিনের ঘরে থাকতাম, পাইস-হোটেলে খেতাম।

—টিনের ঘরে থাকতেন ? পাইস-হোটেলে খেতেন ?

—হ্যাঁ। তখন যেমন উপার্জন তেমনই ছিলাম পণ্ডিত। জান তো, লিখে উপার্জন করা আমাদের দেশে কত কঠিন! হাসলেন তিনি।

ধীরাবাবু লেখক হবেন! বই লিখে তিনি জীবিকা অর্জন করতে চান! আশ্চর্য মানুষ! ধীরাবাবু তাঁর ক'খানা বই তাকে দিয়ে গিয়েছেন। সে পড়েছে। বেশ লিখেছেন, চমৎকার লিখেছেন ধীরাবাবু। বিয়ে করেছেন—স্ত্রী চাকরি করে। অথচ তাঁর বাড়িতে অন্নের অভাব নাই। বিচিত্র!

বই ক'খানা হাতে পেয়ে সেদিন তার লজ্জার অবধি ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল, ধীরাবাবুর সেই বই ক'খানা আজও তার বাড়িতে রয়েছে। একবার মনে হয়েছিল, ধীরাবাবুর দুটি হাতে ধরে সে সে-কথা প্রকাশ করে তাঁর কাছে। কিন্তু সেও সে পারে

নাই। সেই সমস্ত বইয়ের একখানার খোঁজও করেছিলেন ধীরাবাবু—বইখানা যেন কিনেছিলাম মনে হচ্ছে!

সীতারাম বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়েছিল, অনেক চেষ্টা করে বলতে চেয়েছিল, আমি একবার দেখব আমার বাড়িটা খুঁজে? কিন্তু সে দুবার শুধু বলেছিল, আমি, আমি—

ধীরাবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, দেবা, না হয় শ্যামা কোনখানে দিয়ে থাকবে আর কি!

ধীরাবাবুই নিয়ে এলেন ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যানকে। কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ করে বই আনলেন সন্দীপন পাঠশালায় প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের জন্য। নিজে গিয়ে চেয়ারম্যানকে নিয়ে এলেন।

সীতারাম পাঠশালার রিপোর্ট লিখেছিল। ধীরাবাবু দেখে দিলেন। কম্পিতকণ্ঠে সে রিপোর্ট পড়লে। সন্দীপন নামের ইতিহাস পৌরাণিক। সীতারাম লিখেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুরু। ধীরাবাবু কেটে করেছিলেন—"মহামানব শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সান্দীপনি মুনির পাঠশালার নামে এই পাঠশালার নামকরণ হইয়াছে।"

গ্রামের ভদ্রলোকেরা অনেকেই সেদিন এসেছিলেন। বড় ইস্কুলের মাস্টারেরাও উপস্থিত ছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীও এসেছিলেন। কালো লম্বা মেয়েটি, একটু যেন বেশী কালো দেখাচ্ছিল। মেয়েটির জীবনেও যেন কোথাও দুঃখ আছে। হয়তো কালো বলে খানিকটা লজ্জাও আছে। চমৎকার সম্ভ্রমের সঙ্গে বসে ছিলেন সারাক্ষণ।

চেয়ারম্যান বলেছিলেন, যে পাঠশালার ছাত্র, ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে অহিংসা ও সত্যের প্রতিমূর্তি মহাত্মা গান্ধীর নাম করতে পারে, সে পাঠশালাকে আমি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি!

চেয়ারম্যান মাসে ছ টাকা এড্ মঞ্জুর করে দিয়েছেন। পাঠশালার বাড়ির জন্য এককালীন একশো টাকা দান দিয়েছেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে। আসবাবের জন্য ত্রিশ টাকা।

ঘর হয়েছে। আসবাবও কিছু হয়েছে। কিন্তু আরও চাই। সেও বোধ হয় হবে। গ্রামের লোক প্রসন্ন হয়েছে। চেয়ারম্যানের প্রশংসা পেয়েছে সে, তার জয়ধর তার জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে।

এবারও একটি ভাল ছেলে আছে—নরেন্দ্রনাথ মুখুজ্জে। সেও বৃত্তি পাবে। এটি বাবুদের ছেলে। কিন্তু সীতারামের এতেও খুব আনন্দ এই কারণে যে, এই ছেলেটিকে বড় ইস্কুলের পাঠশালা থেকে প্রায় বর্জন করেছিল অপদার্থ হিসেবে। অপদার্থই ছিল। দুর্দান্ত ছেলে। কিন্তু ভারি সুন্দর চেহারা। চেহারা দেখে মমতা হয়েছিল বলেই সে তাকে নিয়েছিল। তারপর সে আবিষ্কার করলে, মিষ্ট কথা বললে ছেলেটি বড় ভাল। আরও আবিষ্কার করলে, মাইনের তাগাদা করলেই সে ইস্কুল কামাই আরম্ভ করে দেয়, তার দুর্দান্তপনা বেড়ে যায়। সে তার

মাইনে চাওয়া বন্ধ করে দিলে। ছেলেটা দেখতে দেখতে পাল্টে গেল। সে বৃত্তি পাবে।

সীতারাম তাকেই পড়াচ্ছিল। এই তার জয়ের দ্বিতীয় সোপান।

হঠাৎ মণিলালবাবু এলেন পাঠশালায়। এই সীতারামের পাঠশালা! বাঃ! বেশ। বেশ। এ যে বেশ করেছ হে!

সীতারাম তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একখানি চেয়ার এগিয়ে দিলে, বসুন, আপনি বসুন।

মণিবাবু বসলেন। নামটি তোমার খুব ভাল হয়েছে পণ্ডিত—সন্দীপন পাঠশালা। সম্যকরূপে দীপন, জীবন বহ্নিময় করা!

সীতারাম বললে, ও নাম আমার দেওয়া নয়। ধীরাবাবু দিয়েছিলেন।

—ধীরানন্দ! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মণিবাবু বললেন, ছোকরা অবশ্য নামডাক করেছে শুনতে পাই। কিন্তু—। তিনি একটু থামলেন। তারপর বললেন, বংশে কালি দিলে। কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করলে শেষটা! বউ নাকি আবার চাকরি করে।

সীতারাম চুপ করে রইল। কঠোর উত্তর তার জিভের ডগায় এসে ঘুরছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সে সংযত করলে। হাজার হোক মানী ব্যক্তি, তিনি এসেছেন ওর পাঠশালায়, তিনি অতিথি।

মণিলালবাবু কাকে যেন বললেন, কই রে? অ্যাঁ?

তাঁর চাকর এসে ঢুকল একটি ছেলের হাত ধরে।

মণিবাবুর পৌত্র; ওঁর ছেলে ধীরাবাবুর বয়সী, তিনি নিজে ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়েছেন: এটি তাঁরই ছেলে।

মণিবাবু বললেন, আমার এই পচুকে, শ্রীমান পঞ্চাননকে তোমার পাঠশালায় ভর্তি করে দিতে এলাম। নাও, ভর্তি করে নাও। আর একটা কথা। একে তোমাকে প্রাইভেটেও পড়াতে হবে। মোট কথা, গোড়াপত্তন করে দিতে হবে।

সীতারামের মনে হল, এমন শুভদিন আর বুঝি আসে নাই তার জীবনে। মণিবাবুকে প্রণাম করে পঞ্চাননকে ভর্তি করে নিলে সে। বললে, বাবু, প্রাইভেট পড়ানো আমার পক্ষে আর হবে না। তবে লোক আমি দেখে দোব।

মণিবাবু একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন, বললেন, আচ্ছা, তবে লোকই দেখে দিও। ভাল লোকই দেবে তা জানি। তবে তুমি সৎ লোক। তুমি হলেই ভাল হত।

সীতারাম চুপ করে রইল।

মণিলালবাবু চলে গেলেন। সীতারাম নোট করে রাখলে দিন-তারিখটি তার একখানি খাতায়। এই খাতায় সে লিখে রাখে তার জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলি। ধীরাবাবু তাকে বলে গিয়েছেন, মাস্টার, তোমাকে নিয়ে আমি বই লিখব। তুমি বুড়ো হও। আমি তখন

একদিন আসব। এসে তোমার জীবন-কথা শুনে যাব।

সীতারাম তাই খাতা বেঁধেছে। সে লিখে রাখে জীবনের স্মরণীয় ঘটনা এবং তারিখগুলি। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান যেদিন এসেছিলেন, সেই তারিখটি সে প্রথম লিখেছে। তারপর লিখেছে জয়ধরের বৃত্তি পাওয়ার তারিখ। মাত্র দুটি তারিখ লেখা হয়েছে। তার আগে—গোড়ার দিকে কাহিনীগুলি গুছিয়ে নিয়ে রেখেছে। তারও মধ্যে আছে কয়েকটি তারিখ। যে তারিখগুলি বাবুদের ঘরের দেওয়ালে লেখা ছিল সেই তারিখগুলি। সাদা খাতাটা উল্টে মধ্যে মধ্যে তার হাসি পায়। আপনার মনেই হাসে। কি লিখবে ধীরাবাবু? জীবনের রঙে জৌলুস নাই, স্বরে বাহার নাই, এ নিয়ে ছবি হয়, না এ নিয়ে গান হয়!

তবু লিখে রাখে। আজও রাখবে—৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬।

*　　*　　*　　*

আট মাস পর।

১৯২৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর খাতা খুলে তারিখটা লিখলে সে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করলে।

পূজোর ছুটি হবে পরশু। আশ্বিন মাস, নীল আকাশে শরতের রৌদ্র ঝলমল করছিল। মধ্যে মধ্যে সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে বকের ঝাঁক। অপরূপ প্রসন্নতায় যেন দিগ্‌দিগন্ত ভরে উঠেছে। কিন্তু সীতারামের হঠাৎ মনে হল, সব ম্লান হয়ে গেছে।

সীতারাম সেদিন তখন ছেলেদের কাছে চাঁদার জন্য আবেদন জানাচ্ছিল, পূর্ববঙ্গে বন্যা হয়েছে, বহু গ্রাম ভেসে গিয়েছে, বহু প্রাণহানি ঘটেছে, শস্য নষ্ট হয়েছে। বড় বড় নেতারা—সুভাষ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাহায্যের জন্য দেশের কাছে হাত পেতেছেন। চারিদিকে চাঁদা উঠছে। বড় ইস্কুলে চাঁদা তুলছে। তোমরাও কিছু করে দাও। যে যা পারবে—দু আনা, চার আনা, যা পারবে। এখন থেকেই তো শিখতে হবে এসব। বড় জায়গা থেকে চাঁদা যাবে, তার সঙ্গে সন্দীপন পাঠশালার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের সাহায্য বলে কিছু পাঠাতে হবে বইকি! অন্তত পাঁচটা টাকা। যা পার তোমরা দাও, বাকিটা আমি দোব।

হঠাৎ আকু এসে ঢুকল। আকু এখন বেশী বখেছে। বিড়ি খায়, তামাক খায়, রাত্রে ফিষ্টি করে। এখানে আর বেশী আসে না। আড্ডা এখন স্টেশনে; কুলিদের হয়ে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে দরদস্তুর করে, ঝগড়াও করে; কুলিরা বিড়ি খাওয়ায়, চায়ের দাম দেয়, আকু তাতেই খুশী। মধ্যে মধ্যে পাঠশালায় সে আসে, মাস্টার মশায়ের খোঁজখবর করে যায়। গ্রামের খোঁজখবরও দিয়ে যায় সীতারামকে। গোবিন্দও সরে গিয়েছে আকুর সঙ্গে। সে এখন আকুর অনুচর। শুধু রাত্রে এসে শুয়ে থাকে এখানে।

সীতারাম তাকে দেখে হেসে প্রশ্ন করলে, কি খবর আকু?

আকু বিড়ি খাচ্ছিল, সেটা সে ফেললে না; ফেলে না আজকাল, সুকৌশলে হাতের আলগা মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। বিড়িটা লুকিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আকু বললে, মুশকিল হয়ে গেল স্যার্। খানিকটা দড়ি চাই। বিছানার চামড়ার বাঁধনটা ছিঁড়ে গেল।

হাসলে সীতারাম। পরোপকার করছে আকু।

আকু বললে, বিছানার ভেতরে রাজ্যের জিনিস ভরেছে। বললাম তখন, তা শুনলে না। লেখাপড়া শিখলে কি হবে! হাজার হলেও মেয়েলোক তো! ওই বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমণি স্যার!

সীতারাম ব্যস্ত হয়ে উঠল, দড়ি—এই যে, এই দড়িটা নিয়ে যা। সে বার করে দিলে ছেলেদের জন্যে কেনা স্কিপিং-রোপের একটা দড়ি।

বেশ হবে। ভাল হবে। আকু বললে, খুব মায়া লাগল স্যার্, দিদিমণি অনেকদিন ছিল এখানে। চলে যাচ্ছে, আর তো এখানে আসবে না। আমার বোন পড়ে কিনা। তাকে দিয়ে আমাকে ডেকে বললে, আকু, তুমি যদি আমার যাওয়ার সময় একটু সাহায্য কর, কুলি ডেকে ঠিক করে দাও তো ভাল হয়। ভারি মায়া লাগল স্যার্। অনেকদিন ছিল আমাদের এখানে; আর তো আসবে না। শুনে দুঃখ হল। তাই দিলাম সব ঠিক করে। তা—পথে বিছানার চামড়া ছিঁড়ে গেল। গোবিন্দকে পাহারায় রেখে এসেছি।

সীতারামের মনে হল, শরৎকালের এই প্রসন্ন অপরাহ্নটা অকস্মাৎ ম্লান হয়ে গেল। চলে যাচ্ছেন। চলে যাচ্ছেন! সীতারাম অভিভূতের মত আকুর সঙ্গে বেরিয়ে এল।

ভাল চাকরি পেয়েছেম, তাই চলে যাচ্ছেন! রাস্তার উপর ছিঁড়ে পড়েছে বিছানাটা। আকু বাঁধতে লাগল বিছানা কুলিটাকে নিয়ে। গোবিন্দ কুড়িয়ে দিলে জিনিসগুলি। সীতারামও দিলে কয়েকটা। বিছানার মধ্যে সেই পর্দাটা বাঁধা। আকু চলে গেল। কিন্তু তিনি কই?

তিনি বোধ হয় অন্য রাস্তায় চলে গিয়েছেন স্টেশনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আলোকিত পর্দার গায়ে আর এ মুখ ভেসে উঠবে না কোনদিন। সে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে।

ট্রেন আসছে, ঘণ্টা পড়ছে। ঘড়িতে বাজছে তিনটে পনেরো। সীতারাম হঠাৎ ছুটে ফিরে গেল পাঠশালায়, হাতুড়িটা নিয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে।

—ওরে, ছুটি আজ—ছুটি। আমার মনে ছিল না। একবার জংসনে যেতে হবে আমাকে। আজ ছুটি। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সে ছুটল। তাকে জংসনে যেতে হবে। যেতেই হবে।

ট্রেন এসে গিয়েছে। একখানা ফাঁকা ইণ্টার ক্লাসে তিনি উঠে বসে আছেন।

ইস্কুলের মেয়েরা এসেছে; তাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন, কথা বলছেন। সে ছুটে গিয়ে একখানা টিকিট কিনলে, জংসন, ইণ্টার ক্লাস একখানা। জংসন এখান থেকে সাত মাইল।

ওখানে গিয়ে এই লাইন শেষ হয়েছে। গাড়ি বদল করতে হবে ওখানে। সে চেপে বসল সেই কামরাটারই অন্য প্রান্তে। ট্রেন ছাড়ল।

উদাস দৃষ্টিতে মেয়েটি চেয়ে রয়েছে গ্রামের দিকে। ক্রমশ সে উদাসীনতা মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল নিরাসক্তি।

কালো লম্বা মেয়েটি; বকের পালকের মত সাদা ধোয়া খদ্দরের নীলপাড় শাড়ি পরনে, গায়ে আজ ফিকে লাল রঙের ব্লাউজ, পায়ে স্যাণ্ডেল; মাথায় ঘোমটা নাই, পরিচ্ছন্ন নিপুণতার সঙ্গে চুলগুলি এলোখোঁপায় বাঁধা। কাঁধে একটা খদ্দরের ঝোলা।

কয়েকবারই সীতারামের ইচ্ছা হল, একটি কথা বলে, বলে—চলে যাচ্ছেন আপনি? কিন্তু কিছুতেই পারলে না সে। না-না, সে পাঠশালার পণ্ডিত।

জংসন স্টেশনে কুলি ডেকে সে তাকে সাহায্য করবে ভাবলে। কিন্তু পারলে না। তিনি নিজেই ডেকে নিলেন কুলি। জিনিস চড়াবার সময়ও সে একবার এগিয়ে গেল, গিয়েও আবার পিছিয়ে এল। গাড়ি চলে গেল।

সে নোট-বইটা আবার একবার খুললে। ভেবেছিল, তারিখটা কেটে দেবে। কিন্তু না, থাক্। বরং আরও খানিকটা লিখলে।

জীবনে ছিল এক ফোঁটা রঙ, রাত্রে অন্ধকারে আব ছায়ায় ফুটে থাকত আকাশের নীহারিকার মত; সেও মুছে গেল ১৯২৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর। উদাস মনে সে ফিরে এসে বসল রস্থহাটার ট্রেনে। অনেক সময় হাতে। হঠাৎ মনে হল, এখানকার বইয়ের দোকান থেকে খানকয়েক বই কিনে নিলে হয় না! আজকাল সে পাঠশালায় পাঠ্য বইয়ের ব্যবসা করেছে। সব পণ্ডিতই করে। বছরে একবার, পাঁচ-সাত টাকা লাভ। মাসে দশ-পনেরো টাকা যাদের আয় তাদের কাছে বছরে পাঁচ-সাত টাকাই যে অনেক। খানকয়েক মানে-বই চাই। মানে-বইয়ে লাভ বেশি। এগুলোর বিক্রি সারা বছর।

কিন্তু না, থাক্। আজকের দিনটি তার জীবনের মালা থেকে পৃথক করে রাখা থাক্। আজ আর ওই কালো মেয়েটিকে ছাড়া আর কিছু ভাববে না। জীবনের গোপন কথা গোপন থাক্। বলবে শুধু ধীরাবাবুকে, সে তাকে নিয়ে বই লিখবে। কিন্তু এই কথাটুকু ছাড়া ধীরাবাবুকে সে কি বলবে?

কি লিখবে ধীরাবাবু?

লিখবে বইকি তার রঙহীন জীবনের কথা, তার সন্দীপন পাঠশালার কথা লিখবে ধীরাবাবু।

পনেরো

লিখবে—কচি কচি মুখ নিয়ে বাল-গোপালেরা চিরকাল সন্দীপন পাঠশালা আলো করে সারি দিয়ে বসে অমৃত-মধুর কণ্ঠের কলরবে মুখরিত করে পড়ে, অ, আ, হচা ই, দীঘ্য ঈ।

—হ্যাঁ। তারপর, এটা কি? বল বল। হ্রস্ব—। ইঙ্গিতে ধরিয়ে দেয় সীতারাম। আধ-আধ ভাষায় ছেলেটি বলে, হচ্য উ, দীঘ্য উ।

—বাঃ, বাঃ! বল।

উৎসাহে কচি মুখ ভোরবেলার সূর্যের ছটা পড়া কচি পাতার মত ঝলমল করে ওঠে, সাদা চোখ ঝিকমিক করে ওঠে সবুজ ঘাসের পাতায় জমে-থাকা শিশিরবিন্দুর মত। সে পড়ে যায়, ঋ। এতা? এতা কি মাছায়?

—লিকার কেমন ডিগবাজী খায় এতা মাছায়।

ওদিকে পড়ে; অ আর চ আর ল, অচ—ল। অ ধ আর ম, অধ—ম।

—হ্যাঁ। ও দুটি যেন হবে না তুমি, বুঝলে?

—বর্গীয় জ, ল, প, ডয়ে শূন্য ড়য়ে একার, জল পড়ে—জল পড়ে।

সীতারাম নিজে বলে, পয়ে আকার, তয়ে আকার, দন্ত ন, ডয়ে শূন্য ড়য়ে একার, পাতা নড়ে—পাতা নড়ে। জল পড়ে, পাতা নড়ে। বর্গীয় জ, ট, দন্ত ন, ডয়ে শূন্য ড়য়ে একার, জট নড়ে—জট নড়ে। কই, তোমার জটটি নেড়ে দাও দেখি একবার। ছেলেটির মাথায় বড় বড় চুল, তার মধ্যে দুটি জট তৈরী হয়েছে, দেবতার কাছে মানসিক আছে। এখানকার প্রচলিত আদরের ছড়া বলে সীতারাম তাকে আদর করে, জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে, জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে।

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে থাকে। এর মধ্যেই সে মাথার জটের জন্য লজ্জা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। সীতারাম নিজেই জট নেড়ে দেয় তার। বড় ক্লাসের ছেলেরা পড়ছে—

"আমরা যে দেশে বাস করি, সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর।"

তারা দাঁড়িয়ে সুর করে আবৃত্তি করে—

"কোন্ দেশের তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলে
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল

সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—"

—সীতারাম-ভাই ! ভাল আছ তো ?

—কে ? সীতারাম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। সেই পলাশবুনির বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায়। আঃ, এ কি চেহারা হয়েছে তাঁর ! লোল-মাংস ঝুলে পড়ে দেহের হাড়গুলি প্রকট হয়ে উঠেছে, কুঁজো হয়ে নুয়ে পড়েছেন, লাঠি ধরে পাঠশালার উঠানে এসে দাঁড়ালেন। পরনে ময়লা কালো কাপড়, তার মধ্যে বড় বড় সেলাইয়ের দাগগুলি কালো মাটির ফাটলের মত দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে নেমে গেল সীতারাম। আসুন, আসুন। কি ভাগ্য আমার !

—তোমার ভাগ্য !—হা-হা করে হাসলেন পণ্ডিত।

—ভাগ্য বইকি ! নিশ্চয়, এ আমার সৌভাগ্য।

—মঙ্গল হোক তোমার। ভালো লোক তুমি। এখন কিছু খাওয়াও দেখি ভাই। বড় ক্ষিদে পেয়েছে। খাইয়ে সৌভাগ্যটা বাড়িয়ে নাও।

ব্যস্ত হয়ে উঠল সীতারাম, ওরে ! গোবিন্দপদ, শোন্ তো বাবা।

পণ্ডিত বলেই যায়, জান তো ভিক্ষা করি, হ্যাঁ, ভিক্ষাই এক রকম। গৃহিণী খালাস পেয়েছেন। তা শ্রাদ্ধ তো একটা করতে হবে। তাই গিয়েছিলাম পলাশবুনি। হোক সব চাষীভূষী, এককালের ছাত্র তো সব। কিছু ভিক্ষা-টিক্ষা করে বাড়ি যাব। দুপুর হয়েছে বিশ্রাম চাই, ক্ষিদে তেষ্টাও পেয়েছে। তা একবার ভাবলাম, যাই বাবুদের ঠাকুরবাড়ি, কি কোন বাবুর বাড়ি। কিন্তু ইচ্ছা হল না। তোমার কথাই মনে হল। শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। বাবু-ব্রাহ্মণ আর পাঠশালার পণ্ডিত ভিখিরী-ব্রাহ্মণ তো এক নয়। মনে হল, পাঠশালার পণ্ডিতস্য পাঠশালার পণ্ডিতং গতি। তাই এখানেই এলাম। বলে আবার হা-হা করে হাসতে লাগলেন পণ্ডিত।

এ হাসিতে সীতারাম লজ্জা পেলে। মনে হল, পণ্ডিত তার তোশামোদ করছেন। সে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে নিজেই একখানা খাতার মলাট দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করলে। বললে, বেশ করেছেন। আমার যে কি আনন্দ হয়েছে আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, সে কি বলব ? তেল আনাই, স্নান করুন।

—স্নান ? তা—। পণ্ডিত নিজের গামছাখানা মেলে ধরে একবার দেখালেন। কাপড়ের চেয়েও ময়লা গামছাখানা; তার উপর শতছিন্ন। দেখিয়ে বললেন, কাপড় তো নাই সঙ্গে। একখানা পরে স্নান করা। আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন পণ্ডিত। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, জানলে ভায়া, পলাশবুনিতে মাঠের পুকুরে গিয়ে দিগম্বর হয়েই, বুঝলে ? পণ্ডিতের হাসি আর থামে না।

খাতার মলাটখানা তাঁর হাতে দিয়ে সীতারাম বললে, আপনি ছেলেগুলোকে একটু

দেখবেন। আমি আসছি।

সে ফিরে এল একখানি নূতন কাপড় এবং শিশিতে খানিকটা তেল নিয়ে। বললে, তেল মাখুন। স্নান করে এই কাপড়খানা পরুন।

বুড়োর ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল।

পণ্ডিতকে বিদায় করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। পণ্ডিত নিজেই বলে গেলেন কথাটা, স্নান করে খেয়ে পণ্ডিত বলেছিলেন, ভায়া, ছেলেদের কাছে দু পয়সা, চার পয়সা চাঁদা যদি তুলে দিতে। বোঝ তো, পত্নীদায়। মাতৃদায়, পিতৃদায় নয়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পত্নীদায়। বলে আবার হা-হা করে হাসলেন। ছেলেদের কাছ থেকে এক টাকা সাত আনা উঠল, সে নিজে এক টাকা এক আনা দিয়ে আড়াই টাকা পূর্ণ করে তাঁর হাতে দিল।

যাবার সময় পণ্ডিত বলে গেলেন, একটি কথা বলে যাই ভায়া। জান তো, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য। বুড়োর কথাটা মনে রেখো। এই বড় বড় দালান-কোঠা হয়, দেখেছ তো? তা রাজমিস্ত্রীতে গাঁথে, নকশা কাটে, কারিগুরি দেখায়, মাইনে নিয়ে বিদেয় হয়; বড়লোক বাস করে, বাড়ি হয় তাদের। তবু রাজমিস্ত্রীদের নাম মিস্ত্রীরা লিখে রেখে যায়—ওমুক রাজ, এত শো এত সাল, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা তাদের নামটা থাকে। মজুরিও তারা মন্দ পায় না। আমাদের পণ্ডিতদের চেয়ে বেশি পায়। কিন্তু দেখ, গোড়াতেই প্রথম যারা কাজ করে, ভিত কাটে···মাটি-কাটা মজুর, তাদের কেউ মনেই রাখে না। তাদের মজুরিও সকাল থেকে তিন প্রহর পর্যন্ত মাটি কেটে—তিন-চার আনা। বুঝলে তো! পেটে খেতেই কুলোয় তারা শেষ বয়সে না খেয়ে মরে। যদি বাবুদের বাড়ি যায়, বলে, 'বাবু মহাশয়, আমি আপনার প্রাসাদের ভিত্তি খনন করিয়াছিলাম; আজ না খাইয়া মরিতে বসিয়াছি, অতএব আমাকে কিছু ভিক্ষা দিউন।' বাবু কি করিবেন? চিনিতে পারিবেন না। ভায়া, ভিক্ষা দেওয়া দূরের কথা, দরোয়ান ডেকে বার করে দেবে। ইস্কুল-কলেজের মাস্টাররা হল ছোট রাজমিস্ত্রী বড় রাজমিস্ত্রী। আর হতভাগ্য আমরা পাঠশালার পণ্ডিত, আমরা হলাম ভিত খোঁড়ার মাটি-কাটা মজুর। আমাদের কেউ মনেই রাখে না। গেলে চিনতেও পারে না। ভিক্ষা দিলে দু আনা, বড় জোর চার আনা। তাই বলি—। অনেকটা কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। একটু থেমে আবার বললেন, কিছু কিছু সঞ্চয় করো। বুঝলে? তোমার অবশ্য কিছু জমিজেরাত আছে, আমার মত অবস্থা তোমার হবার কথা নয়। তবুও বৃদ্ধের কথা মনে রেখো। এমন করে—এই আমাকে যেমন কাপড় দিলে, খাওয়ালে, টাকা দিলে—এমন করে খরচ করো না। কিছু কিছু সঞ্চয় করতে অভ্যাস করো।

দরজার কাছে গিয়ে বৃদ্ধ আবার বললেন, ভায়া! আর একটি কথা বলব?

—বলুন।

—আমাকে এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা ম্যাচিস কিনে দাও তুমি

* * *

সীতারাম ফিরে এসে পাঠশালায় চেয়ারে বসে ভাবে। পণ্ডিত তাকে অবসন্ন করে দি গেলেন। ওই ভাবনাটা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পণ্ডিত তো মিথ্যা কথা বলে নাই। আরও অনেক কথাই বলেছেন পণ্ডিত। সারা দুপুরই তিনি অনর্গল বকে গিয়েছেন কাপড়খানি আর আড়াই টাকা সাহায্য পেয়ে তিনি হাসিতে কথায় সীতারামকে তাঁর জীবনে সকল কথা উজাড় করে বলে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন

হঠাৎ সে নিজের খাতা, সেই নোট-বইটা বের করে লিখতে বসল। আজ বারোই জুলাই উনিশ শো উনত্রিশ সাল

ধীরাবাবু বলেছে, পণ্ডিত তোমার বুড়োবয়সে এসে তোমার কথা শুনব; তোমার কথা শু বই লিখব আমি।

বুড়ো পণ্ডিতের কথা তার নিজের কথা নয়। তবু সে লিখে রাখলে পণ্ডিতের কথাগুলি পণ্ডিতের কথায় আর তার নিজের কথায় তো কোন তফাৎ সে দেখতে পায় না। সে লি রাখছে, ধীরাবাবুকে বলবে, এমনই করে লিখো। তবেই ঠিক লেখা হবে। নইলে তুমি য লিখবে, সে হয়তো ঠিক হবে না। পাঠশালার পণ্ডিত সীতারামের জীবনী হবে না। ঠি এমনি করে লিখো।

এক ব্রাহ্মণের ছেলে। বাপ করতেন চাষীদের গাঁয়ে পুরুতের কাজ আর করতেন যজি বাড়িতে রান্নাবান্না ঠিকের কাজ। লোকে কেউ বলত—চাষা-পুরুত, পটোঝাড়া বামুন; কে বলত—ভাত-রাঁধুনী। কিন্তু এতে অপমান তার যতই হোক, মোটামুটি খাওয়া-পরার অভা বড় হত না। ছেলে, সেকালের হাল আমলের ছেলে, পড়ল ছাত্রবৃত্তি সেকালের এম ভি— মিডল ভার্নাকুলার ইস্কুলে, সেখানে পাস করে সে বাপের বৃত্তি ছেড়ে হল পাঠশালার পণ্ডিত পণ্ডিতের কাজ, পটোঝাড়া বামুনের কাজের চেয়ে অনেক সম্মানজনক, রাঁধুনী-বামুনের কাজে কথা তো ভাবতেই লজ্জা হয়। সে হল পাঠশালার পণ্ডিত। চামচিকা পক্ষী হল। একা সদ্‌গোপ চাষীর গ্রামে, গ্রামের মণ্ডলদের সুপারিশে, জমিদারের অনুগ্রহে চাষীদের স্থান নিয়ে পাঠশালা খুললো।

আঃ, এ কি হল? চোখে জল এল নাকি? ঝাপসা ঠেকছে লেখাগুলো, লিখতে গিয়ে লাই বেঁকে যাচ্ছে। পেন্সিল রেখে সীতারাম হাত দিয়ে চোখ মুছলে। হ্যাঁ, চোখে জল পড়ছে। জল মুছে পরিষ্কার হল দৃষ্টি। সে আবার লিখলে।

"জমিদারের কাছারিতে পাঠশালা করবার হুকুম পেলে। ওইখানেই সে থাকবে। মণ্ডলর প্রত্যেক মাসে একদিন করে তাকে খাবার সিধে দেবে। গ্রামে আটাশ ঘর অবস্থাপ

মণ্ডল আছে, তারা দেবে আটাশ দিনের সিধে। বাকি দু-দিন নিজেকেই তাকে চালাতে হবে তার জন্য সে ভাবলে না, আটাশ দিনের সিধে থেকে, দু-দিন কেন, আরও সাত দিনের খোরাক তার উদ্বৃত্ত হবে। দৈনিক পাঁচ পোয়া চালের আধ সের করে কাটলে, আটাশ অর্ধে চৌদ্দ সের চাল বাঁচবে ; সে তার চব্বিশ-পঁচিশ দিনের খোরাক।"

আঃ, ছি ছি! আবার চোখের জল এসে গিয়েছে। কিছুদিন, এই মাসখানেক বোধ হয়, এই এক উপসর্গ জুটেছে। চোখে জল পড়ছে। বিশেষ করে এই বিকেলের দিকে, পাঠশালার শেষ দিকটায় জল বেশী পড়ে। মাথাও ধরে। ডাক্তারকে একবার দেখাতে হবে। যাক, পরে লিখলেই হবে। পণ্ডিতের কথাগুলো কানের কাছে এখনও যেন বাজছে। মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছে ; ও কথা কি ভুলবার ?

পণ্ডিত বলেছেন, ভায়া, আজ মনে হয়, দুর্মতি হয়েছিল। নইলে ভেবে দেখ, হিসেব করে দেখ, পুরুতের রোজকার পণ্ডিতের রোজকারের চেয়ে অনেক বেশি। চাল, কাপড়, দক্ষিণে—হিসেব করে দেখ তুমি। আর ঠিকের ভাতরান্নার কাজে উপার্জন তো দিন দিন বেড়ে চলেছে। এক বেলা এক টাকা, দু বেলা দু টাকা। ভাত-রাঁধুনী বামুনের মাস-মাইনেই এখন খোরাক-পোশাক আট টাকা দশ টাকা। তা ছাড়া বাবুদের কুটুম্বস্বজন আউতি-যাউতি, মাসে দুটো টাকা বকশিশ। পাঠশালার পণ্ডিতি করে ভেরেণ্ডা ভাজলাম সারাজীবন।

বলেই হা-হা করে হাসি।

তারপর বলেছিলেন, কিছু মনে করো না ভায়া, সত্যি কথা বলব। তুমিও আমার মত ভুল করেছ। চাষী সদ্‌গোপের ছেলে। বাপ-পিতামহ চাষবাস করত ; নিজের জমি আরও দু-চার জনের দু-দশ বিঘে জমি ভাগে করে দুধে-ভাতে খেয়েছে। গোলাতে ধান, ঘরে কলাই গম গুড় মজুত করে সুখে কাটিয়ে গিয়েছে। তুমিও আমারই মত দগ্ধ কচু ভক্ষণ করেছ ভায়া। পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হতে গিয়ে অন্যায় করেছ।

হঠাৎ তার হাতটা ধরে বলেছিলেন, কিছু মনে করছ না তো ভায়া ?

—না, না। আপনি সত্য কথা বলেছেন। কিছু মনে করব কেন ?

—হ্যাঁ। তোমাকে জানি বলেই বলতে সাহসী হলাম। নইলে এখন তো আমি ভিক্ষুক, আমি—

চুপ করে গিয়েছিলেন, কিছুক্ষণ, তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলেছিলেন—ভায়া, বলি সাধে ? আজ তোমার কাছে গোপন করব না কিছু। বিধবা যুবতী কন্যাটি ভাত রান্না করে, জান তো ? কিন্তু কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। কেন জান ? পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। মানে বুঝতে পারছ তো ? সেখানে বাবুদের যুবক পুত্রটি তার পিছনে লেগেছিল। বল তো ভায়া, এখন না হয় আমি আছি, ভিক্ষা করে খাওয়াচ্ছি, কিন্তু আমার অন্তে তার কি হবে ? সম্বল কিছু থাকলে তো আজ আমি ভাবতাম না। আমার অন্তে সেই সম্বল থেকে

নিজের ঘরে আত্মরক্ষা করে কোনরকমে সে থাকতে পারত।

সীতারাম ভাবে, তার জীবনে কি হবে কে জানে? আবার তার চোখে জল এল। এ জল আসা, সে জল আসা নয়। এ তার মন কাঁদছে, তাই জল এসেছে। চোখ মুছলে সে।

পাঠশালার দরজায় বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল। এসে ঢুকলেন ইস্কুল সাব-ইন্স্পেক্টার-বাবু। নতুন লোক, অল্পদিন এসেছেন; অল্প বয়স, কড়া লোক। বাবুর আপিসে গিয়ে দেখেছে, মোটা মোটা ইংরেজী বই নিয়ে পড়েন। বইয়ে আর মুখে। একটা শেল্‌ফে ঝকমকে বাঁধানো বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বই। দু-তিনখানা মাসিকপত্র নিয়ে থাকেন। ইনি আবার অতি আধুনিক। ইনি বলেন—তোমার ধীরাবাবু বাজে লেখে হে। একেবারে প্রতিক্রিয়াশীল। রিঅ্যাকশনারী।

সীতারাম দুটো কথারই মানে বুঝতে পারে না। চুপ করে থাকে।

গম্ভীরভাবে সাব-ইন্স্পেক্টার খাতাপত্র নিয়ে বসলেন। নোট নিলেন। ইন্স্পেক্শন-বুকে মন্তব্য লিখলেন।

তিনি চলে গেলে পাঠশালার ছুটি হল। ঢ-ঢং-নন-ন-ন-ন্।

আবার পরদিন সাড়ে দশটায় পাঠশালা বসে। ঢং-ঢং-ঢং।

বৎসরের পর বৎসর এই চলবে। সীতারামের চুলে পাক ধরবে। মুখে কপালে রেখা দেখা দেবে। হয়তো সব শেষে ওই বৃদ্ধ পণ্ডিতের মত অবস্থা হবে। লিখবে, ধীরাবাবু এই-ই লিখবে, এই তো তার জীবন।

জীবন যেন শ্রান্ত ক্লান্ত নীরস হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে।

এরই মধ্যে আসে এক-একটা ঢেউ। মজা নদীতে বান আসে।

সেদিন সাব-ইন্স্পেক্টার এসে বললেন, পণ্ডিত তোমাদের এখানে প্রাইমারী টিচার্স কনফারেন্স হবার কথা হচ্ছে। শুনেছ?

—আজ্ঞে না।

—আসবে খবর তোমার কাছে।

* * * *

খবর এল। বড় ইস্কুলের পাঠশালার হেডপণ্ডিত শ্রীশবাবুই এর উদ্যোক্তা। তিনি এলেন সদলবলে। শ্রীশবাবু লোকটি বহুদর্শী লোক, উপযুক্ত শিক্ষক, অতি মিষ্টভাষী ব্যক্তি দোষের মধ্যে নিপুণ ষড়যন্ত্রী। ওর অনেক ভাল ছেলে তিনি ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তা হোক, তিনি যখন এসেছেন, আর এই কনফারেন্স—জেলা প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মেলন যখন সকলের উপকারের জন্যে, তখন সে প্রাণ খুলে যোগ দেবে।

তাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা জানানো হবে দেশের কাছে, গভর্নমেণ্টের কাছে দাবি জানানো হবে। বুকে যেন একটু বল আসছে।

অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হল। এই থানার পাঠশালায় পণ্ডিতদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সমস্ত খরচ চালাতে হবে। তাদের মধ্য থেকে পনেরো জনকে নেওয়া হল অভ্যর্থনা-সমিতিতে। গোপালপুরের হৃষিকেশ দাস, বৃদ্ধ পণ্ডিত; গোবিন্দপুরের সৌরীন মিত্র, বয়সে সে ছোক্‌রা; ব্যাপারীপাড়ার মক্তবের মৌলভী মহম্মদ হোসেন; রত্নহাটার সকলেই; বড় ইস্কুলের তিনজন; এবং সন্দীপন পাঠশালার সীতারাম—এমনই করে পনেরো জন। শ্রীশবাবু সভাপতি।

সীতারাম হল দুজন সহকারী সম্পাদকের অন্যতম।

এটা একটা উৎসাহজনক ব্যাপার। এমন ঘটনা জীবনে কম এসেছে। এসেছিল মাত্র আর একবার, সেই যেবার ধীরাবাবু ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের কংগ্রেসী চেয়ারম্যানকে নিয়ে এসে সভা করেছিলেন—সেইবার। আর হল না সে উৎসব!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সে সভার মধ্যে বসে ছিল একটি কালো মেয়ে।

প্রতি সন্ধ্যায় আজও তার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সন্ধ্যাগুলি বিরস হয়ে গিয়েছে। আর আলোকিত পর্দায় ছায়াছবিতে একখানি মুখ ভেসে ওঠে না। সীতারামের চোখে দোষ ঘটেছে। চশমা একটা না নিলেই নয়। জল পড়ছে, ঝাপসা দেখছে কিন্তু তবু আলোকিত পর্দায় ছায়ার ছবিতে ফুটে-ওঠা মুখ অমাবস্যার আকাশে শুকতারার মত সুস্পষ্ট। নোট-বইয়ে সে লিখলে, উনিশ শো তিরিশ সাল, ছাব্বিশে জানুয়ারী। ওই তারিখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন।

তবে তারিখটার জন্য সে দুঃখিত হল। ওদিকে ওই তারিখটিই নির্দিষ্ট হয়েছে কংগ্রেসের স্বাধীনতা-দিবস পালনের জন্য। কিন্তু উপায় কি? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উদ্বোধন করবেন, তিনিই দিয়েছেন তারিখ। ওই তারিখে দেবু এখানে কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন করবে, সংকল্পবাণী পাঠ করবে। ধীরাবাবু দেবুকে লিখেছেন, আমি যেতে পারছি না, কিন্তু রত্নহাটার গ্রামে স্বাধীনতা-দিবস পালন করা হবে না, এ কথা ভাবতেও আমার মর্মান্তিক দুঃখ হচ্ছে। তুমি পালন করবে।

ধীরাবাবু ঢেউ পাঠিয়েছেন। জয়জয়কার হোক ধীরাবাবু। কিন্তু ধীরাবাবু, তুমি এলে না কেন? ঢেউ কি স্রোত? তোমার কাজ কি দেবুকে দিয়ে হয়?

মর্মান্তিক দুঃখ তার দেবু আর শ্যামুর জন্য। তারা ম্যাট্রিক পাস করে বসে আছে। শ্যামু আই. এস-সি ফেল করে বাড়ি এসেছে। দেবু তিনবারের বার কোনরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছে। দেবুকে দিয়ে কি ধীরাবাবুর কাজ হয়? তবে দেবুর ওদিকে একটা ঝোঁক আছে।

যাক ও কথা। সামান্য পাঠশালার পণ্ডিত সে। আদার ব্যাপারী সে, জাহাজের খোঁজ নিয়ে কি করবে? সম্মেলনের জন্য সে শ্যামু-দেবুর কাছে মাছ ভিক্ষা করলে. আর [illegible]

দিতে হবে। আমি বলেছি, আমি আদায় করে দোব। আমার মান রাখতে হবে। সে তারা দিয়েছে।

ধীরাবাবুকেও সে চাঁদার জন্য লিখেছিল। ধীরাবাবু দশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন সেদিন সকালে সব চেয়ে বড় আনন্দ পেলে সে। মনোরমা তার হাতে একটি টাকা দিলে তোমাদের ইয়েতে, ওই যে কি হচ্ছে গো, তাতে আমার চাঁদা। বেচারী কনফারেন্স কথাট উচ্চারণ করতে পারে না।

—তোমার চাঁদা? আমি তো দিয়েছি, আবার?

—তোমাদের মাইনে বাড়বে, মান বাড়বে, আমি চাঁদা দোব না?

টাকা সে নিলে, কিন্তু মনোরমাকে বুকে নিয়ে চুমা দিয়ে আদর জানাবার সময় নাই রত্নহাটায় ঢোল বাজছে, তার শব্দ এখান পর্যন্ত আসছে, শোনা যাচ্ছে। রায়-বেঁশে নাচ হচ্ছে ছেলেরা নাচছে।

ওই এক বিড়ম্বনা!

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসবেন, উদ্বোধন করবেন। সাহেবের বাতিক পল্লী-নৃত্য। সাহেব এসে অবধি জেলায় এই নাচ নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছেন। শিব নাচেন, ব্রহ্মা নাচেন আর নাচেন ইন্দ্র!—সহকারী হাকিমরা নাচছেন, রায়বাহাদুররা নাচছেন, উকিলরা নাচছেন, মোক্তাররা নাচছেন, বড় ইস্কুলের ছেলেরা নাচছেন, মাস্টাররা নাচছেন, এবার তাদের পালা। পাঠশালার ছেলেদের নাচতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও হবে। মুখ বুজে নাচতে হবে। কিছু বললেই সর্বনাশ। রায়পুরের ব্যোমকেশ একটা কাগজ ছাপিয়েছিল—ওই নাচকে ঠাট্টা করে;—দেশে ছড়া প্রচলিত আছে—"আমার বিয়ের যেমন তেমন দাদার বিয়েয় রায়-বেঁশে, আয় ঢকাঢক মদ খেসে।"

তার ফলে ব্যোমকেশের জেল হয়ে গিয়েছে।

তবু রক্ষা যে, ডিভিশনাল ইন্‌স্পেক্টার-অব-স্কুল্‌স রায়বাহাদুর মিত্র সাহেবের কোন বাতিক নাই। তিনিই হবেন সভাপতি।

ত্রিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী।

সুসজ্জিত মণ্ডপে অধিবেশন হল। ভাগ্যক্রমে সীতারামকে দাঁড়াতে হল সভাপতির আসনের কাছেই।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তার জীবনের একটা বড় সাধ পূর্ণ হয়ে গেল আজ। নজরে পড়ল, সভার বাইরে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে শিবকিঙ্কর। সে ইশারা করে ওকেই ডাকছে। সীতারাম সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল।

শিবকিঙ্কর অনুগ্রহপ্রার্থীর মত সবিনয়ে বললে, আমাকে ভেতরে একটু বসিয়ে দিতে পার ভাই পণ্ডিত?

সীতারামের জিভের ডগায় এল, না। কিন্তু পরক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ করে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, আসুন।

সভাপতির অভিভাষণ তখন আরম্ভ হয়েছে। একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ তিনি জানালেন, "নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা হচ্ছে—তাতে দেশের সর্বত্র প্রতি গ্রাম না হোক, প্রত্যেক পাঁচ-সাতখানি গ্রামের কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। সমস্ত দেশের ছেলেরা যাতে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীকে দেখে ধন্য হতে পারে, তার ব্যবস্থা হবে। সেই সব কেন্দ্রে যাঁরা শিক্ষক থাকবেন, আপনারাই থাকবেন, তাঁদের বেতন যাতে উচ্চ হয়, যাতে তাঁদের অভাব-অভিযোগ দূর হয়, তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে। আপনারাই হচ্ছেন দেশের আদিগুরু। আপনারা তো সামান্য নন।"

আনন্দে চোখে জল এল সীতারামের। দৃষ্টি তার কমে এসেছে। আজকার চোখের জলে তার ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখটায় সব যেন সাদা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সেদিন বাড়ি ফিরে তার নোট-বইয়ে সে এই তারিখটি লিখে রাখলে—

"আমার আজ মনে হল আকাশে নীল ঝলমল করছে, দীঘিতে সায়রে জল টলমল করছে। পাখির গানে আনন্দ ঝরে পড়ছে। বড় আনন্দ আজ। বড় আশা মনে জেগে উঠেছে।"

তারপর লিখেছে—

"বাড়ি ফিরবার পথে—দেবুর তোলা জাতীয় পতাকাকে লুকিয়ে প্রণাম করে এলাম। সংকল্পটি পকেটে আছে। বাড়ি এসে পাঠ করলাম। আজ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ সাল।"

সম্মেলন শেষে সে গিয়েছিল সেখানে, ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ছিল। একা দাঁড়িয়ে প্রণাম করে বলেছিল—মুখ ফুটে বলবার সাহস নাই, কিন্তু আমার অন্তরও বলে—তোমার জয় হোক! তোমার জয় হোক! তোমার জয় হোক!

ষোল

২৬শে জানুয়ারী—১৯৩০ সাল। প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মেলন।

তারপর আরও কতকগুলি তারিখ—তার নোটবইয়ে লেখা হয়েছে। তারিখের পাশে ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

"১৭ই আগষ্ট, ১৯৩০ সাল। দেবু, আমার হাতের গড়া দেবু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে কারাবরণ করলে। ধীরাবাবু কলিকাতায় রাজবন্দীরূপে আবার ধৃত হয়েছেন। দেবু তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। এ কথা জানি। আমিই তো তাকে বলেছিলাম—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।"

শেষে সে লিখেছে—"আজ গৌরবে বুকটা ফুলে উঠেছে। সে কথা কাকেও বলবার নয়। হায়! এ গৌরবের কথা মুখ ফুটে বলবার আমার সাহস নাই। আমি দুর্বল, আমি হতভাগ্য।" এ নিয়ে দুঃখও তার অনেক। যেদিন দেবুকে পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, সেদিন স্টেশনে সে কি ভিড়! গ্রামের নরনারী শিশু যুবা বৃদ্ধ ভেঙে এসেছিল তাকে অভিনন্দন জানাতে। ফুলের মালাতে দেবুর গলা ভরে গিয়েছিল। সেও নিয়ে গিয়েছিল মালা গেঁথে। কিন্তু দারোগাকে দেখে—দিতে সাহস তার হয় নাই। মনে পড়েছিল—অনেকদিন পূর্বের কথা। তার ক্ষীণদৃষ্টির চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছিল—ভাঙা সন্দীপন পাঠশালার ছবি। সভয়ে সে মালাগাছি চাদরের তলায় লুকিয়ে ফেলেছিল। তারপর ট্রেন চলে গেলে সে দীর্ঘদিন পরে দেবুদের বাড়িতে এসে প্রবেশ করেছিল। মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। মাকে প্রণাম করে জীবন সার্থক করবে। তাঁর কাছে বসে একবার কাঁদবে। বলবে—আপনার দেবুর পণ্ডিত হয়েছিলাম—তাই জীবনটা আমার ধন্য হল। বাড়িতে ঢুকে চারিদিক চেয়ে দেখলে—কই, মা কই?

—মা! মা কই?

দাওয়ার উপর কে বসে ছিলেন—তাকেই প্রশ্ন করলে। তিনি উত্তর দিলেন—সীতারাম! এস বাবা। এই তো আমি।

একটু অপ্রস্তুত হল সীতারাম।—আমার চোখের দৃষ্টিটা—কমে গিয়েছে কিনা। আমি চিনতে পারি নি মা!

—বসো বাবা, বসো।

বসল সীতারাম। কিন্তু কি বলবে ভেবে পেলে না। দুঃখ প্রকাশ করতে সে আসে নাই, দুঃখ প্রকাশ করলে এই মা-টি হাসবেন সে তা জানে। কিন্তু কোন্ ভাষায় তাঁকে অভিনন্দন জানাবে? সে ভাষা তো সে জানে না। তার মনের কথা এখানে এসে লজ্জা পাচ্ছে। সে বলতে এসেছিল—জানেন মা, দেবুকে শ্যামুকে আমি এসব ছেলেবেলা থেকে শিখিয়ে এসেছি। কিন্তু কথাগুলি বলতে লজ্জা পাচ্ছে। এই মা না হলে কি ওই ছেলে হয়। ধীরানন্দ কি কোন মাস্টারের তৈরী করা ধীরানন্দ? দেবানন্দকে কি সে তৈরী করেছে? হায় রে হায়! এই মায়ের তিনটি ছেলের একটি ধীরানন্দ একটি দেবানন্দ! আর সে বা ধীরাবাবুর শিক্ষকেরা কত ছেলেকেই না শিক্ষা দিয়েছেন জীবনভোর! কিন্তু কই ধীরানন্দ দেবানন্দ আর কই? এই মায়ের সামনে কি তার দাবি জানানো যায়?

মা বললেন—তুমি কাঁদছ কেন বাবা ?

সীতারাম কাঁদে নাই ; তার চোখ দিয়ে যেমন জল গড়ায়—তেমনি একটি ধারা গড়িয়ে এসেছিল—তাই মায়ের চোখে পড়েছে। চোখ মুছে সীতারাম বললে—না মা। কাঁদি নাই তো। চোখ দিয়ে আমার মধ্যে মধ্যে জল পড়ে। নইলে এ কি কাঁদবার কথা ? এ যে আমার বুক ফুলিয়ে বলবার কথা। দেবু আমার ছাত্র।

মা হাসলেন—সে হাসি দেখে সীতারাম ম্লান হয়ে গেল ; বড় ইমারতের ভিতে যে মজুর কাজ করেছে সে যদি কোন দিন এসে গৃহস্বামীকে বলে—এ বাড়ি আমার তৈরী, তখন গৃহস্বামী যে করুণার হাসি হাসেন—এ সেই হাসি। সে তাড়াতাড়ি বললে—আপনার সন্তান ছাড়া এ কাজ আর কে করবে এ গাঁয়ে ?

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন—এ আর এমন কি করেছে বাবা ! দেশের জন্য বড় বড় লোক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছেন, নিজের জীবন ঢেলে দিয়েছেন। আন্দোলনের সময়—হাজারে হাজারে লোক চলেছে তীর্থযাত্রীর মত। কতক চলেছে হুজুগে।

হাসলেন মা, তারপরই কথাটা পাল্‌টে দিয়ে বললেন—কিন্তু তোমার চোখের এমন অবস্থা কতদিন হয়েছে বাবা ? এ তো ভাল নয়। চিকিৎসা করাও। চশমা নাও।

সীতারাম বলতে গেল—অর্থের কথা। বলতে গেল—চিকিৎসা করাতে টাকা চাই মা। সে আমি কোথায় পাব ? কিন্তু থেমে গেল। বললেই হয়তো মা মনে করবেন সে টাকা ভিক্ষে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, বিশ-পচিশ টাকা আমি দেব, বাকীটা তুমি সংগ্রহ কর। সে বললে—হ্যাঁ, এইবার করাব। ভেবেছিলাম মধু-টধু দিলেই ও দোষটা যাবে, তা গেল না। এইবার চিকিৎসা করাব। চশমা নোব।

উঠে চলে এল সে।

*　　*　　*　　*

টাকা তাকে দিলে মনোরমা। মধুমক্ষিকার মত সঞ্চয়ী মনোরমা পয়সা জমিয়ে টাকা করে, দশ টাকা হলেই নোটে পরিণত করে। সে রত্নার বিয়ের জন্য টাকা জমাচ্ছে। সে বলে ওই কথা কিন্তু তা নয় ; ওই ওর স্বভাব ; ও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। পঞ্চাশ টাকা হাতে দিয়ে বললে, চোখ তুমি দেখিয়ে এস। আরও টাকা লাগে তাও দোব আমি।

দেখিয়ে এল সে। কলকাতায় নয়, মাইল চল্লিশেক দূরে সাঁওতালদের মধ্যে ক্রীশ্চান মিশনারীরা মিশন করেছে। সেখানে ভাল হাসপাতাল আছে। চোখের চিকিৎসা সেখানে ভালই হয়। তাদের ওখানে চিকিৎসা করিয়ে এল। সঙ্গে গেল আকু। সীতারাম ফিরল পুরু চশমা নিয়ে। দৃষ্টি অনেকটা ফিরেছে।

নোট বই খুলে সে প্রসন্ন মনে লিখলে—"বিদ্যা—জ্ঞান এ কি অপরূপ সামগ্রী ! মৃতপ্রায়জনকে সঞ্জীবিত করে তোলে। অন্ধকে দৃষ্টি দেয়। আঃ, আজ নীল আকাশ দেখে বাঁচলাম। ওই

পাদরী সাহেবদের লক্ষ প্রণাম জানাচ্ছি। আর মনোরমাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করছি। কিন্তু আমার এ দৃষ্টি কি টিকবে? আমি যে প্রতারক! আমি যে প্রতারক! আমি যে মনোরমাকে প্রতারণা করেছি! আজও যে ঝরনার ধারে বসে মনে মনে ভাবি আর মনের চোখে দেখি মেটে কোঠা ঘরের জানালার পর্দায় কালো ছায়ায় আঁকা ছবি!"

তারপর তারিখ, ১৯৩৫ সাল, ৩০শে মার্চ।

খবর এসেছে, ধীবরদের ছেলে শশীনাথ বৃত্তি পেয়েছে। দৃষ্টি ফিরে পাওয়া সার্থক হয়েছে। সার্থক হয়েছে। এইটিই বোধ হয় সর্বোত্তম সুখের দিন তার। ধীবর শশীনাথের অন্ধকার জীবন-পথে তার হাতে প্রদীপ দিতে পেরেছে। আজ বড় ইস্কুলের বৃদ্ধ হেডমাস্টার নাই। আকাশের দিকে মুখ তুলে সে মনে মনে বললে, আপনার আশীর্বাদ আমার সফল হয়েছে। পুরো পাঁচ টাকা খরচ করে সে দেবস্থানে পূজো দিয়ে এল।

সন্দীপন পাঠশালাকে সে সেদিন মনোরম করে সাজালে। ছেলেদের মিষ্টান্ন বিতরণ করলে। নিজে গিয়ে শশীনাথকে ভর্তি করে দিয়ে এল বড় ইস্কুলে।

অকাল-বৃদ্ধ সীতারাম যেন নতুন জীবন পেলে। সে আবার যৌবনের উৎসাহ নিয়ে পড়াতে শুরু করলে। লোকে তাকে সস্নেহে রসিকতা করে বলে, বলিহারি পণ্ডিত!

সে হাসে। এখনও বাকী আছে। জয়ধর গতবার ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়ে কলেজে পড়ছে। সে আই-এ-তে বৃত্তি পাবে, বি-এ-তে পাবে, এম-এ-তে পাবে। হাকিম হবে। চাকরিতে যাবার পথে সে তাকে প্রণাম করে যাবে। বলবে, আপনাকে কিন্তু একবার আমার বাসায় যেতে হবে। সে যাবে। সেখানে পৌঁছে তাকে আশীর্বাদ করে আসবে। সকলের কাছে জয়ধর পরিচয় দেবে, আমার গুরু। ইনিই আমাকে হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে নিজের পাঠশালায় ভর্তি করেছিলেন।

সে বলবে, বাবা মণির মূল্য মণির নিজস্ব। সেই মূল্যেই সে রাজমুকুটে শোভা পায়। যে মণিকার তাকে আবিষ্কার করে কেটে ঘষে উজ্জ্বল করে, তার নাম ওই মণির মূল্যের দৌলতেই অক্ষয় হয়। তার আসল মূল্য মণিকাটা মজুরের মজুরীর চেয়ে বেশি নয়।

—পড়—পড় সব। পড়ে যাও। মণিরা সব পড়ে যাও!

"ভগবান বুদ্ধ একদা রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তপস্যা করিয়াছিলেন মানুষের সর্ববিধ দুঃখমোচনের নিমিত্ত। দীনতম মূর্খতম মানুষের মধ্যে তিনি তাঁহার তপস্যালব্ধ ফল বিতরণ করিয়াছিলেন।" পড়—পড়।

—কি? তোমার কি? এবার তোমার পালা। এবার তোমাকে বৃত্তি নিতে হবে। কি বল?

—অঙ্ক মিলছে না স্যার।

—অঙ্ক মিলছে না! দেখি। হুঁ-হুঁ। এটা কি? জ্যোতিষ পাঁচকে লিখত শূন্যের মত। লিখে যোগ-বিয়োগের সময় নিজেই শূন্য ধরে অঙ্ক ভুল করত। ওই ভুলেই সে বৃত্তি পায় নি। তোর নয় আর এক নিয়ে গোলমাল। নয়কে লিখবি একের মত, এককে লিখবি নয়ের মত। আমার সব পরিশ্রম জলে দিবি। কি বলব? কি বলব তোকে? এই! এই রমন, নিয়ে আয় ছড়ি। আজ তোকে আমি মেরে শেখাব। এক আর নয় যখন লিখতে যাবি তখনই মনে পড়বে এই মারের কথা। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আত্মসম্বরণ করে সে। কি হবে মেরে? তার অদৃষ্ট! সীতারাম হাজার চেষ্টাতেও তাকে বদলাতে পারবে না। সে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে বসে অদৃষ্ট রহস্যের কথাই ভাবে। ধীরাবাবু অদৃষ্ট মানেন না। হায় ধীরাবাবু! ভাবতে ভাবতে ঢুল আসে তার। মাথাটা চেয়ারের পিছনে হেলিয়ে দেয় ক্লান্তিভরে; কয়েক মুহূর্ত পরেই নাক ডাকতে শুরু করে। মুখটা হাঁ হয়ে যায়। ছেলেরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে, মাস্টারের অবস্থা দেখিয়ে হাসে।

গোবিন্দ এখনও আছে। সে আকুর সঙ্গ ছেড়েছে। সেও দেখে আর হাসে। ছেলেদের ইঙ্গিতে শেখায়—দে মাস্টারের মুখে মাছি পুরে দে।

বাড়ি থেকে কৃষাণ এসে ডাকলে—পণ্ডিত মাশায়!

গোবিন্দ গলা ঝেড়ে শব্দ করলে। সীতারামের ঘুম ভাঙল। চমকে উঠল সে।— কি রে? তুই? বাড়ির সব—।

—ভাল গো, ভাল। রত্না-দিদির বিয়ের সম্বন্ধ আইছে। রত্নার মামা একেবারে নোক-জন নিয়ে হাজির। কন্যে দেখবে তারা।

—জয় ভগবান! রত্নাই একমাত্র সন্তান। তার বিয়ে হলেই সে মুক্ত। কাজ শেষ। আজ ৪টা আশ্বিন।

* * * *

তারপর রত্নার বিয়ের দিন।

নোট-বইয়ে সে লিখলে—"উনিশ শো পঁয়ত্রিশ সাল। বাংলা তের শো একচল্লিশ সাল ৭ই অগ্রহায়ণ রত্নার বিবাহ। কি আনন্দ! ছেলেটি ম্যাট্রিক পাস। আই-এ পড়ছে। ভগবান তোমার অপার করুণা।"

সতেরো

দীর্ঘদিন—বারো বৎসর পর। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল।

বারো বৎসর পর সীতারাম সেদিন খুললে তার নোট-বই। স্বাধীন হয়েছে দেশ। চোখে তার পুরু চশমা। নিজের বাড়ির দাওয়ার উপর বসে তার নোট-বই খুলে পড়তে চেষ্টা করলে। আবার তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর—নির্বাপিত-প্রায় প্রদীপের মত। আজ ধীরাবাবু আসবেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশের স্বনামধন্য লেখক ধীরানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন—"পণ্ডিত, স্বাধীন রত্নহাটাকে প্রণাম জানাতে যাব। তোমাকে দেখতে যাব। তুমি যেন এস না। আমি নিজে যাব তোমার বাড়ি। তোমার খাতা নিয়ে আসব।"

জয়জয়কার হোক—ধীরাবাবু আপনার জয়জয়কার হোক। কিন্তু কি দেখবে? বাজে-পোড়া শালগাছ নয়, শিশুগাছ নয়, দেবদারু নয়, বিশাল বট নয়, বিরাট অর্জুন নয়, শ্মশানে আকাশস্পর্শী শিমূলও নয়। অফলা-অপুষ্পা বামনের মতো খাটো—শ্যাওড়া গাছ। শুকিয়ে গেছে, মরবে এবার।

তবে তুমি যখন আসবে তখন তোমাকে তোমার প্রার্থিত খাতাখানি দিতে হবে বৈকি। সে খাতা খুলে পেন্সিল নিয়ে বসল।

ঝুঁকে পড়ে অনেকটা আন্দাজেই লিখে গেল।—

"কি দেখতে আসছেন ধীরাবাবু। স্বাধান হয়েছে দেশ। সেদিন অনেক ধ্বজা অনেক পতাকা—আলো—অনেক গান—অনেক আনন্দ কলরবে দেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রত্নহাটা যে ধ্বংসোন্মুখ। এই সীতারামের মতই যেন শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে রয়েছে সে।

পৃথিবীর ইতিহাস আপনি পড়েছেন ধীরাবাবু। আমি সীতারাম—চাষীর ঘরের ছেলে—ইংরিজী ইস্কুলে—নর্মাল ইস্কুলে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েছিলাম। তারপর আজীবন পাঠশালার পণ্ডিত, পাঠশালার পাঠ্যের মধ্যে ইতিহাস নাই। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসটুকুও প্রায় ভুলে গিয়েছি। ভূগোল? ভূগোলও তাই। আমার ভূগোল রত্নহাটার মধ্যখানে দাঁড়ালে—চারিপাশে গোল হয়ে আকাশ নেমে আসে যে সীমানাটুকুকে ঘিরে—আমার ভূগোল ততটুকু। তবে দেখলাম এবার ইতিহাস। উনিশ শো একুশ সাল থেকে তুমি রত্নহাটার ছেলে—ভারতবর্ষের স্বাধীরতা যুদ্ধে মাতলে, সে আমার কাছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ নয়, রত্নহাটার স্বাধীনতার যুদ্ধ। সাতচল্লিশ সালে শেষ হয় সে যুদ্ধ। এর মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে এসে রত্নহাটার ইতিহাসকে টেনে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে। যুদ্ধ বড় বড় রাজ্যের ইতিহাসকেই শুধু পাল্টায় নি, রত্নহাটার ইতিহাসকেও পাল্টে দিয়ে গেল। যুদ্ধ এল।

রত্নহাটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ভেঙে গেল বড় বড় সংসার। শ্রী গেল—সম্পদ গেল। যারা উঁচু মাথা করে ছিল—তার মাথা হেঁট করলে। মণিবাবুকে একবার দেখে যেয়ো ধীরাবাবু। ঘরের ভিতর চুপ করে বসে থাকেন। চাকর রাখবারও সঙ্গতি নাই। নিজেই তামাক সেজে খান। দ্বৈপায়নে মহামানী দুর্যোধনের কথা পুরাণে পড়েছি। তোমার রত্নহাটার কাহিনীতে অন্ধকারে মণিবাবুর আত্মগোপনের কথা লিখো।

আমি জানি ধীরাবাবু, তুমি বলবে—পণ্ডিত, এখনও বাকী আছে। উরুভঙ্গ। তুমি মানুষের সঙ্গে মানুষ হয়ে মিশে গেছ। তুমি হাসবে। বলবে—যে জ্ঞাতি-মানুষদের ওরা বঞ্চনা করেছে—তুমি তাদের দিকে। তুমি হয়তো বলবে—আমিই গদাযুদ্ধের সময়—উরুতে চপেটাঘাত করে গদাঘাতের ইঙ্গিত দেবো। তা দিয়ো। আমি যদি থাকি—তবে কাঁদব। কাঁদব ধীরাবাবু।

আমার চোখ গিয়েছে ভালই হয়েছে। আমাকে ধ্বংসোন্মুখ রত্নহাটা আর দেখতে হয় না। তুমি হেসে বলবে—ভয় কি পণ্ডিত! আবার নতুন করে গড়ব।

গড়ো, তাই গড়ো ধীরাবাবু। অমৃতের তপস্যা তোমার—তুমি গড়ো। আমি পাঠশালার পণ্ডিত। আমার সন্দীপন পাঠশালাই ভেঙে গেছে, আমি অন্ধ হয়ে বসে আছি। আমার মনোরমা নাই। আমার রত্না বিধবা হয়েছে। আমি মৃত্যু-কবলিত। অজগর যেমন করে ধীরে ধীরে শশক ধরে গ্রাস করে—তেমনি করেই মৃত্যু আমাকে গ্রাস করছে। তবে তফাৎ কি জান? তফাৎ—শশকের মত আমি আর্তনাদ করছি না।”

মনোরমা হাসতে হাসতে মরেছে, মৃত্যুকে সে চেয়েছিল।

তার কাছে শিখেছে। লেখা বন্ধ করে সে খাতার পাতা উল্টে যায়।

“১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর মনোরমা মুক্তি পেলে। হ্যাঁ, এ মৃত্যু তার মুক্তি। বড় নিষ্ঠুর আঘাত সে পেয়েছিল। রত্নার বৈধব্য নিদারুণ শেলের মত তার বুকে বেজেছিল।” রত্না বিধবা হয়েছে।

আবার ওল্টালে খাতা।

১৯৩৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর রত্না বিধবা হয়েছে। লেখা রয়েছে—“পাঠশালায় বসেই টেলিগ্রাম পেলাম।” রত্না—তাদের একমাত্র কন্যা, রত্নাবলী নাম রেখেছিল সাধ করে। আই-এ পড়া ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ছে, পাদ্রীদের চিকিৎসায় তার চোখের দৃষ্টি মোটামুটি ভালই ছিল। আকাশে সেদিন মেঘ ছিল। ছেলেরা পড়ছিল। হঠাৎ এল টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম পড়ে পাথর হয়ে গেল সে। কানে শুনতে পাচ্ছিল না, চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, পৃথিবী যেন মুছে গিয়েছিল। গোবিন্দ শঙ্কিত হয়েছিল—সে এসে ডেকেছিল—পণ্ডিত! পণ্ডিত!

তার সম্বিৎ ফিরল, কানে শুনলে কিসের শব্দ হচ্ছে—ঝর, ঝর, ঝর, ঝর! কিন্তু বুঝতে

পারলে না কিসের শব্দ। ছেলেরা পড়ছে—অ-আ-ই-ঈ।

—ক—র—কর। খ—ল—খল। জ—ল—জল।

জল পড়ে—পাতা নড়ে। জল পড়ে পাতা নড়ে।

সীতারামের চোখের জল দৃষ্টি অবরুদ্ধ করেছিল। ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে তখন—কানে শুনতে পেয়েছিল, চোখে দেখতে পায় নি। সেই আরম্ভ হল তার চোখ থেকে আবার জল পড়া। সে আজও থামে নি। চোখ আছে—দৃষ্টি নাই, দেখতে পায় না শুধু জল পড়ে; আপনিই পড়ে।

ওদিকে এই শোকে মনোরমা শয্যা পাতলে। আর উঠল না। নিঃশব্দে নিজের মন্দ অদৃষ্টের লজ্জায়—ঈশ্বরের উপর—সীতারামের উপর—অভিমান করেই চলে গেল একদিন।

মনোরমার শেষ কথাগুলিও লিখে রাখবার তার ইচ্ছা ছিল। কয়েকদিন চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পারে নাই। যতবার চেষ্টা করেছিল—ততবারই তার চোখ থেকে অনর্গল ধারায় জল ঝরে পড়েছিল। রেখে দিতে হয়েছিল খাতা কলম। থাক লেখা। কি হবে? বুকে লেখা রইল। অক্ষরে অক্ষরে—অস্থি পঞ্জরে খোদিত হয়ে রইল।

সজ্ঞানেই মনোরমা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। যেন হাসতে হাসতে মরণ সায়রে ডুব দিলে, আর উঠল না; গলে গলে—চিনির পুতুলের মত। বার চারেক শুধু ব্যাকুল হয়ে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করেছিল। তার পরই মাথাটি হেলে যেন ঢলেই পড়েছিল।

মৃত্যুর পূর্বে সে বার বার তার হাত ধরে বলেছিল—তোমাকে আমি সুখী করতে পারি নাই। আশীর্বাদ কর, যেন পরজন্মে তোমাকে পাই, তোমার মনের মত হয়ে তোমাকে সুখী করতে পারি।

চমকে উঠেছিল সীতারাম।—কেন? কেন? এ কথা কেন বলছ মনো? তোমাকে আমি বহু ভাগ্যে পেয়েছিলাম। ও কথা বল না তুমি। না না। বলে চিৎকার ক'রে উঠেছিল সে।

মনোরমাও বলেছিল—না। বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। বলেছিল, আমি জানি। আমি জানি তুমি সুখী হও নি। তোমার অসন্তোষ আমি বুঝতে পারতাম যে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সীতারাম। অনুতাপে ভরে উঠেছিল তার মন। ইচ্ছে হয়েছিল অপরাধ তার স্বীকার করে। কিন্তু পারে নি, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুশয্যায় মনোরমার শিয়রে দেওয়ালের গায়ে মুহূর্তের জন্য ফুটল একটি ছবি। রাত্রির অন্ধকারে একটি আলোকিত জানালার পর্দার গায়ে কালো ছায়ায় আঁকা একখানি মুখ।

অনেকক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করে সে তাকে বলেছিল—তা হলে তো তুমিও সুখী হতে পার নি মনো! তুমি আমাকে ক্ষমা করে যাও। মনো!

মনোরমা সুন্দর হাসি হেসেছিল। হেসে কিছু বলতেই যাচ্ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কি হল। ব্যাকুল অস্থির হয়ে উঠল সে, বার কয়েক হাঁ করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করলে, হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করলে—তার পরই সব স্থির হয়ে গেল; ঢলে পড়ে গেল।

সীতারাম কাঁদে নাই। ফুল তুলে সাজিয়ে সে মনোরমাকে নিজে হাতে চিতায় তুলে দিয়েছিল। সে তার বাল্যকালে পুত্রশোকবিজয়ী মহর্ষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছিল শান্তিনিকেতনে। মনে মনে সেই ছবি স্মরণ করেছিল। প্রশান্ত মুখে বসে রত্নাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। আজ থেকে তাকেই রত্নার বাপ মা দুই-ই হতে হবে। বুকের দুঃখ বুকে রেখে হাসি মুখেই তাকে বাকী দিনগুলি কাটাতে হবে।

লোকে সান্ত্বনা দিতে এসে খানিকটা বিস্মিতই হয়েছিল। প্রৌঢ় বয়সে পত্নীবিয়োগে কেউ বুক চাপড়ে কাঁদে না, সেটা দেশে সমাজে লজ্জার কথা। কিন্তু এমন স্থির শান্ত দেখবে এও তারা প্রত্যাশা করে নাই। লোকে ভালও বলেছিল, মন্দও বলেছিল। সে অবশ্য আড়ালেই বলেছিল। মুখের উপর বলেছিল—কানাই রায়। কানাই-কাকা তাকে ভালবাসত। তবে বিচিত্র মানুষ। সে সেদিন তাকে বলেছিল—তুমি আচ্ছা পাষাণ বট বাবা। তারপর আবার বলেছিল—উঁহু, তাই বা কি করে বলি! পাষাণের সুখও নাই দুঃখও নাই। তোমার বাবা সব উল্টো। সুখের সময় মুখে হাসি দেখলাম না কখনও। আবার এত দুঃখ—চোখে তোমার জল দেখছি না; সুখের সময় মুখ দেখে মনে হয় আহা লোকটার কত দুঃখ। আজ দেখছি হেসেই বলছ, এস কাকা, এস।

হাতটা উল্টে দিয়ে সে বুঝিয়ে দিয়েছিল—কে জানে! কিছুই বুঝলাম না তোমাকে। তারপর আবার বলেছিল—আচ্ছা—দুঃখেই তুমি সুখ পাও নাকি বল দেখি?

সীতারাম বলেছিল—সংসারে দুঃখই তো পরম বস্তু রায়-কাকা। সুখের সময় ভগবানকে লোকে ভুলে যায়, দুঃখ তাঁকে মনে পড়িয়ে দেয়।

রায় বলেছিল—কে জানে বাবা, দুঃখ কাকে বলে তা তো বুঝলাম না।

—বুঝলে না? হেসেছিল সীতারাম।

—কে জানে? হাত দুটো উল্টে দিয়ে তাচ্ছিল্যভরেই সে বলেছিল—হাসলাম, খেললাম, নাচলাম, গাইলাম, দিন চলে গেল। কাবার করেও এনেছি। কই, দুঃখ কই? অবিশ্যি নাচতে গেলে পা পিছলায়, ছুটতে গেলে হুঁচোট লাগে, বাঁচতে গেলে অসুখ করে; মদ খেলে খোঁয়াড়ির সময় মাথা ধরে; যখন হয় চেঁচাই—কাঁদি, তাতেই সুখ। তুমি কাঁদ—দেখ সুখ পাবে।

যাবার সময় বলেছিল—আমি তো এসেইছি নিজে, রাণীমাও বার্তা পাঠিয়েছেন। বলেছেন—গাড়ি করে একদিন যাব। বড় দুঃখ পেয়েছে সীতারাম, তাকে ছেলের মতই স্নেহ করি—আমি বড় দুঃখ পেলাম। একদিন যাব।

—সে কি? চমকে উঠেছিল সীতারাম। মা আসবেন কি? না, না।—কাকা, মাকে বলো আমি নিজেই যাব। কালই যাব।

পরদিনই সে গিয়েছিল।

মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে—মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন—তোমার সিদ্ধি হবে বাবা। তোমার সহ্যশক্তি দেখে আমি বুঝতে পারছি—তুমি পাবে।

ওই এক বিচিত্র মানুষ। চিরটাকালের মধ্যে সীতারাম তাঁকে যত ভালবেসেছে—তত ভয় করেছে। সে ভয় তার এক তিল কমে নাই। তবে হ্যাঁ, রাণীমা সত্যকারের রাণীমা ছিলেন। হিমালয়ের মত সাদা বরফে ঢাকা। তেমনি উজ্জ্বল—তেমনি প্রদীপ্ত তেমনি কঠিন। অথচ তাঁরই বুক থেকে ঝড়ে পড়ছে—গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র। করুণার ধারা।

ধীরাবাবুর কত নাম। কত গৌরব। দেশ-দেশান্তরে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর খ্যাতি তবু ওই এক অপরাধের জন্য—তিনি কোন দিন ছেলের কাছে গেলেন না, ছেলেকে ডাকলেন না। বলেছেন, একা ধীরাকে কি করে ডাকব? বউমার ছোঁয়া-নাড়া খাব না, তা ছেলেদের বুকে নিয়ে মন খুঁত খুঁত করবে—তাদের ডাকতে পারব না; ধীরা কি খুশী হয়ে আসতে পারবে? মায়ের এই ভ্রান্তিতে সীতারামের দুঃখ হয়। তবে হোক ভ্রান্তি, তাঁর চরিত্র মহিমায় অন্তর-বেদনায় ওই ভ্রান্তিও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বেদনা সীতারাম বুঝত।

দেবুকে নিয়েই তিনি প্রসন্ন মনে কাটিয়ে গেছেন জীবনটা। দেবু ক্রমে এ অঞ্চলে নামকরা দেশসেবক হয়েছে। তাতেই তিনি খুশী ছিলেন। তবে তিনি অন্যায় করে গিয়েছেন। দেবু-শ্যামুর হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই এ কথাটা উপলব্ধি করে সীতারাম। দিনকাল খারাপ হয়ে আসা সত্ত্বেও—মা বাড়ির ক্রিয়াকলাপের নিয়ম এবং বরাদ্দের একতিল কমাতে দেন নাই। ফলে দেবু-শ্যামুর অবস্থা খারাপ হয়েছে বেশী। বরাদ্দ কমাবার প্রস্তাব মুখে আনবারও উপায় ছিল না। আনলে প্রচণ্ড ঘৃণার ভাব ফুটে উঠত তাঁর মুখে-ঠোঁটে; সে কি দৃষ্টিতে তাকাতেন তিনি! রত্নহাটার বাবুদের বাড়ির সে আমলটাই যেন তাঁর সঙ্গে চলে গেল। মা চলে গেছেন কিন্তু তাঁকে মনে করে সীতারাম আজও ভয়ে সম্ভ্রমে সজাগ হয়ে ওঠে। তাঁর মহিমা ও মাধুর্যের কথা ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে যায়।

মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর রোগশয্যায়। তখন পাঠশালা সে বন্ধ করেছে। চোখের দৃষ্টি একেবারে ক্ষীণ হয়েছে। লাঠি হাতে ইশারায় খুঁজে খুঁজে গিয়ে মাকে দেখতে গিয়েছিল।

—কেমন আছেন মা?

সে কথার উত্তর দেন নাই তিনি। প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার এমন দৃষ্টি হা

হেসেছিল সীতারাম। কপালে হাত দিয়েছিল।

মা বলেছিলেন—দীক্ষা নিয়েছ বাবা? দীক্ষা নাও তুমি। বাইরের আলো যখন কমতে শুরু করেছে তখন ভেতরে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা কর।

* * * *

দীক্ষা সে নিয়েছে।

গুরুকে প্রণাম, আর মা—আপনাকে প্রণাম। গুরু দিয়েছেন মন্ত্র—আপনি দিয়েছিলেন পরামর্শ। ধীরাবাবু মন্ত্রের কথা শুনে হেসেছিলেন। সীতারাম তাঁকে পত্রে লিখেছিল সংবাদটি। উত্তরে ধীরাবাবু লিখেছিলেন—"কোন্ মন্ত্র নিলে পণ্ডিত? সরস্বতী মন্ত্র হলে কিছু বলবার নাই আমার। কিন্তু সে দীক্ষাও তো তোমার অনেক দিন হয়েছে। নিজেই নিয়েছিলে। তার গুরু কে—সে তুমিই জান। পণ্ডিত, কপালে ফোঁটা তিলক কাটা তোমার চেহারা কল্পনা করেছি—আর হেসেছি। না না পণ্ডিত, এ আমার ভাল লাগল না।" সীতারাম লিখেছিল—"ধীরাবাবু—আপনার কর্ম উচ্চ, সাধনা বিপুল, হয়তো জন্মান্তরের পুণ্য—নয়তো যে কোন কারণেই হোক জন্ম থেকেই আপনার উপলব্ধির প্রতিভা বড়। আপনার মন্ত্রের প্রায়োজন নাই। আমার আছে।"

আছে বই কি! ধীরাবাবু, যারা আকাশে ওঠে—উঠতে পারে—তাদের কাছে আকাশের কথা, আকাশে উঠবার পথের উপদেশ বা মন্ত্র না নিয়ে মাটির মানুষের উপায় কি?

কানাই রায়ের কথা তবে বলি শোন।

ওই মানুষ কানাই রায়—নেচে-গেয়ে হেসে-খেলে চিরটাকাল যে একভাবে কাটিয়ে গেল তার শেষ কথা বলি শোন। উপপদ-তৎপুরুষ লোকে তাকে কেউ চাইলে না, সেও কাউকে কেয়ার করলে না। লোকে তার কথা শোনে নাই, তবু সে বলতে ছাড়ে নাই। বাবুদের বাড়িতে কাটালে চিরটাকাল। তাদের হিতকামনা করলে, বাবুদের পাওনার আগে নিয়মিত দস্তুরী আদায় করলে—মদ খেলে; উঁচু গলায় বললে—কে জানে বাবা দুঃখ কাকে বলে। সেই কানাই রায় মরবার সময় বললে—সীতারামকেই বললে—ভগবানকে কি বলে কি বল দিকিনি সীতারাম? ডাকতে যাচ্ছি ডাকা হচ্ছে না। বড় ভয় হচ্ছে যে! ওরে কি করি বল দিকিনি?

নিউমোনিয়া হয়েছিল কানাই রায়ের। বাবুদের বাড়িতেই মরেছে। মা তখন নাই, কাজেই যত্নও হয় নাই। অযত্নেই পড়েছিল; দেখতে গিয়ে সীতারামই শেষ তিনদিন তার কাছে ফেলে আসতে পারে নাই। তখন তার ঘোর বিকার। আঃ! আঃ! শব্দ করে বুকের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল; মধ্যে মধ্যে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে আঙুল বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠছিল, মরল মরল রে! গেল, গেল, গেল!

—কি হল? রায়-কাকা! রায়-কাকা!

—যাঃ। শালা খুব বেঁচে গিয়েছে।

শেষদিন জ্ঞান হয়েছিল। সীতারামকে দেখে হেসে বলেছিল—তুমি? তা না হলে আর কে হবে!

সীতারাম বলেছিল—কেমন আছ?

বুকে হাত দিয়ে রায় বলেছিল—বুকে বড় কষ্ট।

তারপর বলেছিল ওই কথা। বলেছিল—ওর চেয়ে কষ্ট মনে। বুঝেছ! ভগবানকে কি বলে ডাকব বুঝতে পারছি না। ডাকতে গিয়ে ডাকতে পারছি না। তুমি বলতে পার? মরতে ভয় লাগছে।

দীক্ষার কথায় তুমি হেসো না ধীরাবাবু। তোমার তো হাসা উচিত নয়। ধীরাবাবু, যারা ছোট মানুষ মাটিতে থাকে তারা, হাত বাড়িয়ে উঁচুতে যে মানুষ থাকে তাকে নাগাল পায় না। ওপরের মানুষকে তারা বুঝতে পারে না। আবার ছোট মানুষ যারা সুযোগ সুবিধা পেয়ে ওপরে ওঠে তারাও নিচের মানুষকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে না। কিন্তু যারা সত্যি বড় মানুষ, তারা মাটিতে দাঁড়িয়েও উঁচুতে যারা আছে তাদের নাগাল পায়, উঁচুতে উঠেও—নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে মাটির মানুষের হাত ধরে। তাদের তো বুঝতে ভু হবার কথা নয়!

দীক্ষা না নিলে কাল কাটত কি করে বলুন?

চোখের সামনে সবই প্রায় মুছে গিয়েছে: সাদা কুয়াশায় ঢাকা পৃথিবী। দাওয়ায় ব থাকি আর মনের মধ্যে ইষ্টকে ডাকি।

বেলা নটায় একবার পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক হয়।

ছেলেরা রাস্তা দিয়ে পাঠশালা যায়। সন্দীপন পাঠশালার ঘড়িটা ঘরে টাঙানো আছে সেটাতে ঢং ঢং করে নটা বাজলেই কান তার সজাগ হয়ে ওঠে। ঝুঁকে দেখে সীতারাম কুয়াশার মধ্যে আবছা মূর্তির মত ছেলেদের দেখে—নিতাই তাদের ডাকে,—প্রশ্ন করে— চললে সব?

—হ্যাঁ।

—ইস্কুল কেমন লাগছে?

—ভাল।

—ভাল? সত্যি বলছ?

—হ্যাঁ। সত্যি বলছি।

—মাস্টার মারে না?

—তবে ? তবে কেন ভাল লাগছে ?

—লাগে। কত ছেলে আসে এ-গাঁ ও-গাঁ থেকে। কেমন সুন্দর বাড়ি। অনেক ছবি। কেমন চকচকে বেঞ্চি।

সীতারাম চুপ করে যায়। সে ভাবে কালের পরিবর্তনের কথা। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার সন্দীপন পাঠশালা উঠে গিয়েছে গত চল্লিশ সালে। তখন ফ্রি প্রাইমারী ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। আপসোস তার ছিল না। সে অক্ষম হয়েছে, অন্যদিকে বিনা বেতনে দেশের সবাই পড়তে পাবে, সুতরাং এতে তার আক্ষেপের কি আছে। আক্ষেপ শুধু নামটা যদি থাকত। সন্দীপন পাঠশালা। আর আক্ষেপ তার প্রথম জীবনে এমন সুযোগ কেন পায় নাই ? সে যদি এমনি একটি সুসজ্জিত ইস্কুলে শিক্ষকতা করতে পেত! উদাস হয়ে যায় সে। হঠাৎ তার একটা কথা মনে হয়। সে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা—আচ্ছা! তোমাদের চেয়ার টেবিল ঘর বাড়ি তো ভাল হয়েছে—ফুলের বাগান করেছ তোমরা। ওহে ? কই! সব চলে গেলে নাকি ?

তারা তখন চলে গিয়েছে।

সীতারাম চুপ করে বসে থাকে। পথ দিয়ে কেউ গেলে ডাকে—কে যাচ্ছ ?

—আমি হে পণ্ডিত।

—কে ? চণ্ডীচরণ ?

—হ্যাঁ।

—শোন, শোন।

—মেলা কাজ পণ্ডিত, শুনবার এখন সময় নাই। গাই দুইতে হবে। কচি বাছুর। তার উপর গাইটা মাথা নাড়ে। মেয়েদের সাধ্যি নাই কাছে যায়।

—যাও। তবে যাও।

চণ্ডীচরণ অর্ধ মিথ্যা বলে গেল। গাই হয়তো দুইতে হবে কিন্তু তার জন্যই সে এত ব্যস্ত হয়ে চলে গেল না, সীতারামের কাছে বসতে চায় না বলেই চলে গেল। সে জানে, ওরা বলে—বাপ্, ওই মানুষের কাছে বসা চলে ? শুধুই লেকাপড়ার কথা—নয়তো বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথা। যদি দুটো রসের কথা বলব তো একেবারে ছি-ছি করে উঠবে। রামঃ!

কি করবে সে ? সে এসব পারে না। কেমন যেন রুচি হয়ে গিয়েছে তার ; পবিত্র হয়তো বটে কিন্তু একটু বেশী শুকনো-কঠিন তাতে সন্দেহ নাই। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ডাকে—মা রত্না!

রত্না এ সময়টা রান্নার কাজে থাকে। সে ভিতর থেকে উত্তর দেয়—কি বাবা ?

—কি করছিস ?

—তরকারি চড়িয়েছি বাবা।

—ও, তবে থাক।

—কেন বাবা? চা খাবে?

এখন ওই অভ্যাসটা করেছে সে। চা খায়। দুবার তিনবার চারবারও খায়। চায়ের লাভে দু-চারজন আসে। কেউ না এলে রত্না কাছে বসে একটা বাটি নিয়ে।

আর কিছুই না হলে, চুপ করে বসে থাকে। ভাবে—সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে—চলছে সে, চলছে সে, চলছে সে। সেই শুধু বসে আছে। সে ভাবনাও দুঃসহ হয়ে উঠল—কি করবে সে? বলতে পার ধীরাবাবু? কি করবে?

তখন ওই ইষ্টমন্ত্র জপ। ধ্যান করতে চেষ্টা করে সেই ইষ্টদেবতার রূপ। মন্ত্র না হলে চলে ধীরাবাবু!

কাল কাটে। চমৎকার কাটে। কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতেই পারে না। রত্না এসে ডাকে—বাবা ওঠ, চান কর। বেলা যে অনেক হল।

সত্যিই বেলা অনেক; স্বাধীন রত্নহাটার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে—বড় ইস্কুলে—টিফিনের ঘণ্টা বাজে—ঢং ঢং ঢং—ঢংননননন।

* * *

ধপ্ ধপাস্, ধপ্ ধপাস্;—দুটো অসমান শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। সীতারাম শুনেই বুঝলে, শ্রীমান বাঁকাচাঁদ গোবিন্দ ছোট-বড় পায়ে একটা বেশী একটা কম শব্দ তুলে ছুটে আসছে এস বাঁকাচাঁদ, বঙ্কুবিহারী।

ওই—ওই একজন আছে—তার এই নিঃসঙ্গ-জীবনের সঙ্গী। মধ্যে মধ্যে দু দিন তিন দিন অন্তর এক-এক দিন গোবিন্দ আসে। এক বেলা—কোন দিন দু বেলাই কাটিয়ে যায়। রাজ্যের সংবাদ নিয়ে আসে।

—বুয়েচ না পাণ্ডিত, ভারী জবর খবর গো আজ।

—কি জবর খবর বাঁকা রায়?

—মানে, কলির শেষ। মা চণ্ডীর থানে সবাই পুজো করতে পাবে, মন্দিরে ঢুকবে আইন হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই গুরুতরো বেপার, চাটুয্যে বাড়িতে এক কিম্ভূতকিমাকার সন্তান মাথায় সিং। কলির শেষ!

এমনি বিচিত্র খবর আনে সে। কোন দিন খবর আনে—"মন্ত্রী আসছে রত্নহাটায়। বাবুতে বাবুতে মারামারি লেগে গিয়েছে। এ বলছে মন্ত্রীকে হামারা বাড়িমে উঠনে হোগা, ও বলছে কভি নেই, হামারা বাড়িমে উঠেঙ্গা।"

স্বাধীন দেশের মন্ত্রী আসছে। বিবাদ করবে বই কি বাবুরা। করুক। কিন্তু মন্ত্রীর বাবুদের বাড়ি ওঠে কেন? মনটা কেমন অসন্তোষে ভরে ওঠে। গরীবের বাড়িতে ওঠে না কেন?

কোন দিন খবর আনে, কলকাতায় বাড়ি ঘর ভেঙে চুরমার। উড়োজাহাজ ভেঙে পড়েছে।

কোন দিন বাঁকাচাঁদ আসে, বলে—"পণ্ডিত হয়েছে। চল কালই চল। একেবারে চোখ ভাল করে নিয়ে বাড়ি আসবে। স্বপ্ন দিয়ে তীর্থ উঠেছে গো, যেমন রোগী হোক, সাতদিন চান করে গড়াগড়ি দিলেই ভাল হয় যাচ্ছে। বুয়েচ না, কুষ্ঠ রোগী সেরে গিয়েছে। এই কাছেই হে। কোশ বিশেক হবে।"

সীতারাম হাসে। সে ইষ্টমন্ত্র জপ করে বটে, কিন্তু এ বিশ্বাস ওর নেই।

একদিন খবর এনেছিল, পণ্ডিত তোমার জয়ধরকে দেখলাম। অঃ! এই শরীর হয়েছে, রাজ্যের জিনিস সঙ্গে। ইস্টিশানে নামলে। আমাকে চিনলে হে। বললে, খোঁড়া গোবিন্দ! আরদালীটা আমাকে ভাগো ভাগো করছিল কিন্তু জয়ধর চিনলে বলে সরে গেল। তোমার কথা শুধালে; আমি বলছিলাম তোমার বেবরণ, তা সব বলা হল না। তার আগেই তোমার ভাড়ার মটর এসে গেল। জিনিসপত্র নিয়ে ভোঁ করে চলে গেল। আমাকে আট আনা দিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম গোটা টাকাটাই দেবে। হাকিম একটা! তা তোমার আট আনা!

জয়ধর এখন মুন্সেফ।

সীতারামের নোট-বইয়ে জয়ধরের নাম বহুবার থাকবার কথা কিন্তু তা নাই; আছে তার ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাওয়ার খবর। আই-এ তে দ্বিতীয় হওয়ার খবর। তারপর আছে একটা খবর, সেটা লিখেও কেটে দিয়েছে সীতারাম। বি-এ যখন পড়ে জয়ধর, তখন একদিন আকু স্টেশন থেকে ছুটে এল। স্যার জয়ধর নেমেছে স্টেশনে।

জয়ধর! সীতারাম উচ্ছ্বসিত হয়ে আকুকে বলেছিল, আকু, তাকে গিয়ে বল্ আমি ডাকছি। শিগ্‌গির যা।

জয়ধর কলেজ থেকে আসে যায়, এ পথে নয়। অন্য স্টেশনে নেমে ঘুর-পথে যায়। তার মা তখন চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে বাড়িতে। সীতারাম বুঝতে পারত জয়ধরের লজ্জার হেতু।

আকু গেল। সীতারাম অপেক্ষা করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রইল। কিন্তু দুজনের একজনও এল না। অবশেষে জ্যোতিষ সাহার ভাইপোর কাছে খবর পেলে—আকুতে এবং জয়ধরে স্টেশনে একটা বিশ্রী ঝগড়া হয়ে গিয়েছে।

—কেন? কিসের ঝগড়া? তার অনুশোচনা হল—কেন এই চণ্ডাল আকুকে সে তাকে ডাকতে বলেছিল।

সীতেশ একটু চুপ করে থেকে যেন দ্বিধা করেই বললে—আকু বলেছিল—পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করে যা জয়ধর। তাতে জয়ধর বলেছিল—আমার দেরি হয়ে যাবে বাড়ি যেতে।

তাতেই আকু বুঝি বলেছিল—হ্যাঁরে—দেরি হবে বলে পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করবি না? আচ্ছা নেমকহারাম তো তুই। এই ঝগড়া। জয়ধর সব কি বলেছে, আকুও বলেছে। আকুর মুখ তো।

জয়ধর বলেছিল—অনেক পণ্ডিত অনেক মাস্টারের কাছেই পড়লাম—সকলের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করতে হলে—পা ক্ষয়ে আধখানা হবে, মাথা ঠুকে ঠুকে আব হবে কপালে। তোর ওই একটা পণ্ডিত—তুই যা।

আকুও জয়ধরের ঝিয়ের সন্তানত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বলেছে অনেক কথা; রত্নহাটার বাবুদের ছেলে সে। কিন্তু জয়ধর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সে এমন তীক্ষ্ণ ভাষায় তাকে শরাঘাত করেছে যে, আকু হার মেনেছে। তারপর জয়ধর অন্য রাস্তা ধরে বাড়ি চলে গিয়েছে। দেখা করে নাই।

এ ঘটনাটি লিখেও সে কেটে দিয়েছে।

তবে তার বি-এ, এম-এ পাসের তারিখ আছে। মুন্সেফ হওয়া সংবাদ পাওয়ার তারিখ আছে। আর নাই। কল্যাণ হোক জয়ধরের; জয়ধরকে সে জীবন থেকে মুছে ফেলেছে। ওই মুন্সেফ হওয়ার সংবাদ পেয়ে—সে জয়ধরকে আশীর্বাদ করে চিঠি লিখেছিল; নিজের অবস্থার কথাও লিখেছিল—পার তো একবার হতভাগ্য পণ্ডিতকে দেখে যেয়ো। উত্তরে চিঠি আসে নাই, এসেছিল পাঁচ টাকার একটি মণি-অর্ডার। হায় জয়ধর! সীতারামকে তুই ভিক্ষুক ঠাওরালি। সে কি তোকে সাহায্যের জন্য তার দুঃখ জানিয়েছিল রে? টাকাটা সে ফেরত দিয়েছিল। সেই দিন থেকে সে তাকে মন থেকে মুছে ফেলেছে।

তবু তার অমঙ্গল কামনা সে করে নাই। ধীরাবাবুরই একটা কথা সে স্মরণ করেছিল—ধীরাবাবু একদিন দেবুর প্রথম ভাগ উল্টে দেখতে দেখতে বলেছিলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয় ত্রিকালদর্শীর মত প্রথম ভাগ রচনা করেছেন পণ্ডিত। দেখেছেন আগে অচল তারপর অধম। সংসারে যে চলে না তাই অচল, আর যা অচল—তা-ই অধম। সেদিন সীতারাম বলেছিল, না ধীরাবাবু কথাটা উল্টো, যা বা যে অধম তা-ই বা সে-ই অচল। দেখুন না আমাদের দিকে তাকিয়ে, অধম ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি তাই অচল হয়েই রইলাম সংসারে। শিবকিঙ্করের দিকে তাকিয়ে দেখুন অধম কুলে অধম ভাগ্য নিয়ে জন্মায় নাই বলেই অচল হয়েও উত্তম বলে চলে যাচ্ছে।

এখন সে মনে মনে স্বীকার করলে, যে চলে না সে-ই অচল, যে অচল সে-ই অধম। জয়ধর চলেছে ছুটেছে। সে চলে নাই সে অচল অধম।

গোবিন্দ অসম পায়ে বিচিত্র শব্দ তুলে আজ ছুটে এল।—পণ্ডিত!

—কি সংবাদ বাঁকাচাঁদ? কি গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে আজ?

—এসে পড়ল পণ্ডিত!

—কে?

—তোমার ধীরাবাবু হে।

—সে কি? তিনি তো সন্ধ্যের পর আসবেন।

—না হে, মিটিং-ফিটিং বাদ দিয়ে বললে, আগে আমি পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করব।

অভিভূত হয়ে পড়ল সীতারাম। বিশ্বসংসার যে মধুময় হয়ে উঠল। এত মধু আছে পৃথিবীতে? ধীরাবাবু কে? এ তো সব পৃথিবীর মধু—এই পৃথিবীর দান। পৃথিবীর মধুতে ধীরাবাবু মধুর।

—পণ্ডিত! ধীরবাবু সত্যই এসে দাঁড়াল।

সীতারাম জীর্ণ অবনত শরীর সোজা করে বসল। ধীরাবাবু! শরীর তার আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল।

সবলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ধীরানন্দ।—আমি এসেছি পণ্ডিত।

—আমি জানি আপনি আসবেন। রত্না, আসন দে, আসন দে মা।

রত্না আগে থেকেই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল! সে বললে, আসন এনেছি বাবা।

—দে, পেতে দে। আমার কাছে আয়। নিজেই রত্নার মাথায় হাত দিয়ে বললে, আমার রত্না ধীরাবাবু। আমার শক্তিশেল! প্রণাম কর্ মা।

ধীরানন্দ তাকে আশীবাদ করলে।

সীতারাম বললে, লক্ষ্মণের চেয়েও আমি বেশী বীর ধীরাবাবু। শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ অচেতন হয়েছিলেন, হনুমানকে বিশল্যকরণীর জন্যে গন্ধমাদন আনতে হয়েছিল। আমি শক্তিশেল বুকে গেঁথে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সে হাসলে, তারপর বললে, কই, আপনি একটু এগিয়ে আসুন, দেখি আপনাকে, কত বড় লোক আপনি।

—চোখে কি একেবারেই দেখতে পাও না মাস্টার?

—পাই। ভাল পাই না।

—তাই তো।

—আর তাই তো কেন?

—বয়স তো তোমার বেশি নয়।

—পাঠশালায় পণ্ডিত, যাদের মাসে আয় পনেরো টাকা। তাদের এই বয়সই ঢের। তা ছাড়া—। হাসলে পণ্ডিত। হেসেই বললে, জানেন তো, সন্দীপন পাঠশালা উঠে গেল। শিক্ষা-কর বসল দেশের উপর। ফ্রী ইউ-পি স্কুল হল; আমার পাঠশালাও তারই মধ্যে চলে গেল। আর চোখ নিয়ে কি করব?

—না পণ্ডিত। তুমি বীর, তুমি সত্যকারের পণ্ডিত। আজ এই নতুন ইস্কুলে তোমাকে

দরকার ছিল। নতুন কালে পুরনো কথা, সুখের দিনে দুঃখের কথা বলার মানুষ না হলে যে চলবে না।

—না, আর নয়। চোখও গিয়েছে। কালও নতুন ধীরাবাবু। নতুন ভাল লোক এসেছে। বেশ লোক, ভাল ছোকরা। আলাপ করে আনন্দ পেয়েছি। অনেক কথা হয়েছে তার সঙ্গে। বললে কি জানেন? বললে, সব মানুষকে লেখাপড়া শেখাতে হবে—চণ্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত। ধীরাবাবু, শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। শেখাক। শেখাক। যদি বাঁচি, তবে সেদিন যেন একবারের জন্যেও দৃষ্টি ফিরে পাই। মানুষের সে মুখের চেহারা একবার দেখব।

ধীরানন্দ তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, ওসব কথা থাক পণ্ডিত।

—থাকবে?

—হ্যাঁ। আমি তোমার নিজের কথা শুনতে এসেছি।

—ওই তো আমাদের নিজের কথা গো। অ-আ-ক-খ, লেখাপড়া সবাই শিখুক—পাঠশালার পণ্ডিতদের এ ছাড়া আর কথা কি আছে বলুন? যে না পারবে শিখতে, তাকে বেকুব, বেহুদ্দা, গাধা বলে গাল দোব। হাসতে লাগল সীতারাম।

—সে আমি জানি। ও কথা আমি অনুমান করতে পারি। পণ্ডিত, তোমার মনোরমার কথা বল। তোমার রত্নার কথা বল।

—নেহাত আমার কথা নিয়ে বই লিখবেন আপনি?

—হ্যাঁ। বল তোমার কথা। শুধু তোমার কথা।

—ওরে রত্না! মা, কিষাণ-বউকে বল্‌ তো, টাটকা দুধ আনতে। ধীরাবাবুকে চা করে দে। নইলে তো গল্প জমবে না। হ্যাঁ—ধীরাবাবু, সেই ভাল। শুধু আমার কথা নিয়ে বই লিখবেন। শ্রীশবাবুও পাঠশালার পণ্ডিত—কিন্তু তিনি অনেক বড় মানুষ আমার চেয়ে। আবার পলাশবুনির পণ্ডিত—সে আমার থেকে অন্য রকম। শুধু আমার কথা নিয়েই বই লিখবেন। তবে যেন মিথ্যে রঙ-চঙ চড়াবেন না। একতারায় যেমন সুর ওঠে, তেমনই বাজাবেন। বাউলের গান যেমন হয়, তেমনই রাখবেন। একরঙা ছবি, যেমন লাগুক, দোসরা রঙের আঁচড় দেবেন না।—এই সন্দীপন পাঠশালার সীতারাম পণ্ডিত।

খাতাখানি তার হাতে দিয়ে বললে, এতেই সব লেখা। শুধু একটা কথা লেখা নাই। দেখুন তো রত্না কোথায়?

—এখানে তো নেই, বোধহয় রান্নাঘরে?

মৃদু স্বরে সে বললে, ধীরাবাবু, বালিকা বিদ্যালয়ে এক শিক্ষয়িত্রী এসেছিল, তাকে আমি ভালবেসেছিলাম। পাঠশালার পণ্ডিত হলেও তো মানুষ আমি। সেই কথাটা লেখা নাই বলি, শুনুন সে কথা।

সে কথা শেষ করে পণ্ডিত চুপ করে বসে রইল।

ধীরানন্দ বললে, পণ্ডিত, আমি তা হলে উঠি?

পণ্ডিতও উঠে দাঁড়াল। ধীরানন্দ আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

সীতারাম হঠাৎ বললে, আর একটা কথা ধীরাবাবু। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—বল পণ্ডিত।

—আমার আরও একটা কথা আছে ধীরাবাবু।

—বল পণ্ডিত। বল।

—আমাকে হাত ধরে উপরে নিয়ে যাবেন? সেখানে বলব, সেখানে বলব।

ধীরানন্দ তাকে ধরে নিয়ে গেল উপরে।

পণ্ডিত ইশারায় ইশারায় তাকের কাছে গেল। ডাকলে, ধীরাবাবু!

—পণ্ডিত?

—আমার পাপ—এ পাপ থেকে আমাকে মুক্ত করুন আপনি। এই বইগুলি আপনার। আমি পড়তে নিয়ে এসে আর ফেরত দিই নাই! এইগুলি নিয়ে যান। রজনীবাবুর একখানা বই আছে। ধীরাবাবু!

ধীরানন্দ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে এসে পণ্ডিতকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলে। ভীরু দুর্বল হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে দারিদ্র্যশীর্ণ বক্ষপঞ্জরের অন্তরালে। আবেগ-প্রাবল্যে দেহ জ্বরোত্তপ্ত উষ্ণতায় প্রখর। ক্ষীণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রয়েছে মুক্ত দ্বারপথে অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষরশ্মিতে ঝলমল পশ্চিম আকাশের দিকে। ঠোঁট কাঁপছে যেন এক অসহনীয় থরথর কম্পনে।

ধীরানন্দ গভীর স্বরে বললে, জয় হোক, জয় হোক—পণ্ডিত তোমার জয় হোক। ধীরানন্দের আলিঙ্গনের মধ্যে তার চশমাটা খসে পড়ে গেল।

সীতারাম ডাকলে, রত্না! একটা আলো দিয়ে যা মা। ঘর যে অন্ধকার হয়ে গেল।

—যাই বাবা। রত্না সাড়া দিলে।

ধীরানন্দ সবিস্ময়ে বললে, এ কি পণ্ডিত, তুমি কিছুই দেখতে পাও না? ঘরে তো আলো রয়েছে এখনও। এতক্ষণে সে পণ্ডিতের দৃষ্টিহীনতার পরিমাণ বুঝতে পারলে। শিউরে উঠল সে।

সীতারাম হেসে বললে, আলো রয়েছে? ও, চশমাটা খসে পড়ে গিয়েছে কিনা। দেখুন তো ধীরাবাবু, নইলে আমিই হয়তো পা দিয়ে ভেঙে ফেলব।

ধীরানন্দ চশমাটা কুড়িয়ে তার হাতে দিলে। চশমাটা চোখে দিয়ে সীতারাম বললে, বেশ।

ধীরানন্দ তার হাত ধরে বললে, পণ্ডিত, তুমি আমার সঙ্গে চল, চোখের চিকিৎসা করাবে।

সীতারাম ঘাড় নাড়লে, না। একটু চুপ করে থেকে বললে, কি দেখব চোখ নিয়ে? রত্নার বিধবা মূর্তি? থাক্।

স্তব্ধ হয়ে গেল ধীরানন্দ।

রত্না আলো দিয়ে গেল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সীতারাম বললে, অন্ধ চোখে আমি ভগবানকে দেখবার চেষ্টা করব। আপনার মা বলেছিলেন—আমি পাব দেখতে। দেখি পাই কিনা। উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সে।

ধীরানন্দ এই মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে তাকে প্রণাম করলে।

শেষ